শিশুশিক্ষা

অধ্যয়ন

শিশুশিক্ষা অধ্যয়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

প্রকাশক :

অধিকর্তা

"রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ"

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-81-937413-2-0

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : মে, ২০২৫

সম্পাদনা (পরিমার্জিত সংস্করণ) :

সৌরভ মন্ডল, লেকচারার, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগনা

স্বাগতা হাজরা, লেকচারার, কৃষ্ণনগর গভ: পি.টি.টি.আই.

ড. সঙ্গীতা রায়, লেকচারার, ডি.এল.রায়. মহিলা পি.টি.টি.আই. (গভ:)

সঞ্চালক :

সুব্রত কুমার বিশ্বাস, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
উমাবতী হেম্ব্রম, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ : তমাল মোহান্ত

মুদ্রক :

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

মুখবন্ধ

এন.সি.টি.ই. (NCTE)-র ২০১৪ সালে নবনির্মিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী **'শিশুশিক্ষা অধ্যয়ন'** (Child Studies) গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। এটি Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)-এর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং এই বিষয়ের সমগ্র কার্যক্রমটি সম্পাদিত করার জন্য দুই বছরের সময়সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে। এই পাঠক্রমের মূল বা প্রধান লক্ষ্য হল "National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE ২০০৯)" অনুসারে শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতির রূপান্তরকরণ। আর এই রূপান্তর বর্তমান সময়ের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ, পরিবেশ তথা জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলার জন্য একান্তভাবেই অপরিহার্য। এই পরিবর্তনের কথা স্মরণে রেখেই বর্তমান গ্রন্থের পাঠ্যসূচির সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। যেহেতু গ্রন্থের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই লিখিত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তাই বর্তমান গ্রন্থে শুধুমাত্র বিষয়ের রূপরেখা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এই বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্যগুলি হল —

ক) শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ।

খ) মানব প্রকৃতি, সমাজ, শিখন ও শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন।

গ) শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

ঘ) শিক্ষকগণ দ্বারা পরিচালিত শিখন ও শিক্ষণের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা গঠন।

ঙ) পাঠক্রম ও শিশুর জ্ঞান নির্মাণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ।

চ) বিদ্যালয়ে নেতৃত্বদান, ব্যবস্থাপনা, কার্যকারিতা এবং এর গুণমান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ (SCERT,WB) এবং জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার (DIET) যৌথ গবেষণামূলক কাজ এই পাঠ্য বইটি। শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন D.El.Ed. কোর্সের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কারণে এই সংস্থা সরকারি নির্দেশিকা 712-Edn(CS)/8T-17/79 তারিখ 21.05.1980 অনুসারে বিভাগ (iii),(iv), (viii) এবং (x) 'Development of Teaching Clarity' নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের প্রতিটি কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে যে কথাটি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছিল তা হল - 'D.El.Ed.-এর জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ'।

এই গ্রন্থটি রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ (SCERT, WB) এবং বিভিন্ন জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রতিটি কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। বইটির বিষয়বস্তু একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত প্রচেষ্টাই সার্থক হবে যদি এটিকে শিক্ষক-শিক্ষিকার কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে **'শিশুশিক্ষা অধ্যয়ন'** (Child Studies) প্রয়োগের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে রূপান্তরিত করা হলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সঠিকভাবে শিক্ষিত হবে। প্রাথমিক প্রয়োগ ও গবেষণার মাধ্যমে বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা এবং তা পরে চূড়ান্ত সম্পাদনায় বিবেচনা করা, এই ধাপগুলো পার করেই আজকের এই বইটির আবির্ভাব।

বইগুলির প্রকাশনার পর পরবর্তীতে এর পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের থেকে অনুরোধ আসে। সেই ভাবনা থেকে বর্তমানে পরিমার্জন সংস্করণের কাজটি অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ,

পশ্চিমবঙ্গ (SCERT,WB) মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস, রিসার্চ ফেলো, গ্রেড-II, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ (SCERT,WB) মহাশয় এবং শ্রীমতী উমাবতী হেম্ব্রম, রিসার্চ ফেলো, গ্রেড-II, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ (SCERT,WB) মহাশয়ার সঞ্চালনায় দলগতভাবে করা হয়েছে। বর্তমান বইটির পরিমার্জিত প্রতিলিপি করার জন্য গঠিত দলটিতে নিযুক্ত ছিলেন— শ্রী সৌরভ মণ্ডল, লেকচারার, ডায়েট, উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রীমতী স্বাগতা হাজরা, লেকচারার, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট পি.টি.টি.আই এবং ড. সঙ্গীতা রায়, লেকচারার, ডি. এল. রায় গভর্নমেন্ট পি.টি.টি.আই (মহিলা)।

যেহেতু অনুশীলনকারী শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও D.El.Ed. প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা এই পরিমার্জিত প্রতিলিপি কাজটির সমালোচনা সর্বোত্তমভাবে করা যেতে পারে, তাই বর্তমান গ্রন্থের যে-কোনো গঠনমূলক সমালোচনা আন্তরিকভাবে কাম্য।

বর্তমান বইটি পূর্বের তুলনায় অনেক তথ্য, চিত্র ও উদাহরণ দ্বারা সমৃদ্ধ। বইটি যদি পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে পারে, তাহলে এই পরিমার্জিত সংস্করণের প্রচেষ্টা যথাযথ স্বীকৃতি পাবে।

ড. ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

CC-01: Child Studies

Maximum Marks=100

Internal=30

External=70

Pass Marks=40% of Full Marks in each of the External & Internal Evaluation

Student Contact = 90 hours

OBJECTIVES

- To understand general conceptions about child and childhood (specifically with reference to the Indian social context);
- To acquire a sensitive and critical understanding of the different social/educational/cultural realities at the core of the exploration into childhood.
- To develop an understanding of different aspects of a child's physical, motor, social and emotional development.
- To understand the developmental process of children with diverse abilities in social, cultural and political context.
- To provide hands-on experiences to interact with children, and training in methods to understand aspects of the development of children.
- To understand various theories of learning & cognition
- To develop the trainees as supporter, facilitator of knowledge rather than an instructor.
- To sensitize the trainees regarding developmental needs and capabilities and conceptual clarity within their socio cultural context.

Unit-1: Perspectives in Development **Class-8 Hours**

- Introduction to perspectives in development – Concept of development (meaning, principles and objectives).
- Development as multidimensional and plural
- Development through the life span (stages)
- Developmental ways as continuous and discontinuous.
- Childhood as modern construct (knowledge- creator) in the context of poverty, globalization and modern culture
- Commonalities and diversities within the notion of childhood with reference to Indian context

Unit-2: Physical-Motor Development **Class-7 Hours**

- Growth and Maturation
- Gross and fine motor development skills in infancy, pre-school children and elementary children
- Role of parents and teachers in providing opportunities for physical-motor development, for example, play.

Unit-3: Social Development **Class-10 Hours**

- Concept of socialization: Family environment, Parent-child relationships,Child rearing practices,
- Separation of parents: Children in crèches, orphanages etc.
- Schooling: peer influences, Teacher-child relationships, out of school experiences
- Development of children through socialization process
- Personality development – Freudian stages of development
- Psycho-social development – stages as proposed by Erikson
- Social theories and Gender development-meaning of gender roles, influences of gender roles, stereotypes and gender in playground

Unit-4: Self and Moral development **Class-7 Hours**

- A sense of self: Self-description, self-concept, self-esteem, social comparison, internalization and self-control
- Moral development: perspectives of Lawrence Kohlberg

Unit-5: Emotional Development **Class-8 Hours**

- Development of emotions and ability to regulate them (Love, affection, fear, anger, jealousy etc.)

- Development of emotions at different stages (pre-school, late childhood and pubertal stages)
- Development of emotions as continuous and discontinuous

Unit-6: Learning- **Class- 9 Hours**

- Learning: Concept of learning (meaning, principles and objectives) basic theories of learning
- Learning: ideas of behaviorism
- Basic architecture of the mind (working memory, long term memory, attention, encoding and retrieval)

Unit-7: Cognition **Class-11 Hours**

- Constructivism: introduction to the concept, Piaget's theory: what is learning, structures and processes of cognitive development, children's thinking, and implications for teaching learning.
- Vygotsky's theory- introduction, the general genetic law, concept of zone of proximal development tools and symbols in development, implications for teaching.
- Individual and socio-cultural differences in cognition understanding learning difficulties, terms of exclusion and inclusion and impact.

Unit-8: Play **Class-10 Hours**

- Meaning of Play: Characteristics, kinds and types of Play
- Functions of Play: Linkages with the physical, social, emotional, language, cognitive and motor development of children
- Cross Cultural & Socio-Economic differences in children's play
- Games and group dynamics, rules of games and how children learn to negotiate differences and resolve conflict.

Unit-9: Language- **Class-10 Hours**

- Perspectives in Language development (with reference to how children acquire language at early age): Skinner, Social Learning Theory of Bandura and Walters
- The use of Language: Turn taking, interaction, conversations and listening
- Bilingual or Multilingual children: Implications for teachers, multilingual classrooms, storytelling as a pedagogic tool

Unit-10: Communication **Class-10 Hours**

- How do children communicate?
- Socio-cultural variations in Language: Accents, difference in communication for a multilingual classroom.

Mode of Curriculum Transaction

- Classroom discussions for developing conceptual understanding.
- Close reading of text material/research papers
- Individual and group presentations of issues and concerns raised in assignments and
- Theoretical and practical activities/exercises/investigations; analysis interpretation of collated observations, systematic data.

Course Evaluation:

- Evaluation is process- based. A procedure for conducting evaluation in both the internal and external is as follows:-

Internal marks-30

Distribution of the Marks

Assignment-10 marks

Internal Examination/Paper Presentation/Group wise or Individual-10 marks

Attendance – 5 Marks

Overall Participation = 5 Marks

External Evaluation :70 marks, Time: 3 hours External Marks =70

সূচিপত্র (Content)

অধ্যায় - ১	:	বিকাশের প্রেক্ষিতসমূহ (Perspectives in Development)	১
অধ্যায় - ২	:	দৈহিক এবং সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Physical - Motor development)	১৮
অধ্যায় - ৩	:	সামাজিক বিকাশ (Social Development)	২৬
অধ্যায় - ৪	:	অহংবোধ ও নৈতিকবোধের বিকাশ (Self and Moral Development)	৪৬
অধ্যায় - ৫	:	প্রক্ষোভমূলক বিকাশ (Emotional Development)	৫৩
অধ্যায় - ৬	:	শিখন (Learning)	৬৩
অধ্যায় - ৭	:	জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া (Cognition)	৯৩
অধ্যায় - ৮	:	খেলা (Play)	১০৬
অধ্যায় - ৯	:	ভাষা (Language)	১১৮
অধ্যায় - ১০	:	যোগাযোগ (Communication)	১৩১
		নমুনা প্রশ্নপত্র (Model Question Paper)	১৩৮

অধ্যায় ১

বিকাশের প্রেক্ষিতসমূহ (Perspectives in Development)

১.১ সূচনা (Introduction)

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.৩ বিকাশের বিভিন্ন প্রেক্ষিত — বিকাশের ধারণা (অর্থ, নীতি এবং উদ্দেশ্যসমূহ) [Introduction to perspectives in Development— Concept of Development (meaning, principles and objectives)]

১.৪ শিশুর বিকাশ বহুমাত্রিক এবং বহুবিধ (Development is multidimensional and plural)

১.৫ জীবনব্যাপী বিকাশের স্তর (Development through the life-span)

১.৬ বিকাশ প্রক্রিয়া — নিরবচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন (Developmental ways as continuous and discontinuous)

১.৭ দারিদ্র্য, বিশ্বায়ন এবং আধুনিক সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর জ্ঞান নির্মাণ (Child's Construction of Knowledge in the context of Poverty, Globalization and Modern Culture)

১.৮ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে শৈশবের ধারণার বৈচিত্র্য এবং ঐক্য (Commonalities and Diversity within the notion of Childhood with reference to Indian Context)

১.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

১.১০ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

১.১ সূচনা (Introduction)

বৃদ্ধি ও বিকাশ শিশুর একটি স্বাভাবিক দৈনিক ঘটনা। বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিকাশের কিছু কিছু দিক সাময়িক এবং কিছু কিছু দিক নিরন্তর। বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথাগত শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক ও কর্মকুশলতার সীমা ছাড়িয়ে দারিদ্র্য, বিশ্বায়ন, আধুনিক সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রয়োগমূলক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। বিকাশের অর্থ, নীতি, ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

২। বিকাশের বহুমাত্রিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৩। জীবনব্যাপী বিকাশের স্তরসমূহ সম্পর্কে পরিচিত হওয়া।

৪। বিকাশ বিচ্ছিন্ন বা নিরবচ্ছিন্ন-এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।

৫। শৈশবের আধুনিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৬। ভারতীয় প্রেক্ষিতে শৈশবকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈচিত্র্য ও ঐক্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

১.৩ বিকাশের বিভিন্ন প্রেক্ষিত-বিকাশের ধারণা (অর্থ, নীতি এবং উদ্দেশ্যসমূহ) [Introduction to perspectives in Development— Concept of Development (meaning, principles and objectives)]

মাতৃজঠরে প্রাণ সঞ্চারিত ভ্রূণ ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং শিশু রূপে ভূমিষ্ঠ লাভ করে। এই সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু আবার নানাবিধ স্তর অতিক্রম এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। এইভাবে ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনচক্র সম্পন্ন করে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়া বর্তমান, যেমন-বৃদ্ধি (Growth), বিকাশ (Development) এবং পরিণমন (Maturation) ইত্যাদি। এই পরিবর্তনগুলির কোনটি জীবনব্যাপী চলতে থাকে আবার কোনটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে।

১.৩.১ বৃদ্ধি এবং বিকাশের সাধারণ ধারণা (General Conception of Growth and Development)

একটি সদ্যোজাত শিশু পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয় কতগুলি সমন্বিত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি হল বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশ (Development)। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দুটিকে একই প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করি কিন্তু আসলে বিষয় দুটি একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির, যদিও বৃদ্ধি এবং বিকাশ একে অন্যের সাথে পরিপূরক সম্পর্কে আবদ্ধ। মানুষের এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন — বিকাশ, বৃদ্ধি, পরিণমন রয়েছে, তেমনি শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকও বর্তমান। বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে এই শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু বিকাশ পরিবর্তনের সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সুসংহত ধারা বজায় রাখে। মানব জীবনচক্রে সংঘটিত বিভিন্ন পরিবর্তন প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিকাশ, বৃদ্ধি, পরিণমন প্রতিটি প্রত্যেকের সাথে সম্পর্কযুক্ত আবার প্রতিটি পৃথক ধারণা। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিসরের ধারণা হল বিকাশ।

বিকাশ (Development)

ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান শারীরিক (Physical) এবং ক্রিয়াগত (Functional) পরিবর্তনকে বিকাশ বলা হয়। জৈবিক বা পারিপার্শ্বিক কারণে ব্যক্তির কাঠামো, চিন্তা অথবা আচরণের সংঘটিত পরিবর্তনকে বিকাশ বোঝানো হয়। এই পরিবর্তনসমূহ ক্রমবর্ধমানভাবে সংঘটিত হয় এবং উন্নতির নির্দেশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মানুষের জীবনে সংঘটিত সমস্ত প্রকার পরিবর্তনই বিকাশ (Development) নয় বরং বলা ভালো, মানুষের জীবনে ক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনব্যাপী পরিবর্তনকে বিকাশ ধরা হয়। Atkinson, Berne এবং Woodworth বিকাশ বলতে বুঝিয়েছেন, "The progressive and continuous change in the organism from birth to death." অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনে বিভিন্ন অগ্রগতিমূলক এবং ধারাবাহিক পরিবর্তনসমূহকে বিকাশ বলা হয়।

বিকাশ (Development) হল পর্যায়ক্রমিক সংঘটিত এক অগ্রগতিমূলক (Progressive) সামগ্রিক ক্রিয়াগত ও গুণগত পরিবর্তনের সুসামঞ্জস্য ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা জীবনব্যাপী চলতে থাকে।

বিকাশ একটি নির্দিষ্ট দিককে নির্দেশ করে না বরং বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন-শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, ভাষাগত, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি। বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন কার্যপ্রণালীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নবজাতকের পেশি সঞ্চালন ক্ষমতার বিকাশ প্রথমে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাত পা ছোড়াছুড়ির মধ্য দিয়ে সূচিত হয়ে ক্রমশ তা হামাগুড়ির সাহায্যে কোনো বস্তুর কাছে যাওয়া, সেটাকে ধরা এবং সবশেষে হেঁটে বেড়ানো, দৌড়ানো ইত্যাদির মতো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আচরণের রূপ নেয়। শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ও প্রত্যক্ষণ, ধীরে ধীরে ধারণা গঠন ও বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

বিকাশের ধারণা (Concept) এবং অর্থ (Meaning) পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বিকাশের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি—

(ক) বিকাশ জীবনব্যাপী চলতে থাকা এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

(খ) বিকাশ কাঠামোগত (Structural) এবং ক্রিয়াগত (Functional) পরিবর্তন।

(গ) বিকাশ ক্রমবর্ধমানভাবে সংঘটিত এবং উন্নতির নির্দেশক।

(ঘ) বিকাশ হল পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে অর্জিত শিখন (Learning) অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বয়।

(ঙ) ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এবং স্ত্রী-পুরুষে বিকাশের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(চ) বিকাশের বিভিন্ন দিক অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি পরস্পরের সাথে সম্পর্কভুক্ত এবং নির্ভরশীল।

১.৩.২ বিকাশের নীতিসমূহ (Principles of Development)

বিকাশের মতো জটিল প্রক্রিয়া কোনো একটি বিশেষ নীতির অনুসারী নয় বরং বলা ভালো যৌক্তিকভাবে বিশেষ কতগুলি নীতিকে অনুসরণ করে। সাধারণভাবে, যে সমস্ত নিয়ম বা নীতির মাধ্যমে বিকাশ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাদেরকে বিকাশের নীতি বলে। বিকাশের নানাবিধ নীতিসমূহ নিম্নে একটি ছক সহ বর্ণিত হল—

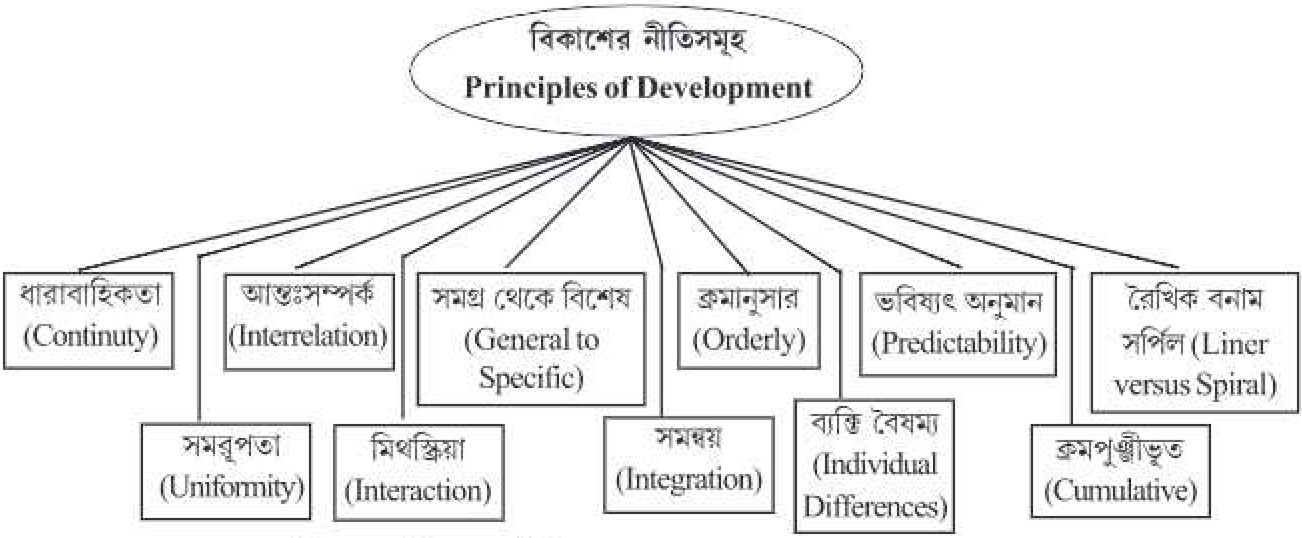

চিত্র - ১ : বিকাশের নীতিসমূহ (Principles of Development)

(ক) ধারাবাহিককতার নীতি (Principle of Continuity) : বিকাশ ধারাবাহিকতার নীতি অনুসরণ করে অর্থাৎ ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবনব্যাপী বিকাশ ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়।

(খ) সমরূপতার নীতি (Principle of Uniformity) : ব্যক্তি বিশেষে বিকাশের পার্থক্য থাকলেও জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিকাশের ধরন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমরূপ। যেমন শিশু প্রথমে বসে এবং ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দেয়। দাঁড়াতে পারে, হাঁটতে পারে যা সবার ক্ষেত্রেই এক রকম।

(গ) আন্তঃসম্পর্কের নীতি (Principle of Interrelation) : বিকাশের বিভিন্ন দিক যেমন—দৈহিক, মানসিক, সামগ্রিক, নৈতিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল অর্থাৎ এক দিকের পরিবর্তন অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে।

(ঘ) **মিথস্ক্রিয়ার নীতি (Principle of Interaction):** ব্যক্তির বিকাশ তার বংশগতি এবং তার চারপাশের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

(ঙ) **সমগ্র থেকে বিশেষ-এর নীতি (Principle of General to Specific) :** বিকাশ সর্বদা সমগ্র থেকে বিশেষ অংশ অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারিত বিশেষ প্রতিক্রিয়ার দিকে হয়ে থাকে। যেমন-একটি শিশু প্রথমে সাধারণভাবে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে প্রতিক্রিয়া করে যা পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রতিক্রিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে কোনো কিছু হাত দিয়ে ধরতে পারে বা পা দিয়ে বল মারতে পারে।

(চ) **সমন্বয়ের নীতি (Principle of Integration) :** বিকাশ সমন্বয়সাধনের নীতি অনুসরণ করে। যেমন- সমগ্র এবং বিশেষ অংশের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি শিশু তার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক বা ক্ষেত্রকে যথাযথভাবে বিকশিত করতে সক্ষম হয় বিকাশের মাধ্যমে।

(ছ) **ক্রমানুসারের নীতি (Principle of Order) :** বিকাশ নির্দিষ্ট স্তর বা পর্যায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্রমকে অনুসরণ করে সংঘটিত হয়।

(জ) **ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি (Principle of Individual Differences) :** বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিকাশের তারতম্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্য লিঙ্গভেদেও হয়ে থাকে।

(ঝ) **ভবিষ্যৎ অনুমানের নীতি (Principle of Predictability) :** বিকাশের ধরনের সমরূপতা (Uniformity) এবং নির্দিষ্ট ক্রমের কারণে বিকাশ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। অর্থাৎ বিকাশ হল অনুমানযোগ্য।

(ঞ) **ক্রমপুঞ্জীভূতের নীতি (Principle of Cumulative) :** বিকাশ ক্রমপঞ্জীভূতের নীতি অনুসরণ করে অর্থাৎ ধীরে ধীরে এবং স্তরে স্তরে বিকাশ ব্যক্তির মধ্যে ক্রমপঞ্জীভূত হয়।

(ট) **রৈখিক বনাম সর্পিল (Principle of Liner vs. Spiral Advancement) :** শিশুর বিকাশ কখনো সরলরেখার মতো সোজা হয় না বরং তা সর্পিল হয় অর্থাৎ বিকাশের একটি স্তরে উপনীত হওয়ার পর কখনো তা সরলরেখার মতো পরবর্তী স্তরে অগ্রসর হয় না বরং বিকাশ পূর্ববর্তী স্তরে ফিরে এসে পরবর্তী স্তরে উপনীত হয় সর্পিলের মতো।

১.৩.৩ বিকাশ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Studying Development)

বিকাশ যেহেতু পর্যায়ক্রমিক এবং ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয় তাই বিভিন্ন স্তরের বিকাশের জ্ঞান জানার উদ্দেশ্য নিম্নে বর্ণিত হল—

ক. **বিকাশের স্তর এবং ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্র নির্দেশ :** বিকাশের বিভিন্ন স্তরের ধারাবাহিক জ্ঞান না থাকলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে যথাযথভাবে নির্দেশনা দান করা যায় না, তার আচরণের উন্নতি ঘটানো যায় না।

খ. **বিকাশ এবং ব্যক্তিবৈষম্যের জ্ঞান :** বিকাশ সম্পর্কিত ব্যক্তিবৈষম্যের জ্ঞান ব্যাপকভাবে বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিটি শিশুর শক্তি এবং সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

গ. **বিকাশ এবং শিশুর চাহিদা নিরূপণ :** বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশুর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, চাহিদা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এই জ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে।

ঘ. **বিকাশ এবং পাঠক্রম রচনা :** বিভিন্ন স্তরের বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান, শিশুর বিকাশের স্তরের উপযোগী পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। নানান স্তরের বিকাশের এই বৈশিষ্ট্যগুলি জানা না থাকলে শিশুর ক্ষমতা এবং চাহিদানুযায়ী পাঠক্রম রচনা সম্ভব নয়।

ঙ. **বিকাশ এবং শিক্ষণ পদ্ধতি :** বিকাশের স্তর অনুযায়ী, শিশুর প্রত্যাশা, সক্ষমতা এবং বোধগম্যতা অনুধাবন করে শিক্ষক নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচিত করতে সক্ষম হবেন।

চ. **বিকাশ এবং শিশুর ভবিষ্যৎ দিশা নির্ধারণ :** শিশুর বিভিন্ন স্তরের দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি বিকাশের প্রাপ্ত তথ্য তার ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করে। যেমন— শিশুর একটি নির্দিষ্ট স্তরের বিকাশ সম্পন্ন হলে পরবর্তী স্তরের বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা সম্ভব আবার শিক্ষার্থীর বিকাশের হার অনুযায়ী তার সম্ভাব্য বৃত্তি পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও সম্ভব।

১.৩.৪ বৃদ্ধি এবং বিকাশ : সম্পর্ক এবং পার্থক্য (Growth and Development : Relation and Differences)

মানবজীবনে পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে বৃদ্ধি হল এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। বৃদ্ধি হল মানুষের শারীরবৃত্তীয় এবং কাঠামোগত পরিবর্তন। অর্থাৎ বৃদ্ধি হল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দেহের আকার, আয়তন, উচ্চতার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী পরিবর্তন। বৃদ্ধি শুধুমাত্র দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য। বৃদ্ধি বিকাশের একটি অংশ মাত্র। কারণ বিকাশ শুধুমাত্র শারীরবৃত্তীয় নয়। বিকাশের বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন-দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি। বৃদ্ধি এবং বিকাশ পারস্পরিক নির্ভরশীলভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ বিকাশের জন্য বৃদ্ধির ভূমিকা বর্তমান।

বৃদ্ধি হল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দৈহিক এবং কাঠামোগত পরিবর্তন যা দেহের আকার, আয়তন, উচ্চতার স্থায়ী পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

বৃদ্ধি এবং বিকাশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও বর্তমান।

বৃদ্ধি (Growth)	বিকাশ (Development)
• দেহের আকার, আয়তন, উচ্চতা বেড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধি বলে।	• আকার, আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রিয়াগত ও গুণগত পরিবর্তনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে বিকাশ বলে।
• বৃদ্ধি শুধুমাত্র শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ	• বিকাশ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে।
• বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘটে	• বিকাশ আমৃত্যু ধারাবাহিকভাবে ঘটে।
• বৃদ্ধি পরিমাণগত	• বিকাশ গুণগত
• বৃদ্ধিকে সহজেই পরিমাপ করা সম্ভব	• বিকাশের সমস্ত দিক পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়, ইহা পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ
• বৃদ্ধির সাথে বিকাশের সম্পৃক্ততা কম	• বিকাশের সাথে বৃদ্ধির সম্পৃক্ততা বেশি

১.৪ শিশুর বিকাশ বহুমাত্রিক এবং বহুবিধ (Development is multidimensional and plural)

শিশুর বিকাশ শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রকৃত অর্থে শিশুর বিকাশ বহুধা। একই সাথে বিভিন্ন দিক থেকে শিশুর বিকাশ ঘটে থাকে। যেমন— শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, কর্ম-কুশলতার বিকাশ, ভাষাগত বিকাশ ইত্যাদি। তবে সবদিকের বিকাশ যে একই হারে ঘটতে থাকবে, সেটি নিশ্চয় করে বলা যায় না। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক উপাদানের ভিত্তিতে শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়।

বর্তমান দিনে শিশুর বিকাশের প্রথাগত ধারণার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক শিশুর বিকাশের ধারণায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিশুর পছন্দ (Choice) এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার কুশলতার (well-being) ওপর। Narayan et al (2000) শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি দিক এবং তার উপাদানসমূহ উল্লেখ করেছেন। যথা—

১। **বস্তুগত কুশলতা (Material well-being)**
খাদ্য
সম্পদ
কাজ

২। **দৈহিক কুশলতা (Bodily well-being)**
স্বাস্থ্য
প্রকাশ (appearance)
ভৌত পরিবেশ

৩। **সামাজিক কুশলতা (Social well-being)**
নিজেকে যত্ন নেবার ক্ষমতা
আত্ম-শ্রদ্ধা এবং সম্মান
পরিবারের সঙ্গে সহজ ও মধুর সম্পর্ক

৪। **নিরাপত্তা (Security)**
নাগরিক শান্তি
নিরাপদ পরিবেশ
ব্যক্তিগত নিরাপত্তা
ন্যায়বিচার পাবার সুযোগ
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস

৫। **পছন্দ এবং কার্যকলাপের স্বাধীনতা (Freedom of choice and action)**

৬। **মানসিক কুশলতা (Psychological well-being)**
মনের শান্তি
খুশি বা আনন্দ
জীবনের সুষ্ঠু সমন্বয়

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এবং মেহবুব উল হক্ শিশুর সুষম বিকাশের জন্য কতকগুলো বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। যথা—

১। **সাম্য :** সাম্য পক্ষপাতিত্বকে দূর করে এবং ন্যায়বিচারের সুষ্ঠু বিন্যাস ঘটায়।

২। **দক্ষতা :** দক্ষতা বলতে এক্ষেত্রে বোঝায় সহজলভ্য সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির জন্য সুযোগসৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

৩। **অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন :** কোনো ব্যক্তিকে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল করতে উৎসাহ জোগায়।

৪। **সহনীয়তা (Sustainability)**

৫। সামাজিক উন্নয়ন

৬। আর্থিক বৃদ্ধি

৭। মহিলা ও সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন

৮। ব্যক্তির ন্যূনতম স্বাধীনতার ক্ষেত্রবৃদ্ধি

৯। মানবাধিকার সুনিশ্চিতকরণ

১.৫ জীবনব্যাপী বিকাশের স্তর (Development through the life-span)

মানব শিশু জন্মায় একটি অপরিণত, অসহায় ও ক্ষুদ্র সত্তা নিয়ে। কিন্তু জন্মের পর থেকে পরিবেশের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তার নানাদিকে বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়ে থাকে। তার জীবন বিকাশের ধারায় অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় এই স্তরগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তির জীবন-বিকাশের স্তরগুলিতে ব্যক্তির সহজাত গুণগুলির শুধুমাত্র আত্মপ্রকাশই ঘটে না, সেগুলির একটা সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটে। এর ফলে ব্যক্তি তার জীবনকে সফল ও সার্থক করে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। মনোবিদগণ ব্যক্তিজীবনের বিকাশকে অনুশীলন করার জন্য বয়স ও বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের জীবনকালকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বয়স অনুযায়ী, আবার কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী শিক্ষান্তর অনুযায়ী জীবনবিকাশের স্তর নির্ণয় করেছেন।

মনোবিদ আর্নেস্ট জোনস (Earnest Jones) মানুষের জীবন বিকাশের ধারকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। যেমন-

বিকাশের স্তর (Development Stage)	বয়স (Age)
(১) শৈশব (Infancy)	জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত
(২) বাল্য (Childhood)	পাঁচ থেকে বারো বছর বয়স
(৩) কৈশোর (Adolescence)	বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত
(৪) প্রাপ্ত বয়স্ক (Maturity)	আঠারো বছর বয়স থেকে পরবর্তী কাল

আবার মনোবিদ এরিকসন জীবন বিকাশের স্তরকে আটটি ভাগে ভাগ করেছেন—

জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর (এরিকসন)
(1) ***প্রথম স্তর :*** জন্ম থেকে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(2) ***দ্বিতীয় স্তর :*** এক থেকে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(3) ***তৃতীয় স্তর :*** তিন থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(4) ***চতুর্থ স্তর :*** পাঁচ থেকে এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(5) ***পঞ্চম স্তর :*** এগারো থেকে আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(6) ***ষষ্ঠ স্তর :*** যৌবনাগম স্তর।
(7) ***সপ্তম স্তর :*** প্রাপ্ত বয়স্ক ।
(8) ***অষ্টম স্তর :*** পরিণত স্তর।

মনোবিদ জে. পিকুনাস (J. Pickunas) বয়স অনুযায়ী মানুষের জীবন বিকাশের স্তরকে দশটি ভাগ করেছেন—

জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর
(1) ***প্রাক্ জন্মস্তর :*** গর্ভসঞ্চার থেকে শুরু করে জন্মাবার সময়কাল পর্যন্ত।
(2) ***সদ্যোজাত স্তর :*** জন্মের সময় থেকে চার সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত।
(3) ***প্রারম্ভিক শৈশব স্তর :*** একমাস থেকে দেড় বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(4) ***প্রান্তীয় শৈশব স্তর :*** দেড় বৎসর থেকে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(5) ***প্রারম্ভিক বাল্য স্তর :*** আড়াই বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(6) ***মধ্য বাল্য স্তর :*** পাঁচ বৎসর থেকে নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(7) ***প্রান্তীয় বাল্য স্তর :*** নয় বৎসর থেকে বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(8) ***যৌবনাগম স্তর :*** বারো বৎসর থেকে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(9) ***প্রাপ্তবয়স্ক স্তর :*** একুশ বৎসর থেকে সত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(10) ***বার্ধক্য স্তর :*** সত্তর বৎসর বয়সের পরবর্তী সময়কাল।

এলিজাবেথ বি হারলকের *(Elizabeth B. Hurlock)* জীবন বিকাশের স্তর :

এলিজাবেথ বি হারলক *(Elizabeth B. Hurlock)* তাঁর *Child Development* পুস্তকে শিশুর বিকাশের স্তরগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করেছেন।

(1) প্রাক-জন্মকালীন স্তর (গর্ভাবস্থা থেকে জন্ম পর্যন্ত) : জন্মাবার পূর্বে বিকাশ খুব দ্রুত ঘটে। এই বিকাশ প্রধানত শারীরিক এবং দেহের কাঠামোর বৃদ্ধি।

(2) সদ্যোজাত স্তর (জন্মাবার পর থেকে 10-14 দিন) : এই স্তরকে বলা হয় 'নিওনেট' (শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ 'Neos' বা 'New' এবং লাতিন ক্রিয়াপদ 'Nascor' বা জন্মগ্রহণ করেছেন)। এই সময়ে শিশু জননীর গর্ভ থেকে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সচেষ্ট হয়। সাময়িকভাবে বৃদ্ধি বন্ধ থাকে।

(3) শৈশবকাল (5 সপ্তাহ থেকে 2 বছর) : এই স্তরের প্রথম দিকে শিশুরা অসহায় বোধ করে। ক্রমশ তারা তাদের পেশি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় যার ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা দেয়। এই পরিবর্তনে একদিকে যেমন শৈশবের প্রতি শিশুর বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে অন্যদিকে তার মধ্যে স্বাধীন হওয়ার বাসনা জন্মায়।

(4) বাল্যকাল (2 বছর থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ পর্যন্ত) : বাল্যকালের বিস্তৃত সময়কে দুভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) প্রথম বাল্যকাল (2 বছর থেকে 6 বছর) : এই সময়কালকে প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তর বলে। এই সময় থেকে শিশু তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয় এবং সামাজিক অভিযোজনে সক্রিয় হয়।

(খ) প্রান্তীয় বাল্যকাল [6 বছর থেকে 13 বছর (মেয়েদের ক্ষেত্রে) এবং 14 বছর (ছেলেদের ক্ষেত্রে)] : এই সময় থেকে যৌন পরিণমন শুরু হয় যাকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ বলে। এই বয়সে শিশুর ব্যাপকভাবে সামাজিকীকরণ ঘটে, প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং 'গ্যাঙের' প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(5) বয়ঃসন্ধিকাল 11 বছর থেকে 16 বছর : এই স্তরে বাল্য ও বয়ঃসন্ধির বিভাজনরেখা টানা মুশকিল। বাল্যকালের শেষ 2 বৎসর এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের শুরুর 2 বছর পরস্পর পরস্পরের ওপর প্রক্ষিপ্ত (Over Lapping) হয়। বালিকাদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকাল হল 11 বছর থেকে 15 বছর এবং বালকদের ক্ষেত্রে হল 12 বছর থেকে 16 বছর।

জীবন বিকাশের স্তর ও শিক্ষার পর্যায় (Stages of Human Development and Level of Education)

বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী প্রথাগত শিক্ষাস্তরকে বিভক্ত করেছেন। দেশভেদে বয়সভিত্তিক শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোঠারি কমিশনের মতে আমাদের দেশে বয়সসীমা সহ জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর ও তাদের সমপর্যায়ের প্রথাগত শিক্ষাস্তরের নাম নিম্নলিখিত তালিকায় দেখানো হল—

জীবন বিকাশের স্তর	বয়সসীমা/ বছর	প্রথাগত শিক্ষার স্তর	শ্রেণি
১. শৈশব	৫ + বয়স পর্যন্ত	প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষাস্তর বা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর	● জন্ম থেকে ২+ বয়স-ক্রেস (Creche) ● ৩+ বয়স - KG.I ● ৪+ বয়স - KG.II ● ৫+ বয়স - KG.III
২. বাল্য	৬ + থেকে ৯ + বয়স পর্যন্ত	নিম্ন প্রাথমিক স্তর	● ৬+ প্রথম শ্রেণি ● ৭+ দ্বিতীয় শ্রেণি ● ৮+ তৃতীয় শ্রেণি ● ৯+ চতুর্থ শ্রেণি
	১০ + থেকে ১৩ + বয়স পর্যন্ত	উচ্চ প্রাথমিক স্তর	● ১০+ পঞ্চম শ্রেণি ● ১১+ ষষ্ঠ শ্রেণি ● ১২+ সপ্তম শ্রেণি ● ১৩+ অষ্টম শ্রেণি
৩. কৈশোর	১৪ + থেকে ১৬ বছর	মাধ্যমিক স্তর	● ১৪+ নবম শ্রেণি ● ১৫+ দশম শ্রেণি
	১৭ + থেকে ১৮ + বয়স পর্যন্ত	উচ্চমাধ্যমিক	● ১৬+ একাদশ শ্রেণি ● ১৭+ দ্বাদশ শ্রেণি
৪. প্রাপ্ত	১৮ + থেকে ২০ + বয়স পর্যন্ত	স্নাতক	● ১৮+ স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষ ● ১৯+ স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষ ● ২০+ স্নাতক স্তরের তৃতীয় বর্ষ
	২০ + থেকে ২২ + বয়স পর্যন্ত	স্নাতকোত্তর পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা	● ২১+ স্নাতকোত্তর শিক্ষা শুরু

প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক যেমন — শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি জীবনবিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখেই পরিকল্পিত হয়। বিকাশের ফলে শিশুর চাহিদা ও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। এই চাহিদা ও ক্ষমতাকে ভিত্তি করেই শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১.৬ বিকাশ প্রক্রিয়া—নিরবচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন (Developmental ways as continuous and discontinuous)

শিশুর বিকাশ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া—এই সম্পর্কে সপক্ষে এবং বিপক্ষে একাধিক মতবাদ আছে। একদল দার্শনিক ও মনোবিদের মতে, শিশুর বিকাশ এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। তাঁরা মনে করেন যে শিশুর বিকাশ সারা জীবন ধরেই ঘটে থাকে এবং তা ক্রমশ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। তাঁদের মতে শিশুর প্রারম্ভিক স্তরের বিকাশ থেকেই পরবর্তী জীবনের কর্মকুশলতার প্রকৃতি বোঝা সম্ভব।

বেশ কিছু মনোবিদ মনে করেন যে শিশুর বিকাশ একটি বিচ্ছিন্ন পদ্ধতি। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট স্তর আছে যেখানে নির্দিষ্ট ধরনের আচরণগত বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এই বিশেষ বিশেষ স্তরে নির্দিষ্ট প্রকৃতির প্রক্ষোভ, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা দেখা দেয় এবং এই বিশেষ স্তরগুলো নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয় এবং নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়। যদিও এমন কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই যেখানে কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে এবং সেই বৈশিষ্ট্য বিলীন হবে। কোনো কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়ে নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়।

এই বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব অনুযায়ী বিকাশের প্রক্রিয়া কতকগুলো সুনির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিকশিত গুণাবলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। এরিকসন, কোহেলবার্গ, পিঁয়াজে, রস, ফ্রয়েড ইত্যাদি মনোবিদরা এই তত্ত্বের সমর্থক।

১.৭ দারিদ্র্য, বিশ্বায়ন এবং আধুনিক সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর জ্ঞান নির্মাণ (Child's Construction of Knowledge in the context of Poverty, Globalization and Modern Culture)

আধুনিক সংস্কৃতি, দারিদ্র্য, বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে শিশুর জ্ঞান নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে নির্মাণবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১.৭.১ নির্মাণবাদ সম্পর্কে ধারণা (Concept of Constructivism)

নির্মাণবাদ দৃষ্টিভঙ্গিটি সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন ইতালির দার্শনিক *গিয়ামব্যাত্তিস্তা ভিকো (Giambattista Vico, 1668-1774)*। তিনি বলেন জ্ঞান হল মানুষেরই সৃষ্টি। নির্মাণবাদ মনে করে মানুষের জ্ঞান এবং শিখন শিশু বা শিক্ষার্থীর দ্বারাই সক্রিয়ভাবে সৃষ্ট হয়, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিবেশের দ্বারা নয়। এখন প্রশ্ন হল কীভাবে শিশু সক্রিয়ভাবে নতুন জ্ঞান নির্মাণ করে। শিশু তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নতুন জ্ঞান নির্মাণ করে। শ্রেণিকক্ষে পাঠরত শিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানমূলক কাঠামোর (যা তার অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট) সাহায্যেই শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে শিখন সম্পন্ন করে।

শিশুর জ্ঞান গঠিত হয় তার মানসিক সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যা নির্ভর করে শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর। এই মানসিক সংগঠন যথার্থ, বিশ্বাসযোগ্য, সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ কি না তা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং জ্ঞানের সত্যতা এখানে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। জ্ঞান যদি এক এবং বিশ্বজনীন হয় সেক্ষেত্রে সত্যের সন্ধানে কোনো বির্তকের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের সত্যতা বিচার হয় প্রেক্ষিত বা নির্দিষ্ট মানের ভিত্তিতে যার উপর জ্ঞান দণ্ডায়মান। যেমন—যদি কোনো শিশু বাসকে বড়ো গাড়ি বা কুকুরকে ছাগল বলে মনে করে, সেক্ষেত্রে তার ভিত্তি হল বিশেষ প্রেক্ষিত। যদি এই ধারণা পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত হয় সেক্ষেত্রে শিশুর এই বলাকে আমরা ভুল বলতে পারি না।

ভ্রান্তি তখনই হবে যখন আমাদের বিচার করার প্রেক্ষিত ভিন্ন হবে। এর অর্থ এই নয় যে শিশু প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে না। প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষার্থী তখনই অর্জন করে যখন সে সমাজ-সংস্কৃতির মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে বিচার করবে। এই কারণেই বলা হয় ব্যক্তিভিত্তিক জ্ঞান সর্বজন সমর্থিত হয় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক একটি বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। দুজন শিক্ষার্থী সেই আলোচনা নিজ নিজ পূর্বাজিত জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করে নতুন জ্ঞান অর্জন করে। যেহেতু উক্ত

দুজন শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত জ্ঞান সদৃশ নয় সেই কারণেই নতুন শিখন বা জ্ঞানার্জনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সদৃশ করতে হলে নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতকে ভিত্তি করে জ্ঞানকে বিন্যস্ত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হল সামাজিক সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি এবং কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময়। যখন বিভিন্ন কমিউনিটি একত্রিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করে কোনো বিষয়ে সহমতে উপনীত হয় তখনই তা সর্বজনীন জ্ঞানে রূপ নেয়।

শৈশবে এইসব ক্ষেত্রে সহপাঠী, শিক্ষক, পিতা-মাতা সক্রিয়ভাবে শিশুদের সহযোগিতা করবে।

নির্মাণবাদের সংজ্ঞা (Definition of Constructivism)

নির্মাণবাদের অন্যতম পথিকৃৎ **ভন গ্ল্যাসারসফেল্ড (Von Glaserersfeld)**-এর মতে— নির্মাণকাজ এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে যে, জ্ঞান নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা হয় না, সক্রিয়ভাবে বিষয়কে বুঝে এবং অভিযোজনের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়। নির্মাণবাদের অন্যতম পুরোধা **ব্রুনারের** মতে—নির্মাণবাদ হল শিখনের একটি তত্ত্ব, যেখানে মনে করা হয় শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে তার পূর্ব এবং বর্তমান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন চিন্তা বা ধারণাকে গঠন করে।

নির্মাণবাদের নীতিসমূহ (Principles of Constructivism)

নির্মাণবাদকে আরও স্পষ্ট করে বুঝতে হলে এর প্রধান দুটি নীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই নীতি দুটি হল—

১. শিশু নিষ্ক্রিয় সত্ত্বা নয় বরং সক্রিয় এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক সত্ত্বা। সে শিখন এবং জ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু বা শিক্ষার্থী জ্ঞানকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে না বরং সক্রিয়ভাবে জ্ঞান নির্মাণ করে। জ্ঞান এক শিক্ষার্থী থেকে অন্য শিক্ষার্থীর নিকট সঞ্চালিত হয় না। শিশু বা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই জ্ঞান নির্মাণ করে।

২. জ্ঞানের কাজ আবিষ্কার নয়, সহযোজন (Adaptation), এর অর্থ হল জ্ঞান শিক্ষার্থীর বিষয় অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করে। এর সত্যতা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল এর তাৎপর্য, শিক্ষার্থী তার জ্ঞান নির্মাণকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কি না সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এই ব্যাখ্যা যথার্থ কি না তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল শিক্ষার্থী সেটা নিজে করছে কিনা।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জ্ঞান নির্মাণে শিশুর সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একথাও বলা যায়, যেসব উপাদান বা বিষয়গুলি শিশুর চিন্তাভাবনার উপর প্রভাব বিস্তার করে শিশুর জ্ঞান নির্মাণে তাদেরও ভূমিকা আছে। এইসব বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল শিশুর পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা (দারিদ্র্য যার অন্যতম সূচক), বিশ্বায়ন, আধুনিক সংস্কৃতি, শিক্ষকের প্রত্যাশা ইত্যাদি। এখানে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

১.৭.২ দারিদ্র্য (Poverty)

শিশুর জ্ঞান নির্মাণে দারিদ্র্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে দারিদ্র্যের ধারণা সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

দারিদ্র্য হল একটি অবস্থা যা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ***হেনরি বার্নস্টেইন* (*Henry Bernstein, 1990*)** দারিদ্র্যের নিম্নোক্ত মাত্রাগুলি উল্লেখ করেছেন—

- জীবনযাত্রা কৌশলের অভাব।
- সম্পদ (অর্থ, জমি, ঋণ ইত্যাদি) আহরণে অসমর্থ।
- নিরাপত্তার অভাববোধ এবং হতাশা।
- সম্পদের অভাবজনিত কারণে অন্যান্যদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার অক্ষমতা।

দারিদ্র্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা যায়।

(১) জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার ঘাটতি।

(২) নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তির ন্যূনতম জীবনধারা এবং জীবনের সাধারণ মানের নিম্ন অবস্থান।

(৩) সমাজের অল্পসংখ্যক ব্যক্তির স্বচ্ছলতা এবং অধিকাংশ ব্যক্তির বঞ্চনা ও হতাশার মধ্যে তুলনামূলক অবস্থান।

দারিদ্র্য এবং নির্মাণ করার ক্ষমতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক না থাকলেও দারিদ্র্যের ফলে উদ্ভূত শারীরিক এবং মানসিক পরিস্থিতি জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। দারিদ্র্যের ফলে শিশুর পুষ্টির অভাব ঘটে। চিকিৎসার অভাবে সুস্থ শরীর গড়ে ওঠে না। পিতামাতার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে শিশুর চিন্তাভাবনা ক্ষমতার যথাযথ বিকাশ ঘটে না, যা তার জ্ঞান নির্মাণ করার ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দারিদ্রতা শিশুর মনোজগতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। হীনমন্যতা, হতাশা, ক্ষমতাহীনতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রভৃতি শিশুর মধ্যে বাসা বাঁধে। যার ফলে শিশু আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তার নির্মাণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে দ্বিধা বোধ করে।

দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বিভিন্ন পরিবেশে এবং পরিবেশের বিভিন্ন দিকে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পায় না, ফলে তাদের যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় না, যা জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।

১.৭.৩ আধুনিক সংস্কৃতি (Modern Culture)

আধুনিক সমাজ-সংস্কৃতি শিশুর জ্ঞান নির্মাণে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা আলোচনা করার পূর্বে সংস্কৃতি কাকে বলে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

আধুনিককালের সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি ধারণা হল সংস্কৃতি। কিন্তু সংস্কৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া বেশ কঠিন। সংস্কৃতি সম্পর্কে একাধিক সংজ্ঞার উল্লেখ করা যায়। কারণ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংস্কৃতির মূল সুরটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্যে সংস্কৃতির পৃথক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কোনটিকেই সংস্কৃতির পূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। অথচ প্রতিটি সংজ্ঞার মধ্যেই কিছু না কিছু সমর্থনযোগ্য বিষয় আছে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা সম্পর্কে এরকম অসম্পূর্ণতা একটি আপেক্ষিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলা শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Culture' যা লাতিন শব্দ সংস্কৃতি বা 'Colere' হল কর্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সংস্কৃতি হল ব্যক্তি মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি প্রভৃতির মার্জিত রূপ। এ প্রসঙ্গে **জন ডিউই (John Dewey)** তাঁর 'Democracy in Education' পুস্তকে বলেছেন — সংস্কৃতি হল মার্জিত কিছু, পরিণত কিছু, এটি কাঁচা ও স্থূলের বিরোধী (Culture means at least something cultivated, something ripened, it is opposed to raw and crude)।

অনেকে আবার সংস্কৃতিকে শিক্ষার অর্থে ব্যবহার করেছেন। অধ্যাপক **ম্যাকেঞ্জি (J S McKenzie)**-র অভিমত অনুযায়ী ব্যাপক অর্থেই শিক্ষা সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয় বহন করে। সমাজতত্ত্বে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমাজের জনগণ পার্থিব চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বহু সামগ্রী তৈরি করে। একই সঙ্গে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির প্রয়োজন ও প্রভাবকে সমাজবদ্ধ মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। এই সবকিছুই হল সমাজের সদস্যদের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

উপরে উল্লিখিত সংস্কৃতির ব্যাখ্যা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্যক্তির সব ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যকালে জ্ঞান-নির্মাণের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল।

বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে ব্যক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সমাজ-সংস্কৃতির উন্নতির ফলে পরিবেশগত সুযোগসুবিধাগুলি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তি এই সুযোগগুলিকে ব্যবহার করে তার চাহিদাগুলিকে পূরণ করতে সচেষ্ট, শৈশব থেকে শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে। এ ব্যতীত পরিবেশের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে শিশুর মিথস্ক্রিয়া ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে এবং তার অভিজ্ঞতার পরিসর ও গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন জ্ঞান নির্মাণের জন্য যে দুটি শর্ত বিশেষ প্রয়োজন (সক্রিয়তা এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা) তার বৃদ্ধি জ্ঞান নির্মাণের কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

শিশুর জ্ঞান নির্মাণ এবং সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে **C. T. Fosnot**-এর বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **C. T. Fosnot** (1996)-এর মত হলো জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশ, সংকেত এবং পূর্ব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই পরিবেশ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(১) একটি শিশু যে পরিবেশে বড়ো হয়েছে সেখানে কোনো বস্তুর পরিমাপে মেট্রিক পদ্ধতি (সেন্টিমিটার, মিটার ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়। শিশুকে যদি অন্য এককে (যেমন ইঞ্চি, ফুট ইত্যাদি) কোনো সমস্যা সমাধান করতে হয়, সে অসুবিধা বোধ করে।

(২) একইভাবে বলা যায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিশু যে মাধ্যম ব্যবহার করে (ধরা যাক পুস্তক) তার পরিবর্তে অন্য মাধ্যম (যেমন বেতার, দূরদর্শন) থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়, সেক্ষেত্রে তার সমস্যা দেখা দেবে।

(৩) যে দলের সঙ্গে শিশু নিয়মিত যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া করে তার প্রভাব শিশুদের জ্ঞান-নির্মাণের উপর দেখা যায়। দলের মধ্যে যদি জ্ঞান নির্মাণের প্রকৃতি, সমস্যা সমাধানের পন্থা এমনকি সমাজ সমর্থিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা এবং মত বিনিময় করা হয় সেক্ষেত্রে জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে তার প্রভাব দেখা যায়।

উপরের উদাহরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জ্ঞান নির্মাণে সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১.৭.৪ বিশ্বায়ন (Globalisation)

বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়ন এক নয়। আবার ওয়ালার স্টাইসের বিশ্বব্যবস্থার ধারণা থেকেও বিশ্বায়ন ভিন্ন। মূলত বিশ্বায়ন হল এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা দুর্বল করে দিচ্ছে জাতিকে রাষ্ট্রকে এবং পশ্চিমের অনুরূপ রূপ পরিগ্রহণ করেছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো।

শিশুর জ্ঞান নির্মাণের ভূমিকার উপর বিশ্বায়নের প্রভাব জানতে হলে বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সহজভাবে বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করা। এই উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে একদিকে যেমন বিশ্ববাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের অবারিত আদানপ্রদান ঘটে, আর্থিক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটে, আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিক্ষার সমতা আসতে সাহায্য করে। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলির শিক্ষা সম্পর্কে তাদের নতুন চিন্তাধারা বা চিন্তাভাবনা, শিক্ষা কৌশল, পাঠক্রম ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অল্প উন্নত দেশগুলির শিক্ষা সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ এবং দক্ষ শিক্ষকগণ অন্যান্য দেশের সঙ্গে শিক্ষা বিনিময় করতে পারেন যার ফলে উভয় দেশই উপকৃত হয়। এইভাবে সমগ্র বিশ্বে শিক্ষা সংস্কারে এক আন্দোলনের সূচনা করে। বর্তমানে UNESCO এই ধরনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করছে।

বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য (Nature of Globalisation)

(১) ভৌগোলিক অবস্থার উর্ধ্বে নতুন সামাজিক বিন্যাস।

(২) জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন।

(৩) বিশ্বায়ন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া : বিশ্বমুখিতা ও স্থানিকতা।

(৪) বিশ্ব সামাজিক সম্পর্কের এবং বিনিময়ের ব্যাপ্তি, গভীরতা, গতি এবং প্রভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বায়নের সুফল (Merits of Globalisation)

(১) তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ

(২) সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন

(৩) বহুজাতিক সংস্থার বিকাশ

(৪) অর্থনৈতিক বিকাশ

(৫) সাংস্কৃতিক বিকাশ

বিশ্বায়নের গুরুত্ব (Importance of Globalisation)

(১) বিশ্বায়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ হয়েছে

(২) বিশ্বব্যাপী তথ্যের সম্প্রচার

(৩) Information is the power এটি বাস্তবায়িত হয়েছে

(৪) বহুজাতিক সংগঠন বা সংস্থার চরম বিকাশ

(৫) মানব চেতনা বিকশিত হয়েছে

(৬) যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে

(৭) বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে

(৮) জীবন সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নাগরিক সংহতি গড়ে উঠেছে

(৯) সামাজিক সনাতনী রীতিনীতির সংস্কার হয়েছে

(১০) জীবন উন্নয়নে যান্ত্রিক সভ্যতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ হয়েছে

মন্তব্য :

বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বে শিক্ষা সংস্কারে এক আন্দোলনের সূচনা করে। জ্ঞান নির্মাণের ক্ষমতার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞান নির্মাণে শিশুর পূর্বজ্ঞান এবং সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়নের ফলে শিশুর বিশ্ব ক্রমশ উন্মোচিত হয়। শিশু বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পায়। এইভাবে বিশ্বায়ন শিশুর বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞান সৃষ্টিকারী ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

১.৮ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে শৈশবের ধারণায় বৈচিত্র্য এবং ঐক্য (Commonalities and Diversity within the notion of Childhood with reference to Indian Context)

এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে বাল্যকালকে বিবেচনা করতে হবে।

(ক) ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে বাল্যকালের স্থায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। যেমন— আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের মধ্যে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও সংঘাত তাদের বাল্যকালকে ক্ষণস্থায়ী করে, তার শিক্ষাকালকেও অনেকক্ষেত্রে সংকুচিত করে।

আবার অন্যদিক থেকে দেখা যায় প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ কম পেলেও জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে অনেক আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশু জীবনের সমস্যা সমাধানে পটু হয়ে ওঠে। জীবনশৈলীর দক্ষতায় সে অনেকটা এগিয়ে যায়।

(খ) এছাড়া আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য-এর কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়ে ওঠা শিশুদের বাল্যকালের সময়গত ও প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ভিন্ন ভিন্ন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, মরু অঞ্চল বা পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে জীবনযাত্রা সমস্যা সঙ্কুল, যেখানে জীবনধারণের সংগ্রাম বেশি, সেইসব স্থানে বাল্যকাল থেকেই প্রত্যক্ষ প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ফলে তাদের মনোভাব যেমন দৃঢ় হয় তেমনি অনেক বেশি সমস্যা মোকাবিলার মানসিক শক্তি ও ক্ষমতা থাকে। এই সব বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে সারাদেশের মূল স্রোত-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া সমস্যাস্বরূপ। যদিও গণমাধ্যম-এর প্রভাবে এই সমস্যা অনেকটা দূর হয়েছে।

(গ) লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বাল্যকালে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। সমাজের প্রথা অনুসারে অনেক পরিবারেই ছেলে ও মেয়ে সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। ছেলে সন্তানদের ক্ষেত্রে যতদিন ধরে বাল্যকালের লক্ষণগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয় না। মেয়েদের ওপর দায়দায়িত্ব বেশি দেওয়া অথবা বাল্যকালচিত মুক্তির বা স্বাধীনতা ভোগে প্রশ্রয় না দেওয়া সাধারণ পরিবারের অতি পরিচিত চিত্র।

(ঘ) অভিভাবকত্ব শৈলী (Parenting) অনুসারে বাল্যকালের ধারণায় বৈচিত্র্য ও পার্থক্য দেখা যায়। বামরিন্ড (Barumrind D. 1976) তিন ধরনের অভিভাবকত্ব শৈলীর সন্ধান দিয়েছেন — কর্তৃত্বপরায়ণ (Authoritarian), স্বাধীনতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ (Authoritative), সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন (Permissive)। গবেষণায় দেখা গেছে এই ধরনের ভিন্নতা বাল্যকালের প্রকৃতি ও স্থায়িত্বে ভিন্নতা আনে।

কর্তৃত্বপরায়ণ অভিভাবকের সন্তানরা সর্বদাই পরিচালিত হয় বলে তাদের স্বাধীন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটতে দেরি হয়। ফলে বাল্যকালের অন্যতম মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীলতা বা সমস্যা সমাধানে সাহায্য প্রত্যাশা প্রভৃতি বেশি দিন ধরে থাকে।

যেসব অভিভাবক স্বাধীনতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তাভাবনার সম্ভাবনা, স্বনির্ভরশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাড়াতাড়ি দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণহীন অভিভাবকত্বে বাল্যকালের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা যায় না।

(ঙ) গ্রাম ও শহরে বাল্যকালের স্থায়িত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কে ইদানীং ভারতবর্ষে বিশেষভাবে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে অভিভাবকরা ছেলে ও মেয়েদের পৃথকভাবে দেখেন। ছেলেদের জীবিকা নির্বাচন ও মেয়েদের বিয়ে দেওয়া অভিভাবকদের কাছে একটি বড়ো সমস্যা, তাই বাল্যকালে লালনপালন ও শিক্ষাদানের চেয়েও এই সমস্যাগুলির প্রতি তারা অধিকতর দৃষ্টি দেন। অনেক ক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহ মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণ ঘটনা। বাল্যকালের বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ প্রকাশ ও চাহিদা পূরণ হওয়ার আগেই এইসব বাল্যকাল অপচয় হয়।

অপরপক্ষে শহরাঞ্চলের এক শ্রেণির অভিভাবক সদাসর্বদা ছেলেমেয়েদের সুরক্ষা দিতে প্রস্তুত। অধিক সুরক্ষিত এইসব ছেলেমেয়েরা কখনোই জীবনকে কাছ থেকে দেখার বা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় না। বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতালাভ বা চাহিদাপূরণ কোনটিই তাদের হয় না। অনেকদিন পর্যন্ত এরা জীবনে অপরিণত এবং সমস্যা সমাধানে অক্ষম মানুষ হিসেবে প্রকাশিত হয়।

বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাল্যকালকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এটি আসলে কয়েকটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়—

(ক) বাল্যকালের চাহিদা পূরণ —

(i) কৌতূহল উদ্দীপক পরিবেশ সৃষ্টি

(ii) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুসারে পাঠদান

(iii) কর্ম অভিজ্ঞতা

(iv) যথেষ্ট দায়িত্ব প্রদান

(v) খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের দৈহিক সঞ্চালন

(খ) বাল্যকালের সমস্যা দূরীকরণ —

(i) অভিভাবকদের সচেতন করা

(ii) শিক্ষকদের উপযুক্ত মনোভাব গঠন

(iii) বিষয়গুলির সমন্বিত শিখন

(iv) বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রতিটি পাঠকে সংযুক্তকরণ ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে বাল্যকাল সুস্থ পূর্ণবয়স্ক দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলার ভিত্তিকাল। এই ভিত্তি যত সুদৃঢ় হবে ভারতের সুনাগরিক গঠন ও মানবসম্পদের উন্নয়ন-এর সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পাবে।

১.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিশুর আকার ও আকৃতিগত পরিবর্তনকে বলে বৃদ্ধি। বিকাশ হল সামগ্রিক ক্রিয়াগত ও গুণগত পরিবর্তনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিকাশ পদ্ধতিগত দিক থেকে একটি জটিল প্রক্রিয়া। কোনো শিশুর একই সাথে কিন্তু ভিন্নহারে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, কর্মকুশলতা ও ভাষার বিকাশ ঘটে। বিকাশকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত করা যায়। এই স্তরগুলোতে ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ গুণগত পরিবর্তন ঘটে। বিকাশ প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন না বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে, এবিষয়ে বিশেষ মতপার্থক্য মনোবিদদের মধ্যে বর্তমান। বর্তমান দিনে শিশুর বিকাশ দারিদ্র্য, বিশ্বায়ন এবং আধুনিক সংস্কৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে শৈশবের ধারণায় বৈচিত্র্য ও ঐক্য লক্ষ করা যায়।

১.১০ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. বিকাশ হল—

(ক) আয়তন ও ওজন বৃদ্ধি
(খ) পরিণমনেই শেষ
(গ) জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া
(ঘ) বাল্যকাল থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত প্রক্রিয়া

২. বৃদ্ধি বলতে বোঝায়—

(ক) দৈর্ঘ্য ও আয়তন বৃদ্ধি
(খ) দৈর্ঘ্য, আয়তন ও ওজন বৃদ্ধি
(গ) পরিণমনে শেষ
(ঘ) দৈর্ঘ্য, আয়তন, ওজন বৃদ্ধি ও পরিণমনে সমাপ্তি

৩. পরিণমন হল—

(ক) স্বতঃস্ফূর্ত
(খ) অনুশীলনমূলক
(গ) প্রশিক্ষণ সাপেক্ষ
(ঘ) সবগুলি

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বিকাশ বলতে কী বোঝায়?

২. বৃদ্ধি কাকে বলে?

৩. বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪. সংস্কৃতি শব্দের অর্থ লেখো।

৫. বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝ?

৬. দারিদ্রতার অর্থ কী?

৭. নির্মিতিবাদ কাকে বলে?

C. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. বিকাশ বলতে কী বোঝ? বিকাশের স্তর বর্ণনা করো। নিরবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হিসাবে বিকাশের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায় ২

দৈহিক এবং সঞ্চালনমূলক বিকাশ
(Physical - Motor Development)

২.১ সূচনা (Introduction)

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.৩ বৃদ্ধি এবং পরিণমন (Growth and Maturation)

২.৪ শৈশব, প্রাক্-বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে স্থূল ও সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতার বিকাশ (Gross and Fine Motor Development Skills in Infancy, Pre-school Children and Elementary Children)

২.৫ শারীরিক এবং কর্মকুশলতার বিকাশে সুযোগ সৃষ্টির জন্য পিতা-মাতা ও শিক্ষকের ভূমিকা (যেমন খেলা) (Role of Parents and Teachers in providing opportunities for Physical-Motor Development; for example, Play) :

২.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

২.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

২.১ সূচনা (Introduction)

শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিকালে উত্তরণের সময় একটি শিশুর মধ্যে শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও বৌদ্ধিক ইত্যাদি নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সকল পরিবর্তনগুলোই শারীরিক এবং কর্মকুশলতার বিকাশের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এটি একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে একটি শিশু পরনির্ভরশীল থেকে ক্রমবর্ধমান স্বাধীনচেতায় উন্নীত হয়।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। বৃদ্ধি এবং পরিণমন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

২। কর্মকুশলতার বিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

৩। স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্মকুশলতার দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৪। কর্মকুশলতার বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া।

৫। কর্মকুশলতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া।

২.৩. বৃদ্ধি এবং পরিণমন (Growth and Maturation)

২.৩.১ বৃদ্ধি (Growth)

বৃদ্ধি বলতে বোঝায় শরীরের বিভিন্ন অংশ, অঙ্গ ও তন্ত্রের সার্বিক অগ্রগতিমূলক পরিবর্তন। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক ও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২.৩.২ বিকাশ (Development)

বিকাশ বলতে শিশুর আংশিক এবং সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নকে বোঝায়। এই পরিবর্তন যেমন শারীরিক হতে পারে; তেমনই মানসিক, সামাজিক এবং বৌদ্ধিক দিকেও হতে পারে।

২.৩.৩ পরিণমন (Maturation)

শিশুর পরিণত অবস্থার দিকে উত্তরণকে বলা হয় পরিণমন। সাধারণভাবে পরিণমন ব্যক্তির জিনগত বৈশিষ্ট্যাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবেশগত উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে পরিণমনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। মনোবিদ ম্যাকগেওক (J.A. McGeoch)-এর মতে, জৈবিক বিকাশের দরুন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন ছাড়াই আচরণ ধারার যে পরিবর্তন হয়, তাই হল পরিণমন। মনোবিদ বাল্ডওয়ার (Baldwar)-এর মতে, উৎকর্ষতা এবং অভিযোজন ক্ষমতার বৃদ্ধিকেই পরিণমন বলে (Maturation is an increase of competency and adaptibility)

বৃদ্ধি, বিকাশ এবং পরিণমন এই তিনটি পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম। বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্যক্ষমতার উন্নতি তথা বিকাশ সংঘটিত হয়। আবার বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে সাথে শিশু পরিণমনের দিকে এগিয়ে চলে। অর্থাৎ, বৃদ্ধি না হলে বিকাশ সম্ভব নয়; আবার বৃদ্ধি ও বিকাশ না হলে পরিণমন সম্ভব নয়।

২.৩.৪ বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Growth)

ক. বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘটে।

খ. বৃদ্ধি প্রক্রিয়া অনুশীলন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গ. বৃদ্ধি হল পরিমাণগত পরিবর্তন।

ঘ. বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য।

ঙ. বৃদ্ধি কেবলমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

চ. ব্যক্তিভেদে এবং বয়সভেদে বৃদ্ধির হার ভিন্ন ধরনের হয়।

২.৩.৫ পরিণমনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Maturation)

ক. পরিণমন ব্যক্তির স্বাভাবিক আচরণগত প্রক্রিয়া।

খ. পরিণমন একটি চাহিদা নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া।

গ. পরিণমন সুনির্দিষ্টভাবে ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। যদিও ধাপগুলির সময় এবং ব্যাপ্তি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ঘ. শারীরিক পরিণমন প্রথমত মস্তিষ্কে শুরু হয়; ক্রমশ তা উপাঙ্গের দিকে প্রসারিত হয়। একে সেফালোকডাল প্রবণতা (Cephalocaudal trend) বলা হয়।

ঙ. শারীরিক পরিণমন প্রথমত শরীরের মধ্যভাগে শুরু হয়; ক্রমশ তা পার্শ্বীয় দিকে প্রসারিত হয়। একে প্রক্সিমোডিস্টাল প্রবণতা (Proximodistal trend) বলা হয়।

২.৩.৬ বৃদ্ধি এবং পরিণমনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Growth and Maturation)

বৃদ্ধি	পরিণমন
১. বৃদ্ধি হল আকার ও আয়তনগত পরিবর্তন।	১. শিশুর পরিণত অবস্থার দিকে উত্তরণকে বলা হয় পরিণমন।
২. বৃদ্ধি শৈশব অবস্থা থেকে শুরু হয়।	২. পরিণমন বৃদ্ধি শেষ হবার পর থেকে শুরু হয়।
৩. বৃদ্ধি মূলত শারীরিক পরিবর্তন।	৩. পরিণমন শারীরিক, প্রাক্ষোভিক এবং বৌদ্ধিক পরিবর্তন।
৪. বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য।	৪. পরিণমন পরিমাপযোগ্য নয়।

২.৪ শৈশব, প্রাক্-বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে স্থূল ও সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতার বিকাশ (Gross and Fine Motor Development Skills in Infancy, Pre-school Children and Elementary Children)

২.৪.১ সঞ্চালন দক্ষতা (Motor skill)

সংশ্লিষ্ট স্নায়ু-পেশির সর্বাপেক্ষা অনুকূল সংযোগসাধনের মাধ্যমে কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাকে বলা হয় সঞ্চালন দক্ষতা। যেমন — একটি ফুটবল লাথি মেরে দূরে পাঠানোর জন্য শরীর, হাত ও পায়ের একটি নির্দিষ্ট সঞ্চালনের মাধ্যমে ফুটবলের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হয়।

পেশিতন্ত্র প্রাণীকুলের সবচেয়ে আদি তন্ত্র। শিশু যখন মাতৃ জঠরে বেড়ে ওঠে তখন প্রথম তৈরি হয় পেশিতন্ত্র; ক্রমশ অন্যান্য অঙ্গ ও তন্ত্রগুলো আবির্ভূত হয়। এই বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য তৈরি হয় স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্র যত বিকশিত হয়, সমন্বয় দক্ষতা তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন প্রাথমিক অবস্থায় একটি শিশু হাত-পা ছুঁড়তে পারে; কিন্তু হাঁটা, দৌড়ানো বা লাফানোর মতো অপেক্ষাকৃত জটিল কাজ করতে পারে না। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে অভ্যাসের মাধ্যমে সেগুলো করা হয়।

সঞ্চালনমূলক বিকাশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল :

(i) Cephalocaudal Law :

এই নীতি অনুসারে আগে মাথার দিক থেকে দক্ষতার বিকাশ ঘটতে শুরু করে এবং পরে তা ক্রমশ পায়ের দিকে ধাবিত হয়।

যেমন— শিশু প্রথমে শব্দের উৎস অনুযায়ী মাথা ঘোরায়। কিন্তু শব্দের উৎসের দিকে হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয় অনেক পরে।

(ii) Proximodistal Law :

এই নীতি অনুযায়ী দেহকাণ্ডের কাছাকাছি অঞ্চলের বিকাশ আগে ঘটে এবং দূরবর্তী অঙ্গের দক্ষতা দেরিতে বিকাশ লাভ করে।

যেমন— শিশু আগে বাহুমূল থেকে গোটা হাত সঞ্চারিত করতে পারে। অনেক পরে তারা আঙুলের ব্যবহার শেখে।

২.৪.২ সঞ্চালন দক্ষতার বিকাশ (Development of motor skill)

শিশুর জন্মের সময় স্নায়ুতন্ত্র অপরিণত অবস্থায় থাকে। শৈশবাবস্থায় শিশুর বৃদ্ধির সাথে সাথে স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয় ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। ফলস্বরূপ, ক্রমবর্ধমান জটিলতর কাজ তার কাছে অনায়াসসাধ্য হয়ে ওঠে। যেমন —

বয়স ৬ মাস — সোজা হয়ে বসতে পারে

বয়স ১২ মাস — পদক্ষেপ ফেলতে পারে

বয়স ২৪ মাস — লাফাতে পারে

বয়স ৩৬ মাস — কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটতে পারে, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দৌড়াতে পারে।

২.৪.৩ সঞ্চালন দক্ষতা বিকাশের স্তর (Stages of motor development)

সঞ্চালন দক্ষতা তিনটি স্তরে সংঘটিত হয় — প্রজ্ঞামূলক, সহায়ক এবং স্বনিয়ন্ত্রিত। নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রজ্ঞামূলক স্তর (Cognitive phase) : যখন কোনো শিশুর কাছে কোনো একটি বিশেষ কাজ উপস্থিত হয়, তখন তার মনে প্রাথমিকভাবে যে চিন্তা আসে তা হল তাকে ঠিক কী করতে হবে। এই চিন্তনের মাধ্যমে সে ঠিক করে তার উপযোগী কর্মপন্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। সঠিক কর্মপন্থা গৃহীত হয় এবং অপ্রয়োজনীয় কর্মপন্থা বর্জিত হয়। দক্ষতার বিকাশ এই সময়ে বেশ দ্রুতহারে ঘটতে থাকে।

সহায়ক স্তর (Associative phase) : এই স্তরে সর্বাপেক্ষা উপযোগী কর্মপন্থা নির্বাচিত হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সঞ্চালনের উপাদানগুলোর মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠে। সঞ্চালন দক্ষতার ক্রমশ উন্নতি ঘটে এবং ধারাবাহিকতা গড়ে ওঠে। এই স্তরটি বেশ দীর্ঘ সময় ধরে চলে। এই সময় দক্ষতা বেশ সাবলীল, কর্মক্ষম ও নান্দনিক হয়।

স্বনিয়ন্ত্রিত স্তর (Autonomous phase) : এই স্তর শুরু হতে কয়েক মাস সময় থেকে বছর লেগে যেতে পারে। এই স্তরে দক্ষতা মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ঘটে থাকে। যেমন — কথা বলতে বলতে হাঁটা, গান শুনতে শুনতে হাতের কাজ করা ইত্যাদি।

২.৪.৪ স্থূল সঞ্চালন দক্ষতা (Gross motor skill)

এই ধরনের দক্ষতার ক্ষেত্রে কোনো কাজ করার সময় ব্যবহৃত হয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পেশিসমূহ। যেমন — হাঁটা, হামাগুড়ি দেওয়া, দৌড়ানো ইত্যাদি। এই ধরনের দক্ষতায় অত্যন্ত জটিল স্নায়ু সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের দক্ষতা অধিকাংশ শৈশব স্তরেই বিকশিত হয়। এই ধরনের দক্ষতা একবার গড়ে উঠলে তা আর বিনষ্ট হয় না।

২.৪.৫ সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতা (Fine motor skill)

এই ধরনের দক্ষতায় সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পেশিসমূহ ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেত্রে স্নায়ু সমন্বয় অনেক সংক্ষিপ্ত ও জটিল। এই ধরনের দক্ষতার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। অভ্যাসের ফলে পূর্বে গড়ে ওঠা দক্ষতা বিনষ্ট হয়। যেমন — গিটার বাজানো, বাস্কেট বল স্যুটিং, ভিডিও গেম খেলা ইত্যাদি।

২.৪.৬ স্থূল ও সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতার বিকাশ

- **শৈশবকালে সঞ্চালন দক্ষতার বিকাশ**— প্রথম ২ বছর (Infancy)

অতি শৈশবকালকে মনোবিজ্ঞানীরা **Toddler** বলেন। এই সময়ে শিশু দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে দ্রুত বাড়ে। ২ বছর বয়সে শিশুর জন্মের সময়ের ওজন অপেক্ষা প্রায় পাঁচ গুণ বাড়ে। 2/7 মাসে শিশুর দুধে দাঁত উঠতে আরম্ভ করে যার ফলে তাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয়। মাথায় বৃদ্ধির হার কমে আসে এবং পরিবর্তন হয়। দেহের নিম্নভাগের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। যা

নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হল —

বয়স	সঞ্চালনমূলক কার্যাবলি
জন্মের পর —	চোখ খুলতে ও বোজাতে পারে, হাত-পা নাড়ে।
2 মাসে —	ঘাড় শক্ত হয়, বিছানায় শুয়ে মাথা তুলতে চেষ্টা করে।
4 মাসে —	অন্যের সাহায্য পেলে বসতে পারে।
6 মাসে —	নিজে বসতে চেষ্টা করে, ঝোলানো জিনিস ধরতে পারে।
8 মাসে —	কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে।
9 মাসে —	হামাগুড়ি দেয়।
10-11 মাসে —	অন্যের হাত ধরে দাঁড়াতে পারে।
12 মাসে —	নিজে নিজে দাঁড়াতে চেষ্টা করে।
13 মাসে —	ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে।
14 মাসে —	নিজে দাঁড়াতে পারে এবং হাঁটার চেষ্টা করে।
18 মাসে —	দৌড়োয়, কোনো কিছু টানতে বা ধাক্কা দিতে পারে। আস্তে আস্তে নিজে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে চেষ্টা করে।
2 বৎসরে —	বেশি দৌড়োদৌড়ি করে, তবে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ছোটো ছোটো জিনিস দিয়ে একটির উপর একটি সাজাতে পারে। লম্বালম্বি লাইন টানতে পারে কিন্তু অনুভূমিক লাইন টানতে পারে না।

- **প্রথম বাল্যকাল (2 বছর থেকে 6 বছর) (Early Childhood)**

শারীরিক বিকাশ (Physical Development) : শৈশবকালের মতো এই স্তরে শারীরিক বিকাশ তত দ্রুত ঘটে না। দৈহিক বৃদ্ধির মধ্যে সমতা পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। পায়ের দিকের বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে এবং মোট উচ্চতার প্রায় অর্ধেক হয়। মাথায় অংশের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে ঘটে এবং মধ্য অংশের বৃদ্ধি মাঝারি ধরনের হয়। পেশি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ পেশিগুলি ক্ষুদ্র পেশি অপেক্ষা দ্রুত ও সুষমভাবে বৃদ্ধি পায়।

প্রাক্‌বাল্যকালেই বিভিন্ন রকমের চলনমূলক দক্ষতা (Motor Skill) তৈরি হয়ে যায়। নিজের খাওয়া, পোশাক পরা, চুল আঁচড়ানো, খেলনা দিয়ে খেলা, পেনসিলের ব্যবহার, লাফানো ইত্যাদি 5/6 বছরেই শিশু করতে পারে।

2 বছরের শিশু সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে, দৌড়োতে, লাফাতে, নকল করতে, নিজেকে চিনতে পারে এবং রং বুঝতে পারে।

3 বছরের শিশু স্কিপিং, হপিং, বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

4 এবং 5 বছরের শিশু স্বাধীন এবং সক্রিয়ভাবে চলাফেরা করতে পারে, সংগীতের তালে নাচতে পারে, বিভিন্ন রঙের নাম করতে পারে। রং এবং আকৃতির মিলন (Match) ঘটাতে পারে।

সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor Development) : শিশুর সঞ্চালন বিকাশ বলতে বোঝায় তার শক্তি এবং গতির বিকাশ এবং কত নিখুঁতভাবে সে তার হাত, পা ও শরীরের অন্যান্য পেশি ব্যবহার করতে পারছে। শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সঞ্চালন বিকাশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।

প্রথম বাল্যকালের সঞ্চালন বিকাশের উপর একটি তালিকা দেওয়া হল —

2 বছরে →	বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। কী করা উচিত, কী করা উচিত নয় তা ঠিক করতে পারে না। বিকল্প থাকলে কোন্‌টা গ্রহণ করবে তা বুঝে উঠতে পারে না। শিশুর শারীরিক ব্যাপারে অস্থিরতা দেখা দেয়।
3 বছরে →	জেদি মনোভাব দেখা যায়। হাঁটার সময় ভারসাম্য রক্ষা করতে হাত দুটো ছড়িয়ে রাখতে হয় না। বড়োদের মতো হাত দুলিয়ে হাঁটে। হাঁটার গতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। উল্লম্ব ও অনুভূমিক রেখা দিয়ে কাজ করতে পারে। '+' বা '–' আঁকতে পারে।
4 বছরে →	খুব ছোটাছুটি করে, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, লাফাতে এবং স্কিপিং করতে পারে, আগের সঞ্চালনমূলক আচরণ পরিণত হয়।
5 ও 6 বছরে →	পেশি নিয়ন্ত্রণে আসে, খেলায় বড়োদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বল ধরা এবং ছোড়া ইত্যাদি পারে। বোতাম লাগানোর কাজ করতে সক্ষম হয়। ছবিতে রং লাগানোর সময় রং ছবির বাইরে যায় না, ছোটো ছোটো যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারে।

- **প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তর (Pre-School Stage) : 6 বছর থেকে 11 বছর**

দৈহিক বা শারীরিক বিকাশ (Physical Development) : জীবন বিকাশের এই স্তরটি অনন্য স্তর বলে বিবেচিত হয়। আকারে ও ওজনে মস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্কদের মতো হয়। সবচেয়ে ভালো স্বাস্থ্য এই বয়সেই দেখা যায়। কার্যাবলির বৈচিত্র্য ও পরিমাণ পূর্বের থেকে অনেক বেশি, এমনকি পরবর্তী স্তরেও এত দেখা যায় না। কার্যাবলির বৈচিত্র্য ও পরিমাণ পূর্বের থেকে অনেক বেশি, এমনকি পরবর্তী স্তরেও এত দেখা যায় না। এই বয়সেই সহ্যশক্তি বৃদ্ধি পায়। সহজেই ক্লান্ত হয় না। এই বয়সেই বালক-বালিকাদের পরিবারের বাইরে একটা জীবন তৈরি হয় এবং স্বাভাবিক আগ্রহ বয়স্কদের প্রভাব মুক্ত হতে চায়।

এই স্তরে দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয়। বালিকারা দৈহিক বিকাশে ছেলেদের তুলনায় দুই বৎসর এগিয়ে থাকে। শৈশবের দাঁত ভেঙে যায়। মুখমন্ডলের পরিবর্তন ঘটে। কপাল চওড়া হয়, নাক তীক্ষ্ম হয়, মুখ বিস্তৃত হয় এবং খেলার মাধ্যমে চলন দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor Development) : এই স্তরে কায়িক পরিশ্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, ক্লান্তি প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ***W.F. Dearbrone***-এর মতে, এই বয়সে কঠোর পরিশ্রমের একটা দৈহিক চাহিদা দেখা যায়। পেশিগুলি বিকশিত হয় সেজন্য অনুশীলন বা চচার প্রয়োজন হয়। 9 থেকে 11 বৎসরের বালকদের চূড়ান্ত গতিশীলতা দেখা যায়। তারা হাঁটে না, সর্বদা দৌড়োয়, সর্বদা অধিক পরিশ্রমের কাজ করে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ এবং পেশিগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেখা দেয়।

২.৫ দৈহিক এবং কর্মকুশলতার বিকাশে সুযোগ সৃষ্টির জন্য পিতা-মাতা ও শিক্ষকের ভূমিকা (যেমন- খেলা) (Role of Parents and Teachers in providing opportunities for Physical-Motor Development; for example, Play)

কোনো শিশুর বিকাশের সময় প্রাথমিকভাবে পিতা-মাতা ও পরবর্তী সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা রোল মডেল বা আদর্শ স্থানীয় হিসাবে পরিগণিত হন। তাই শিশুর সুষম বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যহারের জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলি প্রদান বা তার অনুশীলনের জন্য মানসিক চাহিদা সৃষ্টি করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

২.৫.১ পিতা-মাতার ভূমিকা

১. শিশুর সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সহজপাচ্য এবং সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. নিয়মিত দাঁত মাজা, স্নান করা, সঠিক সময়ে খাওয়া ও ঘুমের অভ্যাস, নিয়মিত নখ, কান পরিষ্কার করা ইত্যাদি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি আচরণের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে এবং তা অনুশীলন করাতে হবে।

৩. ধীরে ধীরে কথা বলা, অন্যকে মর্যাদা দেওয়া ইত্যাদি সুশিক্ষা দিতে হবে এবং তা অভ্যাস করাতে হবে।

৪. খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে শিশুদের উৎসাহ দেবার জন্য তাদের সাথে নিয়মিত খেলতে হবে।

৫. নিয়মিতভাবে খেলার মাঠে বা পার্কে শিশুকে নিয়ে যেতে হবে। অন্যদের সাথে মেলামেশা করায় বা খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিতে হবে।

৬. খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে দিতে হবে যাতে শিশুর আগ্রহ বাড়ে।

৭. কর্মকুশলতার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাজল্, ব্লক তৈরি ইত্যাদি খেলায় উৎসাহ দিতে হবে।

৮. মনে রাখতে হবে শিশুকে অবজ্ঞা না করে তাকে সম্মান দেখাতে হবে। প্রত্যুত্তরে সেও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

৯. সমাজ, সংস্কৃতির সাথে পরিচয়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, মেলায় শিশুকে নিয়ে যেতে হবে।

১০. বাড়ির সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির জন্য পিতা-মাতার আচরণ অনেক বেশি পরিশীলিত হবে।

২.৫.২ শিক্ষকের ভূমিকা

১. শিশুর সাথে এমনভাবে মিশতে হবে যাতে সে শিক্ষককে ভয় না পেয়ে তার সাথে বন্ধুর মতো মিশতে পারে।

২. বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেইগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

৩. নিয়মিত শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। কোনোরূপ অসুবিধা লক্ষ করলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিভিন্ন ধরনের সৃজনাত্মক কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন — ছবি আঁকা, মাটির পুতুল তৈরি করা ইত্যাদি।

৫. ভালো কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু খারাপ কাজ করলে তিরস্কার না করে তাকে বোঝাতে হবে।

৬. শিশুদের দলগত খেলায় উৎসাহ জোগাতে হবে।

৭. একটানা দীর্ঘক্ষণ না খেলিয়ে মাঝে মাঝে অল্প বিশ্রাম দিতে হবে।

৮. বিভিন্ন ধরনের খালি হাতের ব্যায়াম ও যোগাসন অভ্যাসের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

৯. ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নিয়মিত নির্দেশাবলি দিতে হবে।

১০. বিদ্যালয়ে Health card-এ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য এবং কর্মকুশলতার দক্ষতার পরিমাপ উল্লেখ করতে হবে।

২.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

বৃদ্ধি বলতে বোঝায় শরীরের বিভিন্ন অংশ, অঙ্গ ও তন্ত্রের সার্বিক অগ্রগতিমূলক পরিবর্তন। বিকাশ বলতে শিশুর আংশিক এবং সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নকে বোঝায়। শিশুর পরিণত অবস্থার দিকে উত্তরণকে বলা হয় পরিণমন। বৃদ্ধি, বিকাশ এবং পরিণমন এই তিনটি পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম। সংশ্লিষ্ট স্নায়ু-পেশির সর্বাপেক্ষা অনুকূল সংযোগসাধনের মাধ্যমে

কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাকে বলা হয় সঞ্চালন দক্ষতা। সঞ্চালন দক্ষতা তিনটি স্তরে সংঘটিত হয় — প্রজ্ঞামূলক, সহায়ক এবং স্বনিয়ন্ত্রিত। এই ধরনের দক্ষতার ক্ষেত্রে কোনো কাজ করার সময় ব্যবহৃত হয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পেশিসমূহ। এই ধরনের দক্ষতায় সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পেশিসমূহ ব্যবহৃত হয়। কোনো শিশুর বিকাশের সময় প্রাথমিকভাবে পিতা-মাতা ও পরবর্তী সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. শিশুর বিকাশে 'Proximodistal' কথার অর্থ—

(ক) প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের দিকে (খ) কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে

(গ) উপর থেকে নীচের দিকে (ঘ) নীচ থেকে উপরের দিকে

২. শিশুর ভাষাবিকাশের কোন স্তরে 'ব্যাবলিং' দেখা যায়?

(ক) ২-৪ মাস (খ) ৪-৬ মাস

(গ) ১০-১২ মাস (ঘ) ১২-১৪ মাস

৩. 'Cephalocandal' বলতে বোঝায় চলনের বিকাশ

(ক) নিম্নভাগ থেকে ঊর্ধ্বভাগে (খ) ঊর্ধ্বভাগ থেকে নিম্নভাগে

(গ) মধ্যভাগ থেকে ঊর্ধ্বভাগে (ঘ) মধ্য থেকে নিম্নভাগে আসা

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বিকাশের দুটি নীতি লেখো।

২. শিখনে পরিণমনের গুরুত্ব লেখো।

৩. পরিণমন কাকে বলে?

৪. বৃদ্ধি ও পরিণমনের মধ্যে সম্পর্ক লেখো।

৫. 'Proximodistal Devlopment' কী?

৬. 'Cephalocandal Development' বলতে কী বোঝ?

৭. দুই বছর বয়সের শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

C. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. শৈশবের সঞ্চালমূলক বিকাশের দক্ষতাগুলি বর্ণনা করো।

২. প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরে শিশুদের সঞ্চালমূলক বিকাশের দক্ষতাগুলির পরিচয় দিন।

D. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. বৃদ্ধি ও পরিণমনের অর্থ বিশ্লেষণ করো। বৃদ্ধি ও পরিণমনের বৈশিষ্ট্য ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা কর।

২. শিশুর শৈশব, প্রাক-বিদ্যালয় ও প্রাথমিক স্তরে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৩

সামাজিক বিকাশ
(Social Development)

৩.১ সূচনা (Introduction)

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.৩ সামাজিকীকরণের ধারণা (Concept of Socialization)

৩.৪ পিতা-মাতার থেকে শিশুর বিচ্ছিন্নতা : ক্রেশ এবং অনাথ আশ্রম (Separation of Parents : Children in Creches and Orphanages etc.)

৩.৫ বিদ্যালয় জীবন (Schooling)

৩.৬ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ (Development of Children through Socialization Process)

৩.৭ ব্যক্তিত্বের বিকাশ : ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তরসমূহ (Personality Development : Freudian Stages of Development):

৩.৮ এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশের স্তরসমূহ (Psycho-Social Development – Stages as proposed by Erikson)

৩.৯ সামাজিক তত্ত্ব এবং লিঙ্গগত বিকাশ (Social Theory and Gender Development)

৩.১০ সারসংক্ষেপ (Summary)

৩.১১ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

৩.১ সূচনা (Introduction)

সমাজ একটি সর্বজনীন ধারণা। ব্যক্তি সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, জীবন অতিবাহিত করে এবং সমাজের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। মানব শিশু সামাজিক বা অসামাজিক হয়ে জন্মায় না, কেবল একটি ইন্দ্রিয় সর্বস্ব প্রাণী থাকে। এই ইন্দ্রিয় সর্বস্ব প্রাণী তার চারপাশের প্রাকৃতিক, সামাজিক পরিবেশের সাথে অনবরত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সামাজিক সত্ত্বা হয়ে ওঠে। একটি শিশুর সামাজিক সদস্য হয়ে ওঠার জন্য তার যথাযথ সামাজিক বিকাশ (Social Development)-এর প্রয়োজন হয়। শিশুর সামাজিক বিকাশের সাথে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সংযুক্ত। এই বিকাশমূলক পরিবর্তনে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক শিখন প্রক্রিয়া তথা সামাজিকীকরণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর সামাজিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Personality Development)-এর অগ্রগতি এবং পরিপূর্ণতা আবার নির্ভর করে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং সম্পর্কের বিন্যাসের উপর। যেমন পরিবার, বিদ্যালয় এবং পিতা-মাতা ও শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি, যা সামগ্রিকভাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। সামাজিকীকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

২। সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশ, পিতা-মাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক এবং শিশু প্রতিপালন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ।

৩। ক্রেশ (Creches) এবং অনাথ-আশ্রম (Orphanages)-এর ভূমিকা বিষয়ক ধারণা লাভ।

৪। বিদ্যালয়ের সাথীগোষ্ঠী (Peer-group) এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক ধারণার স্পষ্টকরণ।

৫। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে কীভাবে শিশুর বিকাশ ঘটে তা অনুধাবন করা।

৬। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের (Freud) তত্ত্বের পর্যালোচনা করা।

৭। এরিকসন (Erikson) প্রদত্ত মনোসামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৮। লিঙ্গভূমিকা (Gender role) এবং এর প্রভাব, গতানুগতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা গঠন।

৩.৩ সামাজিকীকরণের ধারণা (Concept of Socialization)

জন্মের সময় শিশুর শুধুমাত্র একটি জৈব সত্ত্বা থাকে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই জৈব সত্ত্বা সামাজিক ব্যক্তি মানুষে পরিণত হয় সাধারণভাবে তাকে সামাজিকীকরণ বলে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব শিশু সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আদবকায়দা, আচার-আচরণ ও ভাবাদর্শ শেখার মাধ্যমে সামাজিক জীব হয়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানী Arnold Green-এর মতে, "Socialization is the process by which the child acquires a cultural content along with selfhood and personality." অর্থাৎ, সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো শিশু তার নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয় এবং তার আত্মবোধ (Selfhood) ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। Ogburn এবং Nimkoff তাঁদের "A Hand Book of Social Psychology" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "Socialization is the process by which the individual learns to confirm to the norm of the group." অর্থাৎ, সামাজিকীকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার নিজ গোষ্ঠীর আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব শিশু তার নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির কাঙ্খিত এবং সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠে তাকে সামাজিকীকরণ (Socialization) বলে।

সংস্কৃতির মতো সামাজিকীকরণেও শিখন (Learning) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে যেমন লক্ষ করা যায়, পরিবারে কোনো বয়স্ক অতিথি এলে, শিশু সদস্যকে বলা হয় প্রণাম বা নমস্কার, সেলাম করে সম্মান জানাতে। এইভাবে শিশু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আচার-আচরণসমূহ ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে এবং সমাজের উপযুক্ত সদস্য হয়ে ওঠে। এভাবেই পরিবার, শিক্ষালয়, বন্ধুগোষ্ঠী, ধর্ম, গণমাধ্যম, রাষ্ট্র, সাহিত্য ইত্যাদি মাধ্যম (Agency)-এর দ্বারা শিশুর সামাজিক প্রকৃতি এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সমাজের যোগ্য সদস্য রূপে গড়ে তোলাই হল সামাজিকীকরণ।

৩.৩.১ সামাজিকীকরণ এবং পারিবারিক পরিবেশ (Socialization and Family Environment)

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের মতো প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিশু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেখানেই তার লালনপালন হয়, সেখানেই শিশু আচরণধারা শেখে এবং তার প্রাথমিক শিক্ষাও শুরু হয় পরিবার থেকে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নীতিবোধের গঠন হয় গৃহ পরিবেশ থেকেই। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী সহ সন্তান-সন্ততির লালনপালনের জন্য যথার্থ ও স্থায়ী গোষ্ঠীকে পরিবার বলা হয়। পরিবারে পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি ছাড়াও অন্যান্য সম্পর্কের সদস্যরাও থাকেন, সবাইকে নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসে গড়ে ওঠে পারিবারিক পরিবেশ (Family Environment)। পারিবারিক পরিবেশের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক বিকাশের গতিধারা, কারণ পরিবারের মধ্যে শিশু তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। কীভাবে পোশাক পরিচ্ছদ পরতে হয়, কীভাবে খাবার খেতে হয়, সঠিক আচরণধারা কী হওয়া উচিত, আবেগের সংযত বহিঃপ্রকাশ কীভাবে করতে হয় — শিশু তা গৃহপরিবেশের শিক্ষা থেকেই শিখতে পারে।

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সহযোগিতামূলকভাবে একত্রে বসবাসকারী প্রাথমিক গোষ্ঠীকে পরিবার (Family) বলে।

শিশুর সামাজিকীকরণের ভিত্তিপ্রস্তর হল পরিবার। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই শিশুর চারিত্রিক গুণাবলিগুলি বিকশিত হয়। বস্তুত পরিবারই শিশুকে বৃহত্তর সমাজের সাথে পরিচিত করায় এবং সমাজের উপযোগী করে তোলার জন্য তার সামাজিকীকরণে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। শিশুর সাথে সমাজের সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবার ভিত্তি এবং মাধ্যমরূপে কাজ করে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার কর্তৃক শিশুর সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন

পরিবারে থেকেই শিশু সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং আবার পরিবারেই ফিরে আসে। অনেক সময় পরিবারের আকার শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। যেমন একক পরিবারের (Nuclear family) শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী হতে পারে আবার যৌথ পরিবারের (Joint Family) শিশুরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সহযোগী মনোভাবাপন্ন এবং বর্হিমুখী হয়। অনুকূল গৃহ পরিবেশ শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করে আবার প্রতিকূল গৃহ পরিবেশ শিশুর সামাজিক বিকাশ এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এবং সামাজিকীকরণ ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। শিশুর সুষম সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অনুকূল গৃহ পরিবেশের কতগুলি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল —

- শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়ক।
- শিশুর নীতিবোধ গঠনে কার্যকরী।
- আচরণধারা, আদর্শ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ গঠন।
- আবেগের যথাযথ বহিঃপ্রকাশে সহায়ক।
- আত্মসম্মান, আত্মপ্রত্যয় গঠন।
- আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় ভাবানুভূতির বিকাশ।
- ভবিষ্যৎ পৃথিবী এবং অপ্রত্যাশিত অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা প্রদান।

৩.৩.২ সামাজিকীকরণ এবং পিতা-মাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক (Socialization and Parent-Child Relationship)

পরিবার হল শিশুর কাছে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। শিশু সর্বদাই তার পিতা-মাতার সান্নিধ্য কামনা করে। জন্মের পর থেকেই শিশু তার পিতা-মাতার উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল থাকে। শিশুর সমস্ত মৌলিক চাহিদাগুলি, যেমন খাদ্য, নিরাপদ আশ্রয়, স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদির পূরণ সম্ভব হয় পিতা-মাতার মাধ্যমে। স্বভাবতই শিশুর সাথে পিতা-মাতার ঘনিষ্ঠ বন্ধন তৈরি হয়। পিতা-মাতার সাথে শিশুর স্বাভাবিক ও সুস্থ সম্পর্ক শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সদর্থক ভূমিকা পালন করে। শিশুর সাথে তার পিতা-মাতার ভালো সম্পর্ক অনেকটা নির্ভর করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কের বিন্যাসের উপর।

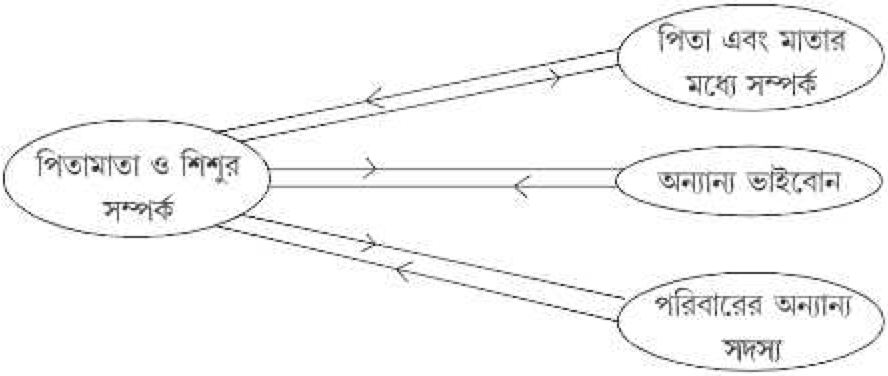

পিতা-মাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক এবং অন্যান্য সম্পর্কের বিন্যাস

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিশুর সুসম্পর্কের প্রয়োজন থাকলেও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং যথার্থ সামাজিকীকরণের জন্য শিশুর সাথে তার পিতা-মাতার সুসম্পর্ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সাথে তার পিতা-মাতার উত্তম সম্পর্ক শিশুর সামাজিক বিকাশ তথা সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সদর্থক প্রভাব ফেলে। যেমন —

ক. শিশুর সঠিক লালনপালন ও যত্ন

খ. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি

গ. সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ

ঘ. ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ

ঙ. সুদৃঢ় চারিত্রিক গঠন

চ. সহানুভূতি, সহমর্মিতার প্রকাশ

ছ. সহযোগী মনোভাব গঠন

জ. সফল ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা।

অপরদিকে পিতা-মাতার সাথে শিশুর খারাপ সম্পর্ক, বিচ্ছিন্নতা, দূরত্ব শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরির সাথে সাথে শিশুর সামাজিকীকরণ তথা সামাজিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন —

ক. শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা তৈরি হয়।

খ. শিশুর মধ্যে ভীরুতা দেখা দেয়।

গ. ব্যক্তিত্বের ত্রুটিপূর্ণ বিকাশ।

ঘ. মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।

ঙ. চারিত্রিক দুর্বলতা তৈরি।

চ. অপরাধ প্রবণতার সম্ভাবনা।

ছ. অসহযোগী মনোভাব গঠন।

জ. অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা।

৩.৩.৩ শিশু প্রতিপালন পদ্ধতিসমূহ (Child Rearing Practices)

একজন নবজাতক সম্পূর্ণভাবে পরিবারের যত্ন ও পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল। শিশুর যথাযথ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তার শারীরিক ও মানসিক মৌলিক চাহিদাগুলি পরিপূর্ণ হয়। পিতা-মাতার নিঃস্বার্থ সেবাযত্ন শিশুর ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয়। শিশুর প্রতিপালন ত্রুটিপূর্ণ হলে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়। নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে সংস্কৃতি নির্ধারিত পন্থায় শিশুর প্রতিপালন শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনে উত্তম গুণাবলি অর্জনে এবং সুষম বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। শিশু মনোবিদরা শিশু প্রতিপালনের জন্য কতগুলি বিশেষ পদক্ষেপের কথা বলেন —

ক. **পুষ্টিকর আহার এবং আহারের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান :** শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে অন্যতম হল খাদ্য যা সরাসরি শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশে সহায়তা করে। তাই পুষ্টিযুক্ত আহার এবং স্বাস্থ্যকর আহারের পরিবেশ প্রদান করা প্রয়োজন।

খ. **সু-অভ্যাস গঠন :** খাদ্যগ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ, শয়ন, স্নান ইত্যাদি কার্য যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সু-অভ্যাস গঠনের উপর জোর দিতে হবে।

গ. **নিরাপত্তা প্রদান :** শিশুর লালনপালনের সময় তার দৈহিক, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা প্রদান করা প্রয়োজন যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুর বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়।

ঘ. **ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রদান :** শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে ভালোবাসা এবং স্নেহ পাওয়ার চাহিদা হল অন্যতম। তাই শিশুর লালনপালনে যথেষ্ট ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদান সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশে সদর্থক ভূমিকা পালন করবে।

ঙ. **লিঙ্গভেদে সমনীতি অনুসরণ :** শিশুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে অর্থাৎ ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষপাতিত্ব তৈরি হয় যা শিশু মনে প্রভাব ফেলে তাই শিশুর পরিচর্যার ক্ষেত্রে সমনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

চ. **মিথষ্ক্রিয়ার উৎসাহ দান :** শিশু তার চারপাশের পরিবেশ এবং মানুষজনের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা শিশুর বিকাশে পরিপূরক তাই শিশুর প্রতিপালনের সময় শিশু যাতে বেশি করে প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ তথা বাইরের জগতের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করতে পারে তার জন্য সহায়ক সুযোগদান ও উৎসাহদান করতে হবে।

শিশুর শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা গঠনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে উপযুক্ত গৃহপরিবেশ এবং স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে যাতে শিশুর মধ্যে আত্মশৃঙ্খলা গঠিত হয়। শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন শিশুর উপর জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া, কঠোর অনুশাসন, শাস্তি প্রদান, অবিশ্বাস করা, মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা করা, সন্দেহ করা, সর্বদা বিরোধ করা ইত্যাদি শিশুর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যা তার সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ তথা সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৩.৪ পিতা-মাতার থেকে শিশুর বিচ্ছিন্নতা : ক্রেশ এবং অনাথ আশ্রম (Separation of Parents : Children in Creches and Orphanages etc.)

পিতা-মাতার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কার্যত শিশু তার পিতা-মাতা এবং তার পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে। এই নির্ভরশীলতা শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক চাহিদার অনুসারী হয়। স্বাভাবিকভাবে শিশু তার পিতা-মাতার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে, শিশুকে নানা প্রকার সংকটের সম্মুখীন হতে হয় —

ক. খাদ্য এবং লালনপালন সংক্রান্ত সংকট

খ. দৈহিক এবং মানসিক নিরাপত্তাজনিত সংকট

গ. প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশজনিত সংকট

ঘ. কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা, উষ্ণতা, স্নেহের অভাবজনিত সংকট

পিতামাতার থেকে শিশুর বিচ্ছিন্নতার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সংকট শিশুর উপর নানাবিধ প্রভাব ফেলে —

ক. অসহায়তা বৃদ্ধি

খ. হীনমন্যতার প্রবণতা

গ. পিতা-মাতার প্রতি অবিশ্বাস বৃদ্ধি

ঘ. অসুস্থতার প্রকোপ

ঙ. আগ্রাসন মনোভাবের প্রবণতা

চ. সহানুভূতি সহমর্মিতার অভাব

ছ. একাকীত্ব তৈরির সম্ভাবনা

জ. সংকীর্ণতা এবং অন্তঃমুখিনতার সৃষ্টি

ঝ. ঘৃণা এবং হিংসাত্মক আচরণের প্রভাব বৃদ্ধি

ঞ. ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিভিন্ন প্রকার বিকৃতির প্রভাব।

বর্তমানে সামাজিক কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন অর্থাৎ আধুনিকীকরণ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন-এর ফলে সমাজজীবনেও এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পিতা-মাতা এবং সন্তান সহ একক পরিবারে অনেক সময় পিতামাতা উভয়ই চাকুরিজীবী হলে সন্তানের দেখভালে দায়িত্ব বর্তায় তৃতীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর। আবার পিতামাতার বিচ্ছেদ, অনুপস্থিতি বা বিয়োগও সন্তানকে অভিভাবকহীনভাবে একাকী করে দেয়। শিশুর সাথে পিতামাতার বিচ্ছিন্নতা সাময়িক বা দীর্ঘকালীন হতে পারে কিন্তু উভয়ই শিশুর উপর প্রভাব ফেলে।

পিতামাতার সাথে শিশুর বিচ্ছিন্নতার ধরন

- **ক্রেশ** (Creches) : ক্রেশ হল সাময়িকভাবে শিশু প্রতিপালনের প্রতিষ্ঠান। সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিভিন্ন কল্যাণমূলক সংস্থাও (NGO) ক্রেশ পরিচালনা করে। সাধারণত চাকুরিজীবী বা কর্মরত পিতামাতার সন্তান-সন্ততিদের সাময়িকভাবে দেখভাল ও পরিচর্যার দায়িত্ব বর্তায় ক্রেশের উপর। বর্তমানের একক পরিবারে সদস্যের অভাবে, মায়ের অনুপস্থিতির কারণে শিশুর যথাযথ পরিচর্যার জন্য বিশেষত নগরজীবনে ক্রেশের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতা-মাতা কাজে বেরনোর পূর্বে নিজের শিশুকে ক্রেশে রেখে যান এবং বাড়িতে ফেরার সময় আবার সঙ্গে নিয়ে আসেন। ক্রেশগুলি Day Care Centre-এর কাজ করে। আবার প্রয়োজনে স্বল্প কয়েকদিনের জন্য শিশুকে ক্রেশের অধীনে রাখার ব্যবস্থাও থাকে। সাধারণত ক্রেশগুলি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করে। ক্রেশের মধ্যে শিশুর অবস্থানকালে শিশুর সাথে তার পিতা-মাতার স্বল্পকালীন বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়, যার অল্প বিস্তর প্রভাব শিশুর উপর পড়ে।

- **অনাথ আশ্রম (Orphanages) :** অভিভাবকহীন বিশেষ করে পিতা-মাতাহীন শিশুদের অনাথ শিশু বলা হয়। পিতা-মাতার মৃত্যু, পিতা-মাতার বিচ্ছেদ হেতু আশ্রয়হীনতা, পিতা-মাতা পরিচিতিহীনতার কারণে শিশুরা অভিভাবকহীন বা অনাথ হয়ে পড়ে। এই রকম শিশুদের সাধারণত আশ্রয় হয় অনাথ আশ্রমে। স্বাভাবিকভাবে অভিভাবকহীন শিশুরা সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যথাযথ লালনপালন, শিক্ষা, যত্ন, ভালোবাসার অভাব হেতু এই অনাথ শিশুরা নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করে। এই সমস্ত শিশুদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে বেসরকারি, কল্যাণমূলক সংস্থা বা NGO, ধর্মীয় সংস্থা বা ব্যক্তিগত মহৎ উদ্দেশ্যে এই অনাথ আশ্রমগুলি গড়ে ওঠে অনেক সময় সরকারি উদ্যোগও পরিলক্ষিত হয়। যেমন- হোম।

এই সমস্ত অনাথ আশ্রমগুলি পিতা-মাতার থেকে দীর্ঘকালীন বা পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন অনাথ শিশুদের আশ্রয় দানের সাথে সাথে তাদের লালনপালনের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসার, অনাথ শিশুদের সামাজিক করে তোলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন :

ক. ভালোবাসা, স্নেহ এবং গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ের বিকাশ।

খ. বিভিন্ন রকম কাজকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্ববোধের বিকাশ।

গ. দৈহিক, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান।

ঘ. সামাজিকীকরণের মাধ্যমে আচরণধারার বিকাশ।

ঙ. সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মীতাবোধের বিকাশ।

চ. শিশুকে অবাঞ্ছিত মনে না করে, তার ব্যক্তিসত্ত্বাকে গুরুত্ব দিয়ে তার নিজস্ব পরিচিতি তৈরির জন্য উপযুক্ত সামাজিক, প্রাক্ষোভিক এবং শিক্ষাগত পরিবেশ প্রদান।

৩.৫ বিদ্যালয় জীবন (Schooling)

শিশুর বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রবেশের প্রথম ধাপ হল বিদ্যালয়। বিদ্যালয় শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা বা শিক্ষালাভের স্থল নয়, বরং বিদ্যালয় হল শিশুর জীবনে আরও অনেক বেশি কিছু। বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। পরিবারের পর শিশু বিদ্যালয়েই তার জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করে। অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে বুঝতে শেখে। তাই শিশুর কাছে তার বিদ্যালয় জীবন অনেক আনন্দের। বিদ্যালয় শিশুর জীবনে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে —

ক. সামাজিক চাহিদা পরিপূরক রূপে কাজ করে।

খ. বাস্তব অভিজ্ঞতা গঠন করে।

গ. সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ঘ. সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের বিকাশ করে।

ঙ. সৃজনশীলতা এবং নাগরিক সৃষ্টি করে।

চ. দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি করে।

ছ. পেশাগত নির্দেশনা দান করে।

জ. সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় একটি অন্যতম মাধ্যম। বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। শিশুর বিদ্যালয় জীবনের সাথে আরো দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত তা হলো সাথী গোষ্ঠী (Peer Group) এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা (Teachers)।

৩.৫.১ সহপাঠী দলের প্রভাব (Peer Group Influence)

বিদ্যালয় জীবনে সতীর্থ, সহপাঠী বা সমবয়সী বন্ধুদের দল শিশুর মিথস্ক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। সমবয়সি বন্ধুদের সাথে শিশু নিজের আচরণের ভালো এবং খারাপ দিকের খোলামেলা আলোচনা এবং সমালোচনা করতে পারে। যার ফলে শিশু যথাযথ আচরণধারা সম্পর্কে সচেতন হয়। পরিবারের মধ্য দিয়ে শিশুর যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, তা বিদ্যালয় পরিবেশেও ধারাবাহিক থাকে এবং ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে সাথী গোষ্ঠীর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে অগ্রগতি লাভ করে। শিশুরা পিতা-মাতা এবং শিক্ষকের সাথে যে সমস্ত কৌতূহল, বিষয় আলোচনা করতে পারে না তা সহজেই সমবয়সি বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে ধারণা গঠন করে। বিদ্যালয় জীবনে শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমবয়সি বন্ধুদের বা সাথী গোষ্ঠীর নানাবিধ প্রভাব বর্তমান। যেমন :

ক. সমস্ত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

খ. গণতান্ত্রিক মানসিকতার বিকাশ।

গ. দলগঠন এবং পরিচালন ক্ষমতা ও দলীয় আনুগত্য বৃদ্ধি।

ঘ. সহযোগিতা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মানসিক তার গঠন।

ঙ. শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন।

চ. ব্যক্তিগত এবং বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ছ. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং বাস্তববোধের গঠন।

৩.৫.২ শিক্ষক এবং শিশুর সম্পর্ক (Teacher-Child Relationship)

পূর্বে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক। শিক্ষক এবং শিশুর সম্পর্কের মধ্যে শিক্ষক ছিলেন কর্তৃত্বপরায়ণ। বর্তমানে মনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষাধারণায় শিক্ষাব্যবস্থা হল শিশু বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং শিক্ষক ও শিশুর মধ্যেকার সম্পর্ক সহযোগিতামূলক। আধুনিক শিক্ষা ধারণায় মনে করা হয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে একজন বন্ধু (Friend), দার্শনিক (Philosopher) এবং পথ প্রদর্শক (Guide)-এর ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক শিক্ষার সফলতা এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিক নির্দেশ করে। শিক্ষক শিশুর কাছে একজন অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তিস্বরূপ।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে (২-৫ বৎসর বয়স) শিক্ষক শিশুর পিতা-মাতার মতো যত্ন নেয় এবং প্রাথমিক বিকাশে সহায়তা করে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে (৬-১৪ বৎসর বয়স) শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং পরবর্তী স্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। মাধ্যমিক স্তরের (১৪-১৮ বছর) শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের বন্ধুর মতো সম্পর্ক হওয়া উচিত কারণ এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যাই হোক আধুনিক শিক্ষা পরিবেশে শিশু এবং শিক্ষকের সুসম্পর্কের বিশেষ কতগুলি দিক বর্তমান।

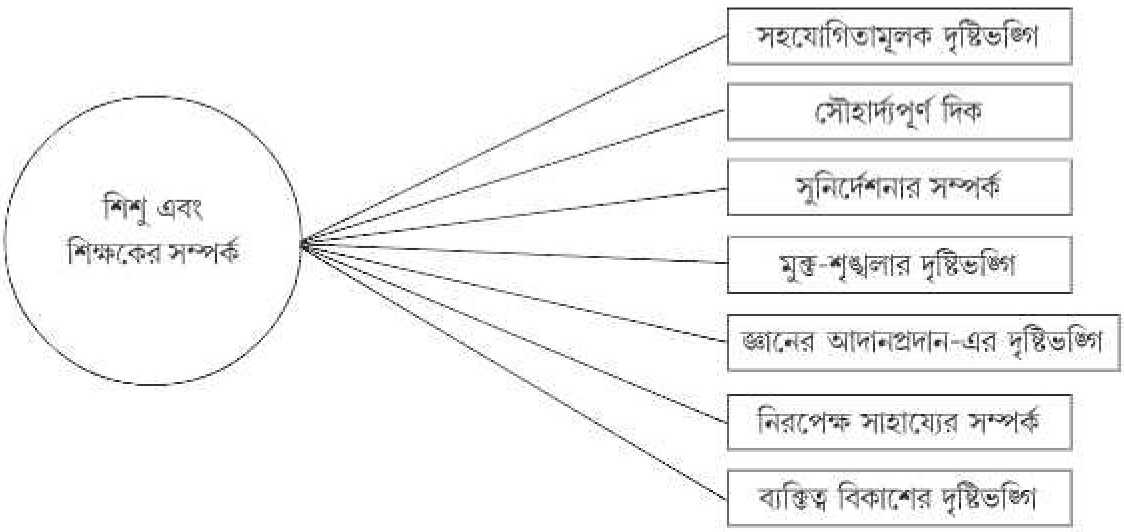

শিশু এবং শিক্ষকের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক

শিশুর সাথে শিক্ষকের সুসম্পর্ক রক্ষা ব্যর্থ হলে শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষার লক্ষ্যও পূরণ হবে না। তাই অনুকূল শিক্ষা পরিবেশ রক্ষায় শিশুর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কতগুলি বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন —

ক. সমস্ত শিক্ষার্থীকে গুরুত্ব প্রদান।

খ. শিশুর সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সমাধানে সাহায্য প্রদান।

গ. শিক্ষকের গণতান্ত্রিক মানসিকতার গঠন।

ঘ. কঠোর শাসন এবং শাস্তি থেকে বিরত থাকা।

ঙ. শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা।

চ. শিশুর প্রতি উদাসীনতা বা অবহেলা থেকে বিরত থাকা।

ছ. শিশুকে দলগত কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ দান।

জ. সামাজিক পরিবেশে মিথস্ক্রিয়ায় (Interaction) সহায়তা করা।

ঝ. সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে শিক্ষক নিজে অংশগ্রহণ করবেন এবং শিশুকে অংশগ্রহণে উৎসাহ দান করবেন।

৩.৫.৩ বিদ্যালয় বহির্ভূত অভিজ্ঞতা (Out of School Experience)

শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের পর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিদ্যালয়। শুধুমাত্র পরিবার এবং বিদ্যালয় শিশুর সার্বিক বিকাশ ও সামাজিকীকরণের জন্য যথেষ্ট নয় কারণ শিশুকে স্বনির্ভরশীল আদর্শ সামাজিক সদস্যে পরিণত করার জন্য বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করা প্রয়োজন হয়। শিশুর বিদ্যালয় বহির্ভূত অভিজ্ঞতা শিশুর ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ের বাইরের জগৎ থেকে শিশু সমাজের বিবিধ রীতিনীতি, মূল্যবোধ, লোকাচার, প্রথা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। বিদ্যালয় বহির্ভূত পরিবেশ শিশুর অভিযোজনমূলক, জ্ঞানমূলক ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। শিশু বিদ্যালয় ছাড়াও নিম্নোক্ত মাধ্যমগুলি থেকে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা লাভ করে —

ক. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious Institution) : বিদ্যালয়ের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু ধর্মীয় মূল্যবোধ, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা শিশুর জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে।

খ. **গণমাধ্যম (Mass Media) :** টেলিভিশন, রেডিও, সিনেমা, সংবাদপত্র, বই, পত্রিকা ইত্যাদি গণমাধ্যমের থেকে শিশু সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবিধ তথ্য, ভাবাদর্শ, চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা শিশুর ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক বিকাশে সহায়ককারী।

গ. **ক্লাব বা সংঘ (Club or Association) :** ক্লাব, সামাজিক সংঘ বা ক্রীড়ামূলক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শিশু দলগত সক্রিয়তা, সমমনোভাব, সহযোগিতা এবং সামাজিক হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা লাভ করে।

শিশু বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অতিবাহিত করে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে কিন্তু বিদ্যালয় বহির্ভূত এই অভিজ্ঞতাগুলি সারাজীবন ব্যাপী লাভ করতে পারে যা তার বিকাশে সহায়ক।

৩.৬ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ (Development of Children through Socialization Process)

শিশুকে সমাজে বসবাস করার উপযোগী করে তোলার প্রক্রিয়াই হল সামাজিকীকরণ। শিশু সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজের প্রচলিত আচরণধারা আত্মস্থ করে। তাই সামাজিকীকরণকে সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়াও (Cultural Transmisssion Process) বলা হয়। সামাজিকীকরণ মূলত একটি জীবনব্যাপী শিখন (Learning) প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর যথাযথ সামাজিক বিকাশ সম্ভবপর হয়। সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল :

ক. **অনুকরণ (Imitation) :** শিশুরা খুবই অনুকরণপ্রিয় হয়। তারা পিতা-মাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অনুকরণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আচরণ ধারা শেখে। Miller এবং Dolland-এর মতে, আমাদের সমাজের নিয়মনীতি ও আদর্শকে রক্ষা বা পরিচর্যার জন্য অনুকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একটি মেয়ে তার মাকে অনুকরণ করে কাপড় পরা, হাঁটাচলা, কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে।

খ. **শিখন (Learning) :** শিখনের মাধ্যমে শিশু তার পিতা-মাতা, পরিবার বা বিদ্যালয় থেকে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো শেখে এবং তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে।

গ. **মিথস্ক্রিয়া (Interaction) :** শিশু তার চারপাশের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট বিভিন্ন ক্রিয়া এবং সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে।

ঘ. **অভিভাবন (Suggestion) :** এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু প্রচলিত বিশ্বাসগুলি নিজের মনে পোষণ করে এবং প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে।

বস্তুত, বাস্তববোধের বিকাশ, নিজের সম্পর্কে ধারণা গঠন, ভাষা আয়ত্তীকরণ, জীবনে বিভিন্ন ভূমিকার প্রস্তুতি, সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়া সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া রূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পরিবার, বিদ্যালয়, ক্লাব, গণমাধ্যম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি মাধ্যমের (Agency) দ্বারা পরিচালিত হয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে শিশুর বিকাশ তথা সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে —

ক. সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

খ. আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠন।

গ. যথার্থ আচরণ ধারার বিকাশ।

ঘ. সামাজিক রীতিনীতি আত্মস্থের মাধ্যমে নৈতিক বিকাশ।

ঙ. পরিবেশ অনুযায়ী যথার্থ প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিকাশ।

চ. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষাগত বিকাশ।

ছ. ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটায়।

জ. সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিকাশের সাথে সাথে অভিযোজনমূলক ক্ষমতার বিকাশসাধন।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা সহ পিতা-মাতা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন- শিশুর সু-অভ্যাস গঠন, সংস্কৃতির সঞ্চালন, সহযোগিতা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি, দলগত কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে শিশুর সঠিক সামাজিকীকরণের অনুকূল পরিবেশ প্রদান ইত্যাদি।

৩.৭ ব্যক্তিত্বের বিকাশ : ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তরসমূহ (Personality Development : Freudian Stages of Development)

ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক সকল বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়কে সাধারণত ব্যক্তিত্ব বলা হয়। মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ (Woodworth)-এর মতে, ''ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক প্রকৃতি।'' মনোবিদ ওয়ারেন (Warren) (১৯৩৪) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ''ব্যক্তিত্ব হল কোনো ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমন্বিত সংগঠন যা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে।'' অর্থাৎ ব্যক্তি যেভাবে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে প্রতিক্রিয়া করে, সামঞ্জস্য বিধান করে এবং অন্য ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে তার সমন্বিত ফলই হল ব্যক্তিত্ব।

শিশুর জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিত্বের বিকাশও হতে থাকে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ তার বংশগতি এবং পরিবেশের যৌথ ফলস্বরূপ।

- **ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্ব (Theory) :** ভিয়েনার মনোচিকিৎসক সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কে স্তরভিত্তিক এক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন যা মনো-সমীক্ষণ তত্ত্ব (Psycho-analysis Theory) নামে পরিচিত।

ফ্রয়েড ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের ক্ষেত্রে মনের তিনটি সংগঠনমূলক দিকের উল্লেখ করেছেন —

- **ইদ (Id) :** ব্যক্তিত্বের একটি প্রাথমিক সত্তা বা আদিসত্তা হল ইদ যা মনের অবচেতন স্তরে থাকে। ইদ স্বার্থপরভাবে কামনা-বাসনা সুখ ভোগের চাহিদাকে পূরণ করে এবং ইদ সুখভোগের নীতি দ্বারা পরিচালিত।
- **অহম (Ego) :** ব্যক্তির বাস্তব এবং যুক্তিবাদী সত্বা হলো অহম (Ego)। তিনবছর বয়স থেকে ব্যক্তির মধ্যে অহমের বিকাশ হয়। অহম ইদের কামনা-বাসনাকে সামাজিক পন্থায় বাস্তবযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে।
- **অধিসত্তা (Super Ego) :** ব্যক্তির পাঁচ বছর বয়স থেকে অধিসত্তা গঠন হতে শুরু করে। অধিসত্তা ন্যায়নীতি, আদর্শের উপর জোর দিয়ে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে শুরু করে।

মনের স্থানিক ধারণা : ফ্রয়েডের মতে মনের তিন ধরনের উপাদান আছে। যথা—

- **সচেতন স্তর (Conscious) :** মানুষ চিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে যে উপাদান দিয়ে তাকে বলে সচেতন (Conscious) স্তর।

- **প্রাক-সচেতন স্তর (Pre-conscious) :** অনেক সময় আমরা কোনো বিশেষ মুহূর্তে সচেতন না থাকলেও ইচ্ছামত সচেনতা আনতে পারি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি, মনের এই উপাদানকে বলে প্রাক-চেতন স্তর।

- **অবচেতন স্তর (Unconscious) :** মনের এটি এমন অংশ যা সবথেকে ব্যাপক ও গভীর এবং যা সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই বা চেষ্টা করলেও সহজে অবহিত হতে পারি না।

  ফ্রয়েডের তত্ত্ব গড়ে উঠেছে এই অবচেতন স্তরকে কেন্দ্র করেই।

❑ **বিকাশের স্তরসমূহ :** ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তরগুলি যৌন বিকাশের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠার জন্য ফাইকো-সেক্সুয়াল (phycho-sexual) বিকাশ স্তরও বলা হয়। ফ্রয়েডের মতে যৌন অনুভূতির বিকাশের সাথে জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিকাশ সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তরগুলির বর্ণনা নিম্নরূপ —

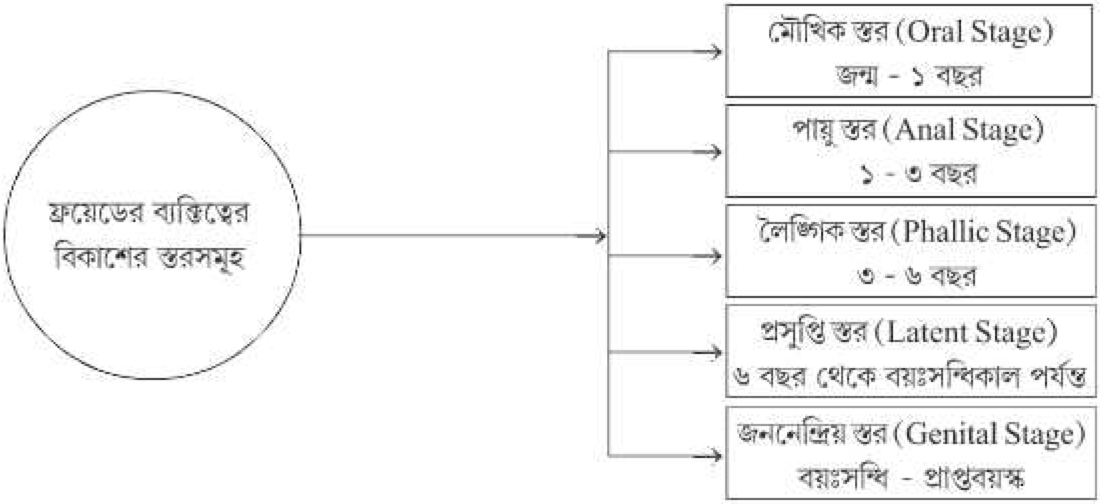

ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তরসমূহ

ক. **মৌখিক স্তর (Oral Stage) :** এই স্তর শিশুর জন্ম থেকে ১ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী। এই স্তরে শিশু কোন জিনিস চুষে, কামড়ে বা চিবিয়ে ইন্দ্রিয়জাত সন্তুষ্টি অনুভব করে। এই স্তরে শিশু মানসিক নিরাপত্তা লাভের প্রয়াসী হয়।

খ. **পায়ু স্তর (Anal Stage) :** ১ থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরে শিশু মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় সন্তুষ্টি অনুভব করে। এই সময় শিশুকে সঠিকভাবে মল-মূত্র ত্যাগের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। এই স্তরের সঠিক বিকাশে শিশু প্রতিভাবান এবং উৎপাদনমুখী হয়।

গ. **লৈঙ্গিক স্তর (Phallic Stage) :** ৩ - ৬ বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরে শিশুরা ইন্দ্রিয়জাত সন্তুষ্টি লাভ করে জননেন্দ্রিয়ে। শিশুরা ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। এই স্তরে ছেলেরা মায়ের প্রতি আসক্তি অনুভব করে এবং বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। একে ইডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex) বলে। অপরদিকে মেয়েরা মাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং বাবার প্রতি আসক্ত হয় একে ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স (Electra Complex) বলা হয়। এই স্তরের বিকাশ পরবর্তীকালে শিশুর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য গঠনে প্রভাব ফেলে।

ঘ. **প্রসুপ্তি স্তর (Latent Stage) :** এই পর্যায় শিশুর ছয় থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এই স্তরে শিশুর যৌন অনুভূতি অবদমিত থাকে এবং শিশুর মধ্যে অহম (Ego) এবং অধিসত্তা (Super ego) বিকাশ লাভ করে এবং এর সাথে সাথে শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটে।

ঙ. **জননেন্দ্রিয় স্তর (Genital Stage) :** ব্যক্তিত্ব বিকাশের এটি শেষ স্তর। এই স্তরের বিকাশ বয়ঃসন্ধি থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত চলে। এই পর্যায়ের যথাযথ বিকাশ পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।

ফ্রয়েড তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্বে জীবনীশক্তির মূলকেন্দ্র রূপে যৌন ইচ্ছা বা যৌনশক্তির (Libido) উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার ফলে নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক অবহেলিত হয়েছে। তা সত্বেও ফ্রয়েডের এই যুগান্তকারী তত্ত্ব শিশুর যথার্থ বিকাশের জন্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশুর চাহিদা এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষক তথা বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করলে শিশুর সুষম বিকাশ সম্ভবপর হবে।

ফ্রয়েডের তত্ত্বের শিক্ষামূলক তাৎপর্য :

ফ্রয়েডের তত্ত্বানুসারে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ কতগুলি মানসিক-যৌন বিকাশগত স্তরের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়। শিশু ৬ বছরের আগে অবদি পরিবার ও পরিবেশের প্রভাবে নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু ৬ বছরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে তারপর থেকে বিদ্যালয়েরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা দরকার।

- প্রসুপ্তি স্তরে অহম (Ego) এবং অধিসত্তার (Super ego) বিকাশ ঘটে, তাই এই স্তরে শিশুদের যুক্তিসম্মত বাস্তবিক শিক্ষা দেওয়া উচিত।
- শিশুদের মধ্যে অধিসত্ত্বার বিকাশ ঘটানোর জন্য শিক্ষকদের নীতিশিক্ষা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া উচিত।
- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ শিক্ষার্থীদের অধিসত্তার বিকাশে সাহায্য করবে।
- জননেন্দ্রিয় স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়, তাই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছেলেমেয়েদের মধ্যে আসক্তি সৃষ্টিকারী অনুভূতিকে নীতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতিতে পরিবর্তিত করতে পারেন।
- এছাড়া লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে বিভিন্ন কাজে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৩.৮ এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশের স্তরসমূহ (Psycho-Social Development – Stages as proposed by Erikson)

এরিক এরিকসন (Erik Erikson) ১৯৫০ সালে তাঁর "Eight Ages of Man" গ্রন্থে মানব বিকাশের ধারাকে ৮টি স্তরের মাধ্যমে তুলে ধরেন যা পরবর্তীকালে 'মনো-সামাজিক' তত্ত্ব রূপে পরিচিত। এরিকসন ফ্রয়েডের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও, ফ্রয়েড প্রদত্ত বিকাশমূলক তত্ত্বকে স্বীকার করতে পারেননি। এরিকসন মনে করতেন, জন্মের সময় থেকেই অহম (Ego) একটি স্বাধীন সত্তা রূপে অবস্থান করে, ঈদ (Id) এবং অহমের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই বরং অহম সত্তার সাথে সামাজিক পরিবেশের দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এবং

অহমের বিকাশেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। এরিকসন মনো-সামাজিক বিকাশের আটটি স্তরের উল্লেখ করেছেন যেখানে প্রতিটি স্তরের সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে সেই স্তরের উন্নতি। এরিকসন বর্ণিত আটটি স্তর নিম্নরূপ —

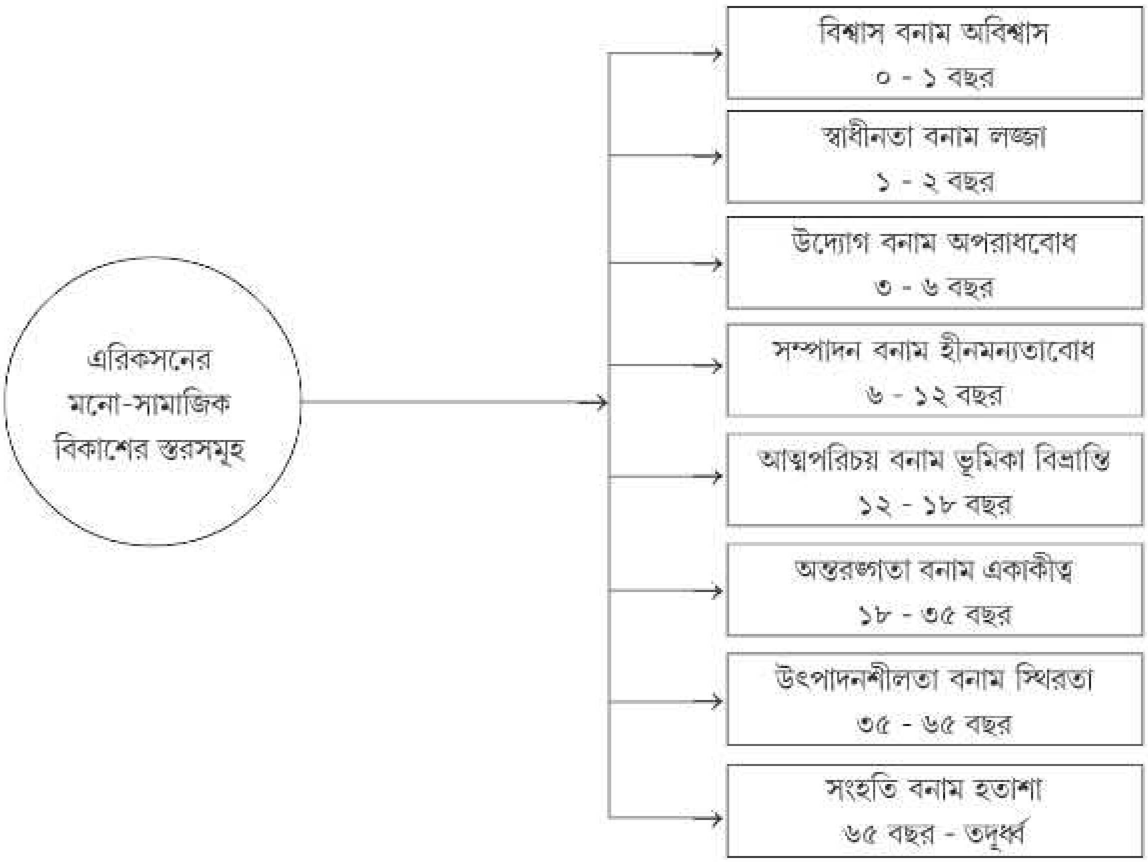

এরিকসন বর্ণিত মনো-সামাজিক বিকাশের আটটি স্তর

১. **প্রথম স্তর : বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস (Trust vs. Mistrust) :** শিশুর জন্ম থেকে ১ বছর বয়সের মধ্যে এই সংকট দেখা যায়। শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি যদি উপযুক্ত পরিচর্যা এবং আদর-যত্নের সাথে মেটানো হয় তাহলে তার মধ্যে বিশ্বাস এবং নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয় অন্যথায় শিশুর মধ্যে অবিশ্বাস এবং নিরাপত্তাহীনতা জন্ম নেয়। এই স্তরে অহমশক্তি হল আশা (Hope)।

২. **দ্বিতীয় স্তর : স্বনিয়ন্ত্রণ বনাম লজ্জা (Autonomy vs. Shame) :** ১ - ২ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর মধ্যে এই সংকট উপস্থিত হয়। যদি শিশু তার পরিবেশ পরিস্থিতিকে নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে শিশুর মধ্যে স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ ঘটে। আর পিতা-মাতার অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বা বাধা শিশুর মধ্যে লজ্জা বা সন্দেহ তৈরি করে। এই স্তরে অহম (Ego) শক্তি হল ইচ্ছা (Will)।

৩. **তৃতীয় স্তর : উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ (Initiative vs. Guilt) :** ৩ - ৬ বছর বয়স পর্যন্ত চলা এই স্তরে শিশুরা নিজে নিজে ঠিকঠাক কাজ করতে পারলে গর্বিত বোধ করে আর কাজে অসফল হলে নিজেকে অসহায়ভাবে এবং অপরাধবোধ তৈরি করে। এই স্তরের পর থেকে শিশুদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই স্তরে অহম শক্তি হল উদ্দেশ্যমূলক (Purpose)।

৪. **চতুর্থ স্তর : সম্পাদন বনাম হীনমন্যতাবোধ (Industry vs. Inferiority) :** সাধারণত ৬ থেকে ১১ বা ১২ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার শুরু থেকে বয়ঃসন্ধিকালের আগে পর্যন্ত এই স্তরের সংকট তৈরি হয়। এই স্তরের শিশুরা নিয়ম মেনে উদ্যমের সাথে কাজ সম্পাদন করতে চায়। সহযোগিতা পেলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় অন্যথায় তাদের মধ্যে কর্মবিমুখতা ও হীনমন্যতাবোধ তৈরি হয়। এই স্তরের অহমশক্তি হল পারদর্শিতা (Competence)।

৫. **পঞ্চম স্তর : আত্মপরিচয় বনাম ভূমিকা বিভ্রান্তি (Identity vs. Role Confusion) :** ১২ থেকে ১৮ বছর অর্থাৎ এই স্তরটি কৈশোরকাল যেখানে বিভিন্ন শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মপরিচয় এবং ভূমিকা বিভ্রান্তিগত সংকট তৈরি হয়। এই সময় পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন প্রত্যাশার চাপ তৈরি হয় তাই এই স্তরে ব্যক্তির সঠিক সমাধান এবং আত্মপ্রত্যয় তার যথার্থ আত্মপরিচয় তৈরি করে নতুবা তার মধ্যে ভূমিকাগত বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই স্তরের অহম শক্তি হল বিশ্বস্ততা (Fidelity)।

৬. **ষষ্ঠ স্তর : অন্তরঙ্গতা বনাম একাকীত্ব (Intimacy vs. Isolation) :** ১৮ - ৩৫ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই স্তরে ব্যক্তি অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা এবং স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয় আর তা সফল না হলে তার মধ্যে একাকীত্ববোধের সৃষ্টি হয়। এই স্তরের অহম শক্তি হল ভালোবাসা (Love)।

৭. **সপ্তম স্তর : উৎপাদনশীলতা বনাম স্থিরতা (Generativity vs. Stagnation) :** ব্যক্তির ৩৫ - ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরের সংকট পরিলক্ষিত হয়। এই স্তরে ব্যক্তি তার পরবর্তী প্রজন্ম বা বংশধরকে ভবিষ্যৎ সমাজজীবনের উপযোগী করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর তা সম্ভব না হলে ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এই স্তরের অহমশক্তি হচ্ছে যত্ন (Care)।

৮. **অষ্টম স্তর : সংহতি বনাম হতাশা (Ego Integrity vs. Despair) :** ব্যক্তির ৬৫ বছর বয়সের পর থেকে এই স্তরের সংকট পরিলক্ষিত হয়। এই স্তরে ব্যক্তি তার অতিবাহিত জীবনধারাকে মূল্যায়ন করে। যদি জীবন ব্যক্তির কাছে অর্থবহ হয় তাহলে তার মধ্যে ধনাত্মক মনোভাব এবং সামঞ্জস্যতা তৈরি হয় এবং সম্মানের সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নেন অন্যথায় ব্যর্থ এবং অর্থহীন জীবন কাটানোর জন্য হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এই স্তরের অহম শক্তি হল জ্ঞান (wisdom)।

❑ **এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশ তত্ত্বের শিক্ষামূলক তাৎপর্য :** এরিকসন তার মনো-সামাজিক তত্ত্বে জীবন বিকাশের একটি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন বিকাশমূলক স্তরের কতগুলি শিক্ষাগত তাৎপর্য উল্লেখ করা হল —

ক. বিকাশের প্রথম স্তরে শিশুর মনে বিদ্যালয়, শিক্ষক সম্পর্কে বিশ্বাসবোধ তৈরি করা প্রয়োজন। যাতে শিক্ষক এবং বিদ্যালয় সম্পর্কে ভীতি বা অনাস্থা না তৈরি হয়।

খ. শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ, অনুভূতির বিকাশ ঘটাতে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য দিতে হবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ প্রদান করা প্রয়োজন।

গ. শিশুর মধ্যে যাতে অপরাধবোধ তৈরি না হয় তাই বিদ্যালয় পরিবেশে খেলাধুলা এবং নতুন দক্ষতা লাভের মাধ্যমে তার পূর্ব অর্জিত আস্থাবোধকে দৃঢ়তর করতে হবে।

ঘ. শিক্ষক প্রতিটি শিশুর সাফল্যের অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন যাতে শিক্ষার্থী নিজেকে অযোগ্য না ভাবে এবং তার ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মায়।

ঙ. বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিক মেলামেশা এবং বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরি করতে হবে এর ফলে শিক্ষার্থী একাকীত্ব অনুভব করবে না এবং তার আত্মবোধ তৈরি হবে, যোগাযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৯ সামাজিক তত্ত্ব এবং লিঙ্গগত বিকাশ (Social Theory and Gender Development)

সামাজিক তত্ত্ব (Social Theory) হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত সাধারণ সূত্র, ধারণা, ঘটনা বা পরস্পর সম্পর্কিত সামাজিক ঘটনাসমূহের একটি সুসংবদ্ধ প্রস্তাবনা। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ অনুধ্যানের ফলে সামাজিক তত্ত্বসমূহের সৃষ্টি হয়। লিঙ্গ বা জেন্ডার হল একটি স্পর্শকাতর সামাজিক ধারণা যার বাস্তবিক অনুশীলন সমাজ স্বীকৃত। তাই লিঙ্গগত বিকাশ (Gender Development) ধারা অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক তত্ত্ব সঠিক দিক নির্দেশ করে।

৩.৯.১ সামাজিক তত্ত্ব (Social Theory)

সামাজিক তত্ত্ব হচ্ছে একটি মৌল ধারণা এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অনুমানসমূহ। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীরা যেমন — কার্ল মার্কস, ডুরখেইম, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখেরা মনে করেন তত্ত্ব হল অপরীক্ষণযোগ্য বিবৃতির সমষ্টি। Ritzen-এর মতে, ''সামাজিক তত্ত্ব হচ্ছে একটি ব্যাপকভিত্তিক মত যা সমাজজীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।'' আবার R.K. Merton সামাজিক তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, ''পরস্পর সম্পর্কিত যুক্তিভিত্তিক আদর্শসমূহ যা থেকে কোনো সমন্বিত অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা গড়ে উঠতে পারে।''

সাধারণভাবে বলা যায় সামাজিক তত্ত্ব হচ্ছে সাধারণীকরণযোগ্য বিমূর্ত শর্তসমূহের নিয়মতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, যা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা এবং তাদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণ দান করে। সামাজিক তত্ত্বসমূহ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান যেমন — সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতির সমাজ সম্পর্কিত অনুধ্যানের ফলস্বরূপ। যেমন জেন্ডার বা লিঙ্গগত বিকাশ হল একটি সামাজিক ধারণা এ সম্পর্কে সামাজিক তত্ত্ব বিবিধ দিক নির্দেশে সক্ষম হয়। যেমন —

ক. লিঙ্গগত বিকাশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

খ. বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাদান।

গ. বিষয়বস্তুর সাধারণীকরণ।

ঘ. বিষয়গত সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ এবং সমাধান নিরূপণ।

ঙ. তথ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।

চ. সর্বোপরি বিষয়ের ধারাবাহিকতা ও ভাবের পারম্পর্য রক্ষা করে।

৩.৯.২ লিঙ্গগত বিকাশ (Gender Development)

জেন্ডারের অভিধানিক অর্থ হল নারী পুরুষের বৈষম্যহীন অবস্থা। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের চেতনায় Gender একটি সমাজ অর্থনৈতিক (Socio-economic) ধারণা। Gender এবং Sex শব্দ দুটির বাংলা অর্থ বলতে লিঙ্গ বোঝানো হয়। কিন্তু দুটি পৃথক ধারণা। Sex বা লিঙ্গ হলো প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যমূলক ভিন্নতা। আর Gender বা লিঙ্গ হল সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের ভূমিকার পার্থক্য।

অর্থাৎ Gender বা লিঙ্গ হল নারী-পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণ ও দায়িত্ব যার উৎপত্তি হয় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি থেকে। এ ধারণায় নারী-পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আশা-আকাঙ্খা ও আচরণ হল সমাজ আরোপিত, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নতকামী দেশে নারী-পুরুষ ছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গের (Third Gender) উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষেও তৃতীয়

লিঙ্গ সংবিধান স্বীকৃত Gender। তৃতীয় লিঙ্গ বলতে দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নারী বা পুরুষ রূপে গণ্য হয় না। যাইহোক পরিবার, সমাজ-রাষ্ট্র এবং জাতীয় উন্নয়নে নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন অবস্থাই হল Gender Development বা লিঙ্গগত বিকাশ। বর্তমানে লিঙ্গগত বিকাশ একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ের রূপ নিয়েছে। নারীকে জাতীয় উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য লিঙ্গগত বিকাশের ধারণা তাৎপর্যপূর্ণময়।

৩.৯.৩ লিঙ্গগত ভূমিকার অর্থ (Meaning of Gender Role)

যে-কোনো সমাজের প্রগতির জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই দায়িত্ব বা কর্তব্য সাধারণত সমাজসৃষ্ট নিয়মনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য কিছু ভূমিকা পালন এবং কাজ করে থাকে যা সামাজিকভাবে নির্ধারিত। সমাজের ধরন ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে কাজ ও শ্রম বিভাজিত হয়ে থাকে যাকে লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন (Gender Division of Labour) বলা হয়। বর্তমানে প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাজনের ফলে প্রত্যেক সমাজে নারী ও পুরুষ তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সকল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, কর্মসম্পাদন করে, তাকে এককথায় লিঙ্গগত ভূমিকা (Gender Role) বলা হয়। অর্থাৎ Gender এর ভূমিকা বলতে সমাজসৃষ্ট লিঙ্গভিত্তিক (Gender) শ্রম বিভাজনের উপর ভিত্তি করে নারী পুরুষের নির্ধারিত ভূমিকা বোঝায়। জেন্ডার ভূমিকা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণত জেন্ডার ভূমিকা তিন প্রকার —

ক. **পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকা :** সন্তান জন্মদান ও লালনপালনই হল মূলত এই প্রকার ভূমিকার অন্তর্গত। যা মহিলারা সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া গৃহস্থালীর কাজকর্মসমূহ যেমন — রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার ইত্যাদি কাজকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত।

খ. **উৎপাদনমূলক ভূমিকা :** অর্থ উপার্জনকারী বা বিনিময়মূল্য যুক্ত কাজ উৎপাদনমূলক ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- চাকরি, দিন-মজুরি, কৃষিকাজ ইত্যাদি। সাধারণত যে-কোনো সমাজে পুরুষরাই এই ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ. **সামাজিক ভূমিকা :** যে সব কাজ কোনো বিনিময়মূল্য, অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তা হল সামাজিক ভূমিকা। এর মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকার অন্তর্গত। সাধারণত নারী-পুরুষ উভয়ই এই ভূমিকা পালন করে।

৩.৯.৪ লিঙ্গগত ভূমিকার প্রভাব (Influence of Gender Roles)

লিঙ্গগত ভূমিকা (Gender Role) হল সমাজ-সংস্কৃতি দ্বারা নারী-পুরুষ ভেদে নির্ধারিত ভূমিকাসমূহ। শিশু জন্ম থেকেই তার লিঙ্গগত পার্থক্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয় না। পরিবারের মধ্যে লালনপালন এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তার লিঙ্গ পরিচিতি এবং ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হয়। পোশাক পরিধানের মধ্য দিয়ে শিশুর লিঙ্গগত পরিচিতির পার্থক্য তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে খেলনার মাধ্যমে তার ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। যেমন কন্যা সন্তানের জন্য পুতুল, রান্নাবাড়ির সরঞ্জাম অন্যদিকে পুত্রসন্তানের জন্য গাড়ি, বন্দুক ইত্যাদি প্রদান করা হয় যা তার ভবিষ্যৎ ভূমিকাকে নির্দেশ করে। সমাজে লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকার ভালো এবং মন্দ উভয় প্রভাবই বর্তমান।

- **লিঙ্গগত ভূমিকার উত্তম প্রভাবসমূহ :**

ক. **ভারসাম্য রক্ষা :** লিঙ্গগত ভূমিকার ফলে সৃষ্টি হয় লিঙ্গ নির্ধারিত শ্রম বিভাজন যা নারী-পুরুষের কাজ-দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে যেমন ভারসাম্য রক্ষা করে তেমনি সমাজের বিভিন্ন কাজের সুষ্ঠু বিভাজনও সম্ভব হয়।

খ. **পরিচিতি বিকাশ :** লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা শিশুর লিঙ্গগত পরিচিতি বিকাশে সহায়তা করে। এর সাথে সাথে শিশুরা নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হয়।

গ. **সামাজিক শৃঙ্খলা :** লিঙ্গগত ভূমিকা থাকার জন্য নারী-পুরুষ স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে না কারণ শিশুর যত্ন, পরিচর্যার দায়িত্ব মা বা মহিলারাই সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বকে এড়ানো যায় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

- **লিঙ্গগত ভূমিকার কু-প্রভাবসমূহ :**

ক. **গতানুগতিকতা :** লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা যেহেতু সমাজ আরোপিত তাই ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও গতানুগতিকভাবে ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। এই গতানুগতিকতা ব্যক্তির মধ্যে অসন্তোষ এবং হতাশা তৈরি করে।

খ. **বঞ্চনা :** লিঙ্গগত ভূমিকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বঞ্চনার শিকার হয়। ব্যক্তির প্রতিভা মূল্যহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ ব্যক্তিকে সমাজ আরোপিত লিঙ্গগত ভূমিকা পালন করতে হয়। ভারতীয় সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা এইরূপ বঞ্চনার শিকার হয়।

গ. **অসমতা বৃদ্ধি :** লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা নারী এবং পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে। কারণ নারী এবং পুরুষের চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্বগত দিক থেকে সমান সুযোগসুবিধা ও সম অধিকার লাভ করে না যার ফলে নারী এবং পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসমতা বৃদ্ধি পায়।

৩.৯.৫ গতে বাঁধা ধারণা ও খেলার মাঠে লিঙ্গ বৈষম্য (Stereotype and Gender in Play Ground)

লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা (Gender Role) সমূহ পরিবার, সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকাগুলি হঠাৎ করে একদিনে সৃষ্টি হয়নি। লিঙ্গগত এই ভূমিকার ধারণা অনেক প্রাচীনকাল থেকে সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অনুশীলিত হয়ে আসছে এবং তা পরিবার সমাজ কর্তৃক মান্যতা লাভ করেছে এবং গৃহীত হয়েছে। চিরাচরিতভাবে চলে আসা লিঙ্গ সম্পর্কে এই ধারণার যে বদ্ধমূল প্রবাহধারা তাকেই সাধারণত লিঙ্গগত ভূমিকার গতে বাঁধা ছাঁচ বা Gender Stereotype বলা যেতে পারে। যেমন হাসপাতালে নার্স বলা মানেই আমরা সেবিকা অর্থাৎ মহিলার কথা ভাবি, ফুটবল খেলা মানে ছেলেদের খেলা মনে করি। যদিও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক লিঙ্গগত ভূমিকার বাঁধাধরা ছাঁচ পরিবর্তিত হচ্ছে কারণ এখন পুরুষ নার্স বা মেয়েদের ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

- **খেলার মাঠে জেন্ডার :** খেলা শুধুমাত্র দৈহিক বিকাশ ঘটায় না, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক এবং জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলা পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়াতে সাহায্য করার সাথে সাথে সহপাঠী ও সমবয়সিদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব তৈরিতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। খেলার মাঠে শিশুর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত (Gender) পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বলা ভালো খেলার মাঠেও Gender Stereotype-এর প্রভাব দেখা যায়। প্রথমত, খেলার মাঠের কথা বললেই আমরা সর্বদা ছেলের দলের কথা ভেবে নেই, দ্বিতীয়ত, লিঙ্গগত বাঁধাধরা এই ভূমিকার কারণে স্বভাবগতভাবেই মেয়েরা খেলার মাঠের প্রতি বিমুখ। এ তো গেল খেলার মাঠের সাথে Gender-এর সম্পর্ক। কিন্তু খেলার মাঠের বিভিন্ন খেলার সাথেও Gender-এর ধারণা সংযুক্ত।

সাধারণত মেয়েরা শারীরিকভাবে কোমল এবং ছেলেরা শক্তিশালী হওয়ার জন্য খেলার ধরনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। লিঙ্গ ভূমিকাগত কারণেও ছেলে এবং মেয়েরা ভিন্ন ভিন্ন খেলা পছন্দ এবং অংশগ্রহণ করে। যেমন- ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেট বল, রাগবি ইত্যাদি এবং মেয়েরা লুকোচুরি, খো-খো, স্কিপিং ইত্যাদি খেলা পছন্দ করে। এই পছন্দ অধিকাংশ সময়ে পূর্ব নির্ধারিত ভূমিকা জেন্ডার ভূমিকার কারণে। যদিও খেলার মাঠের এই লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা বর্তমানে পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন মেয়েরা ফুটবল, ক্রিকেটের মতো খেলায় উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে উদাহরণ স্বরূপ বাংলার বিখ্যাত মহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

৩.১০ সারসংক্ষেপ (Summary)

- সামাজিকীকরণ হল শিশুর উপযুক্ত সামাজিক সদস্যে উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়া।
- সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবার, বিদ্যালয়, ক্লাব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ইত্যাদি মাধ্যম (Agency) রূপে কাজ করে।
- পরিবার হলো স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সহ একত্রে বসবাসকারী প্রাথমিক গোষ্ঠী।
- পিতা-মাতা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা, তথা পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সামাজিকীকরণে অন্যতম ভূমিকা পালন করে।
- পিতা-মাতার থেকে শিশুর বিচ্ছিন্নতা শিশুর মধ্যে অসহায়বোধ, হীনমন্যতা, আগ্রাসন মনোভাব, একাকীত্ব, সংকীর্ণ মনোভাব ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করে।
- বিদ্যালয় জীবনে শিশু সমবয়সি বন্ধু বা সহপাঠী এবং শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করে যা তার সামাজিকীকরণে সাহায্য করে।
- বিদ্যালয়ের বাইরে শিশু ধর্মীয় স্থান, ক্লাব বা সংঘ এবং গণমাধ্যম থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে।
- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া স্বরূপ অনুকরণ, শিখন, মিথস্ক্রিয়া, অভিভাবন ইত্যাদি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।
- ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশ যৌন বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- ব্যক্তির ইদ (Id) হল আদিসত্তা, অহম (Ego) হল বাস্তব বা যুক্তিবাদী সত্তা এবং অধিসত্তা (Super Ego) হল ন্যায়নীতি বা আদর্শগত সত্তা।
- এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশতত্ত্ব অনুযায়ী অহম (Ego) সত্তার সাথে সামাজিক পরিবেশের দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয়। মূলত অহমের বিকাশই হল ব্যক্তিত্বের বিকাশ।
- এরিকসন মনো-সামাজিক বিকাশের আটটি স্তরের উল্লেখ করেছেন— বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস, স্বনিয়ন্ত্রণ বনাম লজ্জা, উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ, সম্পাদন বনাম হীনমন্যতাবোধ, আত্মপরিচয় বনাম ভূমিকা বিভ্রান্তি, অন্তরঙ্গতা বনাম একাকীত্ব, উৎপাদনশীলতা বনাম স্থিরতা এবং সংহতি বনাম হতাশার স্তর।
- সামাজিকতত্ত্ব হল পরস্পর সম্পর্কিত সামাজিক ঘটনার নিয়মতান্ত্রিক ব্যাখ্যা।
- Gender হলো সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী পুরুষের পরিচয় এবং ভূমিকার পার্থক্য।
- Sex বা লিঙ্গ হলো জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্য।
- সমাজ-সংস্কৃতি নির্ধারিত নারী পুরুষের পৃথক পৃথক কর্মসম্পাদন এবং দায়িত্বপালনের ধারণাকে লিঙ্গগত ভূমিকা বলে (Gender Role)।
- লিঙ্গগত ভূমিকা মূলত তিন প্রকার— পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকা, উৎপাদনমূলক ভূমিকা এবং সামাজিক ভূমিকা।
- শিক্ষাগত ভূমিকা যেমন ভারসাম্যরক্ষা, পরিচিতির বিকাশ বা সামাজিক শৃঙ্খলা তৈরিতে ভালো প্রভাব ফেলে তেমনি এর কয়েকটি খারাপ দিক আছে- গতানুগতিকতা তৈরি, সামাজিক বঞ্চনা এবং অসমতা বৃদ্ধি।

৩.১১ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়—

(ক) অনুসরণের মাধ্যমে (খ) অনুকরণের মাধ্যমে

(গ) অভিভাবনের মাধ্যমে (ঘ) সহযোগিতার মাধ্যমে

২. নিম্নের কোনটি ফ্রয়েড প্রস্তাবিত মনের স্তর নয়?

(ক) সচেতন স্তর (খ) প্রাক্-চেতন স্তর

(গ) সম্পূর্ণ চেতন স্তর (ঘ) অচেতন স্তর

৩. এরিকসনের মতানুসারে মনোসামাজিক বিকাশের স্তরের সংখ্যা হল—

(ক) ৫টি (খ) ৮টি

(গ) ৭টি (ঘ) ৬টি

৪. নিম্নের কোনটি সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া নয়?

(ক) আত্মীকরণ (খ) উপযোজন

(গ) বিশ্লেষণ (ঘ) সহযোজন

৫. সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল—

(ক) ভাষা (খ) শিক্ষা

(গ) বাসস্থান (ঘ) প্রযুক্তি

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ইদ (Id) এবং অহম (Ego) বলতে কী বোঝ?

২. সামাজিকীকরণ কাকে বলে?

৩. মনোসামাজিক বিকাশের স্তরগুলি লেখো।

৪. শিশু সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লেখো।

৫. আধিসত্তা (Super Ego) কাকে বলে?

৬. চেতনস্তর কী?

৭. অবচেতন স্তর কাকে বলে?

৮. প্রাক-চেতন স্তর বলতে কী বোঝ?

৯. ফ্রয়েড ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কয়টি স্তরের কথা বলেছেন ও কী কী?

১০. সামাজিকীকরণে পরিবারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লেখো।

১১. ক্রেশ কী?

C. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝ? সামাজিকীকরণে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা লেখো।

২. এরিকসন প্রস্তাবিত মনোসামাজিক বিকাশের পর্যায়সমূহের বর্ণনা দাও ও তার শিক্ষামূলক গুরুত্ব বর্ণনা করো।

D. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ফ্রয়েড বর্ণিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্বটি বিস্তারিত বর্ণনা করো এবং এর শিক্ষাগত তাৎপর্য বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৪

অহংবোধ ও নৈতিকবোধের বিকাশ (Self and Moral Development)

৪.১ সূচনা (Introduction)

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.৩ নিজের সম্পর্কে জ্ঞান (Self Description)

৪.৪ নৈতিক বিকাশ : কোহলবার্গের তত্ত্ব (Moral Development : Perspectives of Lawrence Kohlberg)

৪.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

৪.৬ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

৪.১ সূচনা (Introduction)

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে যে মনোভাব তাই হল তার স্ব-ধারণা। অহং সম্পর্কিত ধারণা পরিপুষ্ট হওয়ার ফলে শিশুর মধ্যে আত্মবোধ, আত্মমর্যাদা গড়ে ওঠে। ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা তৈরির সঙ্গে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, কর্মকুশলতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সাথে নিজের অক্ষমতাসমূহও অনুধাবন করতে পারে। আত্মবর্ণনার মাধ্যমে নিজস্ব গুণাবলি, সামর্থ্য, প্রবণতা প্রকাশ করতে পারে এবং সামাজিক তুলনার দ্বারা নিজের প্রকৃত মূল্যায়নের চেষ্টা করে। মানুষের নীতিবোধের বিকাশ যে প্রধানত যুক্তি ও বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল, লরেন্স কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্বে-র মাধ্যমে তা জানা যায়।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে মনোভাব ও অহং সম্পর্কিত ধারণা গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা।

২। আত্মবোধ সম্পর্কে ধারণা গঠন করা।

৩। আত্মমর্যাদাবোধ, সামাজিক তুলনা, অন্তর্ভুক্তিকরণ, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

৪। লরেন্স কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

৫। শিক্ষার্থীদের নীতিবোধের বিকাশের উদ্দেশ্যে যুক্তি ও বৌদ্ধিক বিকাশে গুরুত্ব দান।

৪.৩ নিজের সম্পর্কে জ্ঞান (Self Description)

নিজের বর্ণনা, আত্মবোধ, আত্মমর্যাদা, সামাজিক তুলনা, অভ্যন্তরীকরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।

৪.৩.১ আত্মবোধ (Self concept)

প্রাক্-শৈশব স্তরে যে-কোনো ব্যক্তির আত্মবোধের বিকাশ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একটি শিশু প্রথমে নিজেকে চিনতে শেখে তারপর সে যে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি তা বুঝতে শেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারে যে সেও একটি স্বাধীন ব্যক্তি এবং ক্রমশ সে নিজেকে সকলের থেকে আলাদা করে চিনতে পারে।

গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে শিশুর আত্মবোধ তৈরি হয় তার নিজের সঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া ও তার জীবনে যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাদের তার প্রতি প্রতিক্রিয়া থেকে। একটি শিশুর বা ব্যক্তির জীবনে তার গোড়ার কিছু অভিজ্ঞতা তাকে তার নিজেকে চিনতে সাহায্য করে। অর্থাৎ আমাদের পরিবেশের যারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোক আছে যেমন মা, বাবা, ভাই, বোন, ইত্যাদি তারা আমাদের সামনে আমাদের যে ছবি উপস্থাপন করে থাকে, সেটার সাহায্য নিয়েই আমরা আমাদের 'নিজে' কে চিনতে পারি ও নিজেদের সম্পর্ক ধারণা গঠন করি, সেটি আবার আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

যখন শিশু বা ব্যক্তি তার পরিবেশের দ্বারা গৃহীত হয় তখন সে নিজেকে মূল্যবানভাবে তখন তার মধ্যে ইতিবাচক আত্মবোধ (Positive Self-Concept) তৈরি হয় এবং তার আদর্শায়িত সত্তা (Ideal self) ও বাস্তব সত্তার (Actual self) ব্যবধান খুব কম থাকে। কিন্তু এর বিপরীতে যখন শিশুর/ব্যক্তির নেতিবাচক (Negative Self-Concept) আত্মবোধ তৈরি হয়, তখন তার এই দুই সত্তার ব্যবধান অনেকটাই বেড়ে যায়।

আত্মবোধের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য :—

- আত্মবোধ শিক্ষণপ্রাপ্ত। তার কারণ কোনো ব্যক্তি তার স্ব-ধারণা নিয়ে জন্মায় না। ব্যক্তির প্রাথমিক কিছু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এটি গঠন হয়, এবং পরবর্তীকালের কিছু অভিজ্ঞতা দিয়ে আবার ব্যক্তির এই স্ব-ধারণাটি পুনর্গঠিত হয়।
- ব্যক্তির স্ব-ধারণা সংগঠিত। ব্যক্তির আত্মবোধ অত্যন্ত স্থায়ী ও পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে। তার কারণ ঘন ঘন স্ব-ধারণা পরিবর্তন হলে ব্যক্তিত্ব নির্ভরশীল হবে না। স্ব-ধারণা একদিনে তৈরি হয় না। ব্যক্তির প্রত্যক্ষিত সাফল্য ও ব্যর্থতা আত্মবোধ গঠনে প্রভাব বিস্তার করে।
- স্ব-ধারণা একটি প্রাণবন্ত প্রক্রিয়া, এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটি সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বে নতুন বিষয় সারাক্ষণ সংযুক্তিকরণ হচ্ছে এবং পুরানো কিছু বিষয় নিযুক্তিকরণ হচ্ছে। ব্যক্তিকে অনেক সময় প্রাক্ষোভিক সন্তুষ্টির জন্য তার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা ত্যাগ করতে দেখা গেছে।

৪.৩.২ আত্মমর্যাদা (Self esteem)

আত্মমর্যাদা হল ব্যক্তির গুণাবলি ও ক্ষমতার প্রতি তার নিজের ধারণা বা সে নিজেকে কীভাবে নিজের কাছে মূল্যায়ন করছে।

গেল (১৯৯৮) বলেছেন যে আত্মমর্যাদা দুটো জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি হল অন্যের কাছে সে কতখানি গ্রহণযোগ্য। ও দ্বিতীয়টি কোনো একটি কার্যসিদ্ধি করতে গেলে এবং কোনো সমস্যা সমাধান করতে গেলে যে দক্ষতা দরকার হয় তার ধারণার ওপর।

এককথায় বলা যেতে পারে যে Self-Esteem হল Self-Concept বা আত্মবোধের পরিমাপক অংশ।

উদাহরণ : গত চার বছর ধরে রেখা প্রত্যেক বছর Quiz প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করছে ও বিজয়িনী হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক তার ক্ষমতার প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। ফলে রেখা নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং তার মধ্যে একটি ধনাত্বক Self Image গড়ে উঠেছে। ফলে Quiz সম্পর্কে সে খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠে, যার জন্য সে যথেষ্ট পড়াশোনা করে এবং তার পুঁথিগত যোগ্যতার ওপর তার প্রতিফলন দেখা যায়।

ওপরের উদাহরণ থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যেমন—

(ক) Self-Esteem শুধুমাত্র ব্যক্তির চিন্তাভাবনার ফল নয়, অন্যান্যদের বিচারের উপর নির্ভর করে।

(খ) Self-Efficacy হল আত্মবোধের আর একটি উপশ্রেণি। Self-Efficacy হল কোনো কাজ সমাপ্ত করার ক্ষমতার প্রতি তার আস্থা।

Self Concept = Self Esteem + Self Efficiency

৪.৩.৩ সামাজিক তুলনা (Social comparison)

সব ব্যক্তিই একটি সামাজিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে। ব্যক্তির আশেপাশের লোকজনেরাই তার স্ব-ধারণা বা আত্মবোধ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। সামাজিক তুলনার অর্থ হল নিজের সাথে অন্যান্যদের তুলনা করা। সাধারণ মানুষ রোজই কিছু না কিছু সামাজিক তুলনায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে। বা আমরা বলতে পারি যে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক তুলনায় আগ্রহী হয়।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হল সামাজিক সম্পর্ক। এরা প্রধানত তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। যেমন—

(১) জনগণ কেন সামাজিক তুলনায় আগ্রহী হয়?

এই উত্তরে তিনটি কারণ বলা হয়েছে।

(ক) ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। (Festinger, 1954)

(খ) সামাজিক তুলনার মাধ্যম দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। (Taylor, Wayment & Carills, 1961)

(গ) সামাজিক তুলনার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি নিজের উন্নতি করতে চায়।

(২) কাদের সঙ্গে জনগণ নিজেদের তুলনা করে?

এখানে আমরা তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই।

(ক) জনগণ নিজেদের সমমানের ব্যক্তিদের নির্বাচনের মাধ্যমে সামাজিক তুলনা করে। (Festinger, 1954)

(খ) যে সব ব্যক্তি নিজেকে বড়ো হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তারা তুলনার ক্ষেত্রে তাদের থেকে নিম্নমানের ব্যক্তিদের নির্বাচন করে। (Wills, 1981)

(গ) যেসব ব্যক্তি নিজেকে উন্নত করতে চায় তারা সব সময় তাদের থেকে অপেক্ষায় উন্নত পারদর্শিতা দেখায়। অর্থাৎ তুলনীয় ব্যক্তির স্ট্যান্ডার্ড হবে উচ্চমানের। (Baudura, 1986-1991)

৩) কীভাবে সামাজিক তুলনা নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করে?

সামাজিক তুলনা বিভিন্ন উপায়ে আত্মমূল্যায়নকে সম্ভব করে তোলে। অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া, প্রেষণা এবং আচরণগুলি অন্যদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে ব্যক্তির আত্ম প্রত্যক্ষণ স্পষ্ট রূপ লাভ করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার নিরিখে ব্যক্তি নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে। অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষমতার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে এই মূল্যায়ন সম্ভব যা ব্যক্তির আত্মধারণাকে প্রভাবিত করে।

৪.৩.৪ অভ্যান্তরীকরণ (Internalization)

অভ্যন্তরীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজনের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের সমন্বয় করা হয়। এটি শিখনের ক্ষেত্রে প্রায় যুক্ত করা হয়ে থাকে। মনোবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীকরণ হল মনোভাব, মূল্যবোধ, নিজের সম্পর্কে অন্যদের মতামত। শৈশবকালে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অনেক আচরণ অভ্যন্তরীকৃত করে থাকি আমরা। এটি হচ্ছে প্রধান চাবিকাঠি যা শিশুর ভবিষ্যতের নৈতিক আচরণের পূর্বাভাষ দেয়। যেসব শিশুর নিজেদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ভালো এবং নৈতিক, পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা দেখা যায়।

৪.৩.৫ আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-control)

শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সাহায্য করা। জীবন পরিবেশে ব্যক্তির সার্থক অভিযোজন, তার আত্মবোধের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই আত্মবোধের যথাযথ প্রস্তুতি ব্যক্তিকে সার্থক সামাজিক জীবনযাপনে সহায়তা করবে। আমরা দেখেছি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে, নিজস্ব ক্ষমতা ও অক্ষমতার তুলনামূলক বিচার করতে পারে। আত্মবিশ্লেষণ ও নিজের আচরণের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়। জীবনের বিভিন্ন জটিল পরিবেশ ও পরিস্থিতি-তে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও কৌশল, ব্যক্তিকে সুনাগরিকের জীবনযাপনে সাহায্য করবে।

বিদ্যালয়ের শিখন-পরিবেশে শিক্ষক বিভিন্ন বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পরোক্ষ নির্দেশনা দিলে, শৈশব থেকেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও কৌশল জাগরিত হবে। শিক্ষক বিদ্যালয়ে এমন সমাজ-পরিবেশ গড়ে তুলবেন যেখানে শিক্ষার্থীরা অবাধ বিচরণের সুযোগ পায় অর্থাৎ শিশু তার চারিপাশে যা দেখবে তাই শিখবে। শিশু যেন মেলামেশার সুযোগ, খেলাধুলার সুযোগ ও বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার যথাযথ নির্দেশনা পায়। এছাড়া (i) বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রক্ষোভের অবাধ প্রকাশে নিয়ন্ত্রণ আসবে। শিক্ষকের প্রাক্ষোভিক পরিণমন ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার্থীদের পরোক্ষ নির্দেশনা দেবে। (ii) দলগত কাজকর্মে সহানুভূতির বিকাশে প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ বিশেষ কার্যকরী। (iii) সহযোগিতার বিরুদ্ধে কাজ করে যে সমস্ত অনুভূতি যথা ঈর্ষা, ঘৃণা ইত্যাদির যথেচ্ছ প্রকাশে নিয়ন্ত্রণ এনে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও কৌশল জাগরণের দিকে শিশুকে প্রভাবিত করতে হবে। (iv) প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উভয়ের-ই উন্নতি ঘটায় তবে প্রতিযোগিতা যেন সহযোগিতাকে ব্যাহত না করে, সেদিকে লক্ষ রেখে আত্মনিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা প্রয়োজন। আত্মনিয়ন্ত্রণের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে, ব্যক্তি নিজস্ব প্রক্ষোভ প্রকাশে এবং আচরণে নিয়ন্ত্রণ অর্জনের ক্ষমতা লাভ করে। জীবন পরিবেশের বিভিন্ন প্রলোভন এবং অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ব্যক্তিকে সুনাগরিকতার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। আত্মনিয়ন্ত্রণের একাধিক মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ রয়েছে।

৪.৪ নৈতিক বিকাশ : কোহলবার্গের দৃষ্টিভঙ্গি (Moral Development : Perspectives of Lawrence Kohlberg)

লরেন্স কোহলবার্গ (Lawrence Kohlberg) পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশের তত্ত্বের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি আরও গবেষণা করে নিজের কিছু মৌলিক ধারণার কথা ব্যক্ত করেন। পিঁয়াজ-এর মতো গল্প বলা পদ্ধতির সাহায্যে তিনি অন্যদের সামনে কিছু নৈতিক টানাপোড়েন বা দ্বিধার (Dilemmas) বিষয় উপস্থাপন করেন। প্রতিটি টানাপোড়েনের উত্তর তার গবেষণাকে প্রভাবিত করে এবং তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তিত হয় ও বৃদ্ধি পায়। নৈতিক টানাপোড়েনের গল্পগুলির মধ্যে কোহলবার্গের Heinz Dilemma গল্পটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত তথ্য নৈতিক সংকট বা মানসিক টানাপোড়েনের ঘটনার উপর উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নৈতিক বিচার এবং বিষয়বস্তু কোনোভাবেই কিন্তু সংযুক্ত থাকে না। কিন্তু পরবর্তী পর্যায় দুটি সমন্বিত হয়ে একটি নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বটির তিনটে ধাপ আছে এবং প্রতিটি ধাপে দুটো করে মোট ছটি পর্যায়ে নৈতিক বিকাশ লক্ষ করতে পারি।

(ক) প্রাক্-প্রথাগত নৈতিকতার স্তর (Pre-Conventional Stage)

এই স্তরে পিঁয়াজের তৈরি করা স্তরের মতোন/অনুরূপ বাইরের কর্তৃত্ব বা নির্দেশ অনুসারে নৈতিকতা, শাস্তিদানের ভয়ে নৈতিকতা।

(i) প্রাক্-প্রথাগত প্রথম পর্যায় : শাস্তি ও বাধ্যতার নৈতিকতা।

(ii) প্রাক্-প্রথাগত দ্বিতীয় পর্যায় : উদ্দেশ্যমুখী মনোভাবের নৈতিকতা।

প্রথম পর্যায়ে শিশুদের নিজেদের নৈতিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠা যথেষ্ট কঠিন, তাই উদ্দেশ্যটা বুঝে নিজে নৈতিক বিচার করাটা এই পর্যায়ে সম্ভব হয় না। ফলস্বরূপ শিশুরা বাইরের কোনো নির্দেশে (যেমন কর্তৃপক্ষের মতামত) শাস্তি ও পুরস্কারের ভিত্তিতে নৈতিক আচরণগুলি সম্পন্ন করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু একই কাজের জন্য একের বেশি মতামত গ্রহণ করে থাকে। এটা করার ফলে সে পারস্পরিক আদান -প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়। অর্থাৎ "তুমি আমার জন্য কোনো কাজ করলে, তবে আমি তোমার জন্য করব।"

(খ) প্রথাগত নৈতিকতার স্তর (Conventional Stage)

এই পর্যায়ে যেহেতু ব্যক্তি সামাজিক বিধিনিষেধে অভ্যস্থ হয়ে পরে তাই সে যে-কোনো ঘটনাকেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে থাকে। এই বোধ কিন্তু শুধুমাত্র আত্মস্বার্থ রক্ষা করার জন্য নয় বরং প্রচলিত প্রথাবিধিকে সমর্থন করা এবং তার মধ্যে দিয়ে যথার্থ সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করা যায় বলে বিশ্বাস করে।

(i) **প্রথাগত প্রথম পর্যায় :** এই স্তরে আমাদের সকলেরই 'ভালো ছেলে-ভালো মেয়ে' হবার প্রবণতা থেকে থাকে। তাই এই স্তরকে Self-individualization বা আত্ম ব্যক্তি সক্রিয়তা বজায় রাখার স্তর বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার ফলে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হবার সঙ্গে নৈতিকতাবোধের সৃষ্টি হয় এবং তখনই প্রতিদানের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(ii) **প্রথাগত দ্বিতীয় পর্যায় :** এই স্তরে আমাদের সবাইকার সামাজিক বিধি মেনে চলার প্রবণতা থাকে। তাই সে বৃহত্তর ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করে। অর্থাৎ নিজস্ব নৈতিকবোধ সামাজিক বিচার ও বোধে পরিণত হয়।

(গ) উত্তর প্রথাগত নৈতিকতার স্তর (Post Conventional Stage) :

এই স্তরে ব্যক্তি সামাজিক রীতিনীতিকে প্রশ্ন করতে শুরু করে ও বিমূর্ত চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম হয়। তার পরিস্থিতি ও সামাজিক পরিবেশ পর্যালোচনা করতে শেখে।

(i) **উত্তর প্রথাগত প্রথম পর্যায়ে সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত মনোভাবের বদল :** সামাজিক সমস্ত রীতিনীতি মানুষের জন্য তৈরি এবং মানুষের প্রয়োজনে তা পরিবর্তিত হবে এটাই বাস্তব। মানব অধিকার রক্ষা করার জন্য এই পরিবর্তন আবশ্যিক বলে এই পর্যায় মনে করা হয়।

(ii) **উত্তর প্রথাগত দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বজনীন নীতিবোধের প্রকাশ :** এটি হল নৈতিক বিকাশের উচ্চতম পর্যায়। এই পর্যায়ে ব্যক্তি নিজের মতো অনুসারে বিবেকবোধের প্রকাশ ঘটায়। সর্বজনসম্মত এক নৈতিক বাতাবরণ রচনা করে।

নমনীয় মনোভাব, মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা নৈতিক বিচারকরণে সহায়তা করে। যে অভিজ্ঞতাগুলি নৈতিক বিচারকরণে দরকার হয়, সেগুলি হল—

(ক) বন্ধুদের সঙ্গে পারস্পরিক আদানপ্রদান।

(খ) যে-কোনো দ্বন্দ্বের বোঝাপড়ার মাধ্যমে অবসান।

(গ) শিশুপালন ভঙ্গিমায় উষ্ণতা ও বিচারবোধ এবং

(ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের স্তরগুলিকে নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল :

কোহলবার্গের তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ :

- বিদ্যালয়ে বা শ্রেণীকক্ষে প্রযুক্ত নিয়মনীতিগুলি খুব স্পষ্ট ভাবে বলা দরকার এবং প্রয়োগ করার সময় কোন পক্ষপাতিত্ব দেখানো উচিত নয়।
- নৈতকি দ্বন্দ্বের সমাধান প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীকে করতে দিতে হবে, না পারলে উদাহরণ সহযোগে সঠিক পথে চালিত করতে হবে।
- পাঠ্যক্রমে মধ্যে নীতিবোধের উপাদান সংযুক্ত করা দরকার।
- ব্যক্তিগত এবং স্বাভাবিক ঘটনা থেকে নৈতিক উদাহরণ বেছে নিলে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়।
- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা, দলগত নৈতিক দায়িত্ব, ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অপেক্ষা দলগত প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি নৈতিক বিকাশে সহায়তা করবে।

৪.৪ সারসংক্ষেপ (Summary)

একজন ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব যা কিছু, তার সমবায়ই হল তার অহং (self)। ব্যক্তির নিজস্ব গুণাবলি ও অক্ষমতার সংমিশ্রণে তার নিজের সম্বন্ধে যে মনোভাব তাই হল তার স্ব-ধারণা। ব্যক্তি নিজেকে যথার্থভাবে পরিমাপ করতে সক্ষম কি না তার চিত্র পাওয়া যায় তার আত্মবর্ণনায়। যে ব্যক্তি নিজেকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন তিনিই পারবেন অপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করতে। ব্যক্তি নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বয়ে নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে তোলে তার দ্বারাই অহংবোধ গড়ে ওঠে। ব্যক্তির অনুভূতি জীবনের মূল্যায়ন ব্যক্তির আত্মমর্যাদা গঠনে সাহায্য করে। সামাজিক তুলনার মাধ্যমে নিজের অহংসত্তার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ক্রমোচ্চশীল সমন্বয়ের পথে, বিভিন্ন ধরনের অহংবোধের সমন্বয় ঘটতে থাকে। এইভাবে প্রকৃত অহংবোধ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তির আচরণে সামঞ্জস্য আসে। জীবনের বিভিন্ন জটিল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও কৌশল, ব্যক্তিকে সুনাগরিকের জীবনযাপনে সহায়তা করে। জীবন বিকাশের পথে মূল্যবোধের জাগরণ এবং ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জনকেই নৈতিক-বিকাশ বলে। মানুষের

নীতিবোধের বিকাশ যে প্রধানত যুক্তি ও বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল, লরেন্স কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্বের মাধ্যমে তা জানা যায়।

৪.৫ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. অহম সত্তা গড়ে ওঠে —

(ক) নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় (খ) মানসিক সংগঠনের মাধ্যমে

(গ) আত্মসচেতনতা থেকে (ঘ) কোনটিই নয়

২. মূল্যবোধ হল —

(ক) বস্তুর মূল্য (খ) সস্তা ও দামি জিনিস পৃথক করার বোধ

(গ) বেতন (ঘ) নৈতিকতা

৩. মানবজীবন বিকাশের জন্য নৈতিক-বিকাশের তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন —

(ক) পিঁয়াজে (খ) ভাইগোটস্কি

(গ) কোহলবার্গ (ঘ) অ্যালপোর্ট

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আত্মবোধ বলতে কী বোঝায়?

২. সামাজিক তুলনার ফলাফল কী?

৩. আত্মমর্যাদা কাকে বলে?

৪. নৈতিক-বিকাশ বলতে কী বোঝেন?

৫. আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা কী?

৬. অন্তর্ভুক্তিকরণ বলতে কী বোঝায়?

৭. আত্মনিয়ন্ত্রণ কী?

৮. অভ্যন্তরীকরণ কী?

৯. "ভালো ছেলে-মেয়ের নৈতিকতা" বলতে কী বোঝ?

C. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. অহংবোধ বলতে কী বোঝায়?

২. অন্তর্ভুক্তিকরণ (Internalization) বলতে কী বোঝেন?

৩. শিশুর জীবন বিকাশে নৈতিক বিকাশের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

D. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের স্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করুন। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ বর্ণনা করুন।

২. অহংবোধ বলতে কী বোঝায়? কীভাবে প্রকৃত অহংবোধ গড়ে ওঠে? ব্যক্তি কখন যথার্থরূপে আত্ম বর্ণনা দিতে পারে?

অধ্যায় ৫

প্রক্ষোভমূলক বিকাশ
(Emotional Development)

৫.১ সূচনা (Introduction)

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.৩ প্রক্ষোভমূলক বিকাশ — প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতার বিকাশ (ভালোবাসা, স্নেহ, ভয়, রাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি) (Emotional Development : Development of emotions and the ability to regulate the emotional reactions - love, affection, fear, anger, jealousy etc.)

৫.৪ জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ (প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর, বাল্যকাল, কৈশোর কাল) (Deveopment of emotions at different stages (pre-school, childhood and pubertal stages)

৫.৫ প্রক্ষোভমূলক বিকাশের অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ধারা (Development of emotions as continuous and discontinuous)

৫.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

৫.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

৫.১ সূচনা (Introduction)

প্রক্ষোভ মনোবিদ্যার এক জটিল বিষয়বস্তু, মানুষের অনুভূতি ও প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আচরণ অনুশীলন করলে মনোবিদ্যার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। প্রক্ষোভ অনুভূতি (Feeling) থেকে উদ্ভূত। অনুভূতি যখন প্রবল আকারে প্রকাশ পায় এবং আমাদের দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তখন তাদের আমরা বলি প্রক্ষোভ।

বুদ্ধি নির্ভর মানুষের অনেক আচরণই প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক জীবনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যক্তির প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই প্রক্ষোভের সুষ্ঠু বিকাশ না হলে জীবন বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। ভয়, রাগ, ঘৃণা, হিংসা প্রক্ষোভের অবাধ বহিঃপ্রকাশ সমাজজীবনে কাম্য নয়। জীবন বিকাশে প্রক্ষোভমূলক বিকাশেরই অন্তর্গত। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ ঘটতে থাকে। প্রক্ষোভমূলক বিকাশ বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘটে।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। প্রক্ষোভের অর্থ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং প্রক্ষোভের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

২। প্রক্ষোভমূলক বিকাশ কাকে বলে এবং সমাজজীবনে যথাযথ প্রক্ষোভমূলক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।

৩। প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ দক্ষতার বিকাশের কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।

৪। জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের প্রক্ষোভমূলক আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।

৫। সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাক্ষোভিক আচরণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।

৬। প্রাক্ষোভিক বিকাশ, জীবন-বিকাশেরই অন্তর্গত তা জ্ঞাত হওয়া।

৭। প্রাক্ষোভিক বিকাশ যে বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘটে তা জ্ঞাত হওয়া।

৫.৩ প্রক্ষোভমূলক বিকাশ: প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতার বিকাশ — (ভালবাসা, স্নেহ, ভয়, রাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি) (Emotional Development : Development of emotions and the ability to regulate the emotional reactions - love, affection, fear, anger, jealousy etc.)

প্রক্ষোভ (Emotion) : অর্থ ও সংজ্ঞা

দীর্ঘদিন অদর্শনের পর প্রিয়জনকে দেখে আমরা আনন্দে জড়িয়ে ধরি, আনন্দাশ্রু মোচন করি যা আমাদের অন্তরকে হালকা করে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের ফলে আমরা যে শুধুমাত্র বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা লাভ করি, তা নয়, একটা আন্তরিক অবস্থার-ও সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির এই আন্তরিক অবস্থাকে বলা হয় অনুভূতি (Feeling)। প্রক্ষোভ (Emotion) অনুভূতি প্রসূত একটি অবস্থা। প্রক্ষোভের ইংরাজি প্রতিশব্দ Emotion। এই ইমোশন (Emotion) শব্দটি ল্যাটিন ধাতু 'ইমোভার' (Emovere) থেকে এসেছে, যার অর্থ হল, 'প্রক্ষুব্ধ হওয়া' বা উত্তেজিত হওয়া। 'প্রক্ষোভ' বলতে মনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমান অবস্থাকে বোঝায় যা ব্যক্তিকে দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে। ম্যাকডুগাল (Mcdougal) তাঁর প্রবৃত্তির তত্ত্বে প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মানসিক অবস্থাকে বলেছেন প্রক্ষোভ। তিনি বলেছেন — "Emotion was regarded as a mode of experience which accompanies the working within us of instinctive impulses." মনোবিদ স্ট্রংম্যান (Strongman) প্রক্ষোভের বিভিন্ন সংজ্ঞা অনুশীলন করে একটি বিজ্ঞানসম্মত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন — "There is no consensus on the definition of emotion. At present emotion defines definition." তাই প্রক্ষোভ কী তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে গেলে প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা প্রয়োজন।

প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Emotion)

১। **প্রক্ষোভ-উদ্দীপক :** প্রত্যেক প্রক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্য একটি উদ্দীপক প্রয়োজন। অর্থাৎ উদ্দীপককে কেন্দ্র করেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

২। **প্রক্ষোভ-প্রবৃত্তি :** ম্যাকডুগাল বলেছেন প্রক্ষোভ-প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকে এবং তা প্রবৃত্তিমূলক কাজের একটা দিক। প্রক্ষোভ এবং প্রবৃত্তিমূলক কাজের মধ্যে সবসময় স্থির সম্পর্ক দেখা যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে একই প্রক্ষোভ বিভিন্ন ধরনের আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।

৩। **প্রক্ষোভ-দৈহিক পরিবর্তন :** প্রক্ষোভের সঙ্গে দেহযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক প্রক্ষোভের সঙ্গে কিছু না কিছু দৈহিক পরিবর্তন হয়।

৪। **প্রক্ষোভের স্থায়িত্ব :** প্রক্ষোভের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, মনের এই অবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে কমে।

৫। **প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন :** বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং সামাজিক সংস্কারের প্রভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া ক্রমশ জটিল হতে থাকে।

৬। **প্রক্ষোভ ও ইচ্ছা :** অনেকক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তি এবং ব্যক্তির মানসিক আকাঙ্খা বা প্রবল ইচ্ছাকে জোর করে অবদমন করলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

৭। **দৈহিক অসুস্থতা ও প্রক্ষোভ :** সাময়িক দৈহিক অসুস্থতা অস্থায়ী প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে। অপরদিকে চিরস্থায়ী দৈহিক অবস্থার দরুন আমাদের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অনেক সময় স্থায়ী প্রক্ষোভমূলক মানসিক সংগঠন সৃষ্টি হয়।

প্রক্ষোভের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে একথা বলা যেতে পারে, প্রক্ষোভ কোনো বিশেষ বস্তু বা অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের মানসিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে প্রক্ষোভের জটিলতা বাড়তে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক আচরণের যেমন পৃথকীকরণ (Differentiation) হয়, তেমনি আবার কতকগুলো প্রক্ষোভ একত্রিত

হয়ে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। ওয়াটসন (J. B. Watson) বলেছেন, মানুষের মৌলিক প্রক্ষোভ মাত্র তিনটি — ভয় (Fear), ক্রোধ (Anger) এবং ভালবাসা (Love) , স্ট্যাগেনার মতে চারটি মাত্র মৌলিক প্রক্ষোভ আছে — ভালোলাগা (Pleasure), খারাপ লাগা বা বেদনা (Pain), উত্তেজনা (Elation) এবং বিমর্ষতা (Depression).

ম্যাকডুগাল মানুষের প্রক্ষোভকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন — ১। প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্ষোভ (Primary Emotion) ২। জটিল বা মিশ্র প্রক্ষোভ (Secondary or Complex emotion) এবং ৩। অর্জিত প্রক্ষোভ (Acquired emotioned)।

১। **প্রাথমিক প্রক্ষোভ (Primary or basic emotions) :** ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তির মতো মৌলিক বা প্রাথমিক প্রক্ষোভও চোদ্দটি। এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি হল — ভয় (Fear), ক্রোধ (Anger), বিরক্তি (Disgust), স্নেহানুভূতি (Tender Emotion), কাম (Lust), বিস্ময় (Wonder), হীনমন্যতা (Negative self feeling), আত্মগৌরব (Positive self feeling), একাকীত্ববোধ (Feeling of lonliness), স্বাধিকারবোধ (Feeling of ownership), সৃজনীস্পৃহা (Feeling of creativeness), আমোদ (Amusement), ক্ষুধা (Guste), দুস্থভাব (Feeling of distress)

২। **জটিল বা মিশ্র প্রক্ষোভ (Secondary or Complex emotions) :** অনেকক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রক্ষোভসমূহ একত্রে মিশে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। ম্যাকডুগাল (Mcdougall) এই ধরনের কয়েকটি মিশ্র প্রক্ষোভের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন— অবমাননা (Contempt), বিভীষিকা (Horror), করুণা (Awe), প্রশংসা (Admiration), শ্রদ্ধা (Reverence), কৃতজ্ঞতা (Gratitude), ঈর্ষা (Envy), প্রতিশোধমূলক অনুভূতি (Revengeful emotion), হতাশা (Embarrasment), লজ্জা (Shame), পরশ্রীকাতরতা (Jealousy) ইত্যাদি।

৩। **অর্জিত প্রক্ষোভ (Acquired emotions) :** প্রাথমিক প্রক্ষোভ এবং মিশ্র প্রক্ষোভ ব্যতীত ম্যাকডুগাল (Mcdougall) আর একটি প্রক্ষোভের কথা বলেন। কয়েকটি প্রক্ষোভ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মনের কোনো প্রবল আকাঙ্খা প্রণোদিত। বিষাদ, উল্লাস, আশা, আশঙ্কা ইত্যাদি কয়েকটি প্রক্ষোভকে প্রাথমিক বা মিশ্র প্রক্ষোভের অন্তর্গত করা যায় না। তিনি এই ধরনের প্রক্ষোভের নাম দিয়েছেন অর্জিত প্রক্ষোভ।

৫.৩.১ প্রক্ষোভমূলক বিকাশ (Development of emotions)

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন। তার জীবন বিকাশ শুধুমাত্র কোনো এক দিকের বিকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী প্রক্ষোভ (emotion) এবং বিচার বিবেচনা (Rationality) পরস্পরের পরিপূরক। যে-কোনো উদ্দেশ্যমুখী কাজের পেছনে প্রেষণামূলক শক্তি প্রয়োজন। উদ্দেশ্যমুখী বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রক্ষোভের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই কারণে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রচেষ্টার মধ্যে শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জন্মসময় শিশুর প্রক্ষোভ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা শিশুর প্রাথমিক উত্তেজনার প্রবণতা শিশুসুলভ এক একটি স্বাতন্ত্র প্রক্ষোভে পরিণত হয় এবং পরে ধীরে ধীরে শিশুসুলভ প্রক্ষোভ পরিণত মানুষের প্রক্ষোভে পরিণত হয় তাকেই বলা হয় প্রাক্ষোভিক বিকাশ।

তবে শিশুসুলভ প্রক্ষোভ এবং বড়োদের প্রক্ষোভের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যথা :

(১) শিশুদের প্রক্ষোভ সংক্ষিপ্ত ও বেশিক্ষণ স্থায়ী নয়, কিন্তু বড়দের প্রক্ষোভ স্থায়ী হতে পারে।

(২) শিশুদের প্রক্ষোভ তীব্র হয়, কিন্তু বড়োরা নিজের প্রক্ষোভের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(৩) শিশুর প্রক্ষোভ সহজেই পরিবর্তনশীল, কিন্তু বড়দের প্রক্ষোভ অনেক ক্ষীণ এমনকি দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে।

(৪) শিশুদের প্রক্ষোভকেন্দ্রীক আচরণ ঘন ঘন দেখা যায়, বড়োদের তা হয় না।

সুসান আইজক্‌স (Susan Issacs) বলেছেন, মানব শিশুর মধ্যে জন্মাবস্থায় চার ধরনের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে — ভয় (Fear), রাগ (Anger), ভালবাসা (Love), এবং ঘৃণা (Hate). ওয়াটসন (Watson) বলেছেন সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া থাকে ঠিকই, কিন্তু তার প্রকৃতি বয়স্কদের মতো অত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ নয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে শিশুর প্রক্ষোভ জন্মাবস্থায় খুব আবছা থাকে এবং তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়।

সামাজিক জীবনের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যক্তির প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই প্রক্ষোভের সুষ্ঠু বিকাশ না হলে জীবন বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে না পারলে সেই ব্যক্তিকে কখনোই পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া করার অর্থ হল — বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলিকে সমাজসম্মতভাবে প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন। এই ক্ষমতার বিকাশ ব্যক্তিজীবনে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ে থাকে। ইহাই প্রাক্ষোভিক বিকাশ। প্রক্ষোভ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের দিক নিরুপণ করে দেয়। পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তায় প্রাক্ষোভিক বিকাশ ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ধারণ করে। এই কারণে প্রাক্ষোভিক বিকাশ ব্যক্তিজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৩.২ প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ দক্ষতার সামর্থ্য (Ability to regulate the emotional reactions)

সমাজজীবনের সচেতন মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যক্তির প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই প্রক্ষোভের সুষ্ঠু বিকাশ না হলে জীবনের বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, তাকে কখনই পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। যথাযথভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করার অর্থ হল — বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলোকে সমাজসম্মতভাবে প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন। এর জন্য প্রক্ষোভমূলক পরিণমন একান্ত প্রয়োজন। প্রক্ষোভমূলক পরিণমন (Emotional maturity) বলতে সব বয়সের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থির মান বলা হচ্ছে না। বিশেষ বয়সের উপযোগী যে পরিমাণ প্রক্ষোভের বিকাশ হওয়া উচিত সেটাই কাম্য। হারলক (Hurlock) প্রক্ষোভমূলক পরিণমন বলতে জীবনযাপনের ক্ষমতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব (Relative importance) নিয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। ম্যাকডুগাল তাঁর প্রবৃত্তিতত্ত্বে বলেছেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা বিশেষ বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করি বা তার প্রতি মনোযোগ দিই। বস্তুর প্রত্যক্ষণ আমাদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা (Insperation to action) জাগিয়ে তোলে। সুতরাং তার মতে সহজাত প্রক্ষোভ-ই হল কাজের বা আচরণের উৎস। স্যান্ড (Shand) এই প্রক্ষোভের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি মনে করেন, ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা যা তার আচরণের দিক নির্ণয় করে, তা গঠিত হয় এই প্রক্ষোভের সমন্বয়ে। (Emotions are the foundation of Character — Shand).

প্রক্ষোভের সময় যে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of emotion) দ্বারা মানসিক অবস্থার প্রকৃতির সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রক্ষোভের সময় যে আচরণ হয়, তার একটি উদ্দেশ্য থাকে তাই প্রক্ষোভ চলে যাওয়ার পরেও সেই আচরণগুলো ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ করা যায়। এর থেকে বলা যায়, প্রক্ষোভের কেন্দ্র হাইপোথ্যালামাস হলেও তার প্রকৃতি অনেকাংশে গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই কারণে প্রক্ষোভের প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের বোধমূলক তত্ত্বের (Cognitive theory) প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ (Perception), যুক্তি (Reasoning), স্মৃতি (Memory), কল্পনা (Imagination) ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আমাদের মধ্যে কিছু হানিকর প্রক্ষোভ (Disruptive emotions) আছে, যেগুলির অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে ব্যাহত করে। অপরদিকে কিছু প্রক্ষোভ সমাজজীবন এবং ব্যক্তিজীবন উভয় দিক থেকেই ভালো। এই ধরনের প্রক্ষোভের প্রকাশ ব্যক্তিজীবন তথা সমাজজীবনের পক্ষে মঙ্গলকারক।

- **ভালোবাসা (Love)**

ভালোবাসা বলতে আমরা অন্তরের একটা বিশেষ অনুভূতি বুঝি যার দ্বারা আমরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই। শিশুর প্রাথমিক শৈশবকালে (early infancy) ভালোবাসা মায়ের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে বিকশিত হতে থাকে। ৬ মাস বয়সের শিশু পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। প্রান্তীয় শৈশবকালে (Late infancy) শিশুর ভালোবাসা পরিবার ছাড়িয়ে বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়। তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ভালোবাসা, খেলার সামগ্রীর প্রতি ভালোবাসা লক্ষ করা যায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশুর প্রাক্ষোভিক পরিণমন ঘটে। সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ ও প্রাক্ষোভিক পরিণমন শিশুর ভালোবাসার যথাযথ প্রকাশ ও বিকাশ ঘটায়। সুন্দরের প্রতি আসক্তি, মহতের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতিবেশীদের প্রতি সহমর্মিতা, সহপাঠীদের প্রতি আন্তরিকতা, গরীব দুঃখীর প্রতি করুণা ভালোবাসার বিভিন্ন রূপ। যথাযথ শিক্ষা ও নির্দেশনা এই ইতিবাচক প্রক্ষোভটির উৎকর্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ ঘটাবে।

- **স্নেহ (Affection)**

ভালোবাসার আরেকটি রূপ হিসাবে আমরা স্নেহকে বিবেচনা করতে পারি। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ভালোবাসা, যত্নশীল হওয়া, তার ভালোমন্দের প্রতি অতি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হওয়াকে আমরা স্নেহ বলতে পারি। প্রক্ষোভিক পরিণমন প্রক্ষোভের যথাযথ প্রকাশে সাহায্য করে।

- **ভয় (Fear)**

ভয় বা ভীতিকে আমরা হানিকর প্রক্ষোভ বলে অভিহিত করতে পারি। প্রাথমিক শৈশব কাল (Early childhood) থেকেই শিশুর মধ্যে ভয় বা ভীতি দেখা যায়। উচ্চশব্দ, অন্ধকার, একা থাকা, উচ্চস্থান থেকে পড়ে যাওয়া শিশুর ভীতির উদ্দীপকসমূহর অন্যতম। প্রাথমিক বাল্যকালে ভয় বিশেষভাবে দেখা যায়। ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয় এমনকি বিদ্যুৎ চমকালেও এরা ভয় পান। এই ভয় তাদের মনে কল্পিত বিপদের আশঙ্কা থেকেই দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের আশঙ্কা এই বয়সের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। সাধারণভাবে মানুষের জীবনে ভয় কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয় আবার চলেও যায়। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে যখন ব্যক্তিজীবন থেকে এই ভয় দুর হয় না, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় বালক-বালিকাদের মধ্যে আহেতুক ভয় সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য এই ধরনের ভয় দূর করতে হবে। ভয়ের সাধারণ কারণগুলি ব্যতীত কোনো শিশুর জীবনের কোনো অনভিপ্রেত-অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তার অভাব, পিতা-মাতার বিচ্ছেদ, অশান্তি শিশুর জীবনে ভয় সৃষ্টি করে। শিশুর ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে বা শিশুকে অতিরিক্ত শাসন করে ভয় দুর করা যাবে না। • ভয়ের প্রকারভেদ : মেরি ছাদুরিক তাঁর "Difficulties of Child Development" বইতে শিশুদের নিম্নলিখিত ভয়গুলির কথা বলেছেন—

(১) একা একা থাকার ভয় (Antophobia)

(২) জোরে শব্দ বা গোলমালের ভয় (Phonophobia)

(৩) অন্ধকারের ভয় (Nyctophobia)

(৪) কুকুরের প্রতি ভয় (Cynophobia)

(৫) উঁচু জিনিসের প্রতি ভয় (Acrophobia)

(৬) সর্পভয় (Ophidiophobia)

(৭) অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি ভয় (Xenophobia)

(৮) ভূত-প্রেতের ভয় (Phasmophobia)

(৯) ইনজেকশনের প্রতি ভয় (Trypanophobia)

শিশুর ভয় দূর করার জন্য কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন :

১। নির্ভীকতার আদর্শ তুলে ধরা। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনী আলোচনার মাধ্যমেও এ কাজ করা যেতে পারে। নির্ভীক আচরণের দ্বারা শিশুদের প্রভাবিত করা যেতে পারে।

২। শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। শিশুর নিজের প্রতি আস্থা বোধ জন্মালে সে সাহসের সঙ্গে ভয়কে অতিক্রম করার চেষ্টা করবে। বিভিন্ন সহজ ও শিশুদের উপযোগী কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা যায়।

৩। অনুবর্তনের দ্বারা অযথা ভয় দূর করা যেতে পারে। যেমন— শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রতি ভয়। এক্ষেত্রে বার বার পরীক্ষা নিয়ে এবং তার সঙ্গে প্রশংসা বা পুরস্কার দিয়ে এই ভয়কে দূর করা যায়।

৪। অকারণ ভয় অনেক সময় অজ্ঞতার জন্য আসে। যে পরিস্থিতি সম্পর্কে শিশুর কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাকেই তারা ভয় পায়। এই ধরনের ভয় দূর করতে হলে শিশুর অভিজ্ঞতার পরিসর বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং বিষয় বস্তুর বোধগম্যতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৫। ভীতির কারণ অনুসন্ধান, ভীতিমূলক পরিস্থিতি থেকে ভালো উদাহরণ দেওয়া, ভীতির সঙ্গে বিনোদনমূলক উপকরণকে যুক্ত করা, ভীতি সত্ত্বেও কাজ করার প্রেষণাকে উৎসাহদান এবং ভীতির সঙ্গে মোকাবিলা করার উপায়গুলি অনুশীলন করা ভীতি দূর করার ইতিবাচক পদক্ষেপ রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

- **রাগ (Anger)**

রাগ বা ক্রোধ জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রক্ষোভ। কিন্তু এই রাগ বা ক্রোধের প্রকাশ যখন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে তখন তা হানিকর প্রক্ষোভ হিসাবে গণ্য হয়। সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি, রাগে অন্ধ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ অতিরিক্ত রাগ মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। ধ্বংসাত্মক নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ মানুষের কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন এমনকি সুন্দর সামাজিক সম্পর্ককেও বিষময় করে তুলতে পারে।

শিশুদের মধ্যে রাগ বা ক্রোধের প্রকাশ বিভিন্নভাবে দেখা যায়। কারুর ক্রোধের প্রকাশ সামান্য হয় আবার কারুর ক্রোধের প্রকাশ তীব্র হয়। কোনো শিশু অল্পেতে রেগে যায় আবার কোনো শিশুর মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রায় ক্রোধ সঞ্চার না হলে ক্রোধের প্রকাশ ঘটে না। প্রান্তীয় শৈশবকালে শিশুর রাগ হলে রাগের বিষয়বস্তুকে আক্রমণ করা বা জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলার প্রবণতা দেখা যায়। যাকে Impulsive behaviour বলে। প্রাথমিক বাল্যকাল থেকে নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যভাবে শিশু রাগের প্রকাশ ঘটায়। শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। বাল্যকালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দল গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। বিভিন্ন দলগত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দলের প্রতি আনুগত্য, নেতৃত্ব দানের দক্ষতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশের দিকে উৎসাহদান করতে হবে। দলের প্রভাবে যাতে কোনো অন্যায় কাজ না করে, অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মনোভাব না জাগে সেদিকে শিক্ষক/শিক্ষার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিশুদের সামনে বিভিন্ন আদর্শ তুলে ধরে অনুবর্তনের সাহায্যে রাগের কারণ দূর করে অর্থাৎ রাগের বস্তুকে যতদূর সম্ভব সরিয়ে দিয়ে এবং ধৈর্য্যের অনুশীলনের মাধ্যমে অহেতুক রাগকে কমিয়ে ফেলতে সাহায্য করতে হবে। ক্রোধান্বিত অবস্থার শিশু বা শিক্ষার্থীকে কোনোরকম নির্দেশদানের চেষ্টা না করাই শ্রেয়। ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পরে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করে ক্রোধের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। ক্রোধ প্রকাশে নিয়ন্ত্রণ না আনলে শিক্ষার্থীকে মৃদু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্রোধ প্রকাশের (Inhivitive behaviour) নির্দেশনা দিতে হবে।

রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায় :

(১) শিশু অতিরিক্ত রেগে গেলে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। সে কি বলতে চায় মন দিয়ে শুনতে হবে।

(২) শিশুর ভালো কাজের প্রশংসা করা উচিত যাতে সে নিজেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখতে পারে।

(৩) শিশুদের নিয়মিত খেলায় উৎসাহ দিতে হবে।

(৪) অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে রাগকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

(৫) শিশুদের অহেতুক ভুলত্রুটি ধরা এবং বিভিন্ন উৎসাহপূর্ণ কাজে বাধা দিলে তারা রেগে যায়। তাই এইগুলি থেকে শিক্ষক ও পিতা-মাতাকে বিরত থাকতে হবে।

(৬) বর্তমানে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস না পেয়ে শিশুরা অত্যন্ত জেদ ও রাগ দেখায়। বিদ্যালয়ে এগুলি থেকে দূর থাকলেও বাড়িতে জেদ দেখায়। তাই পিতা-মাতাকে বাড়িতে এই ডিভাইসগুলি কম ব্যবহার করতে হবে এবং শিশুর থেকে দূরে রাখতে হবে।

(৭) শিশুর সঙ্গে কথা বলে দৈনন্দিন কাজের একটি রুটিন তৈরি করলে শিশুর মধ্যে সময় সম্পর্কে ধারণা ও কাজ সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা তৈরি হবে। এর মধ্যে দিয়ে রাগের পরিস্থিতি তৈরি হবার প্রবণতা কমে যাবে।

- **ঈর্ষা (Jealousy)**

ভয়, রাগ ইত্যাদির মতো ঈর্ষাও মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রক্ষোভ। সামাজিক জীবনে ঈর্ষার অবাধ বহিঃপ্রকাশ কাম্য নয়। ঈর্ষা হল স্নেহ-ভালবাসা হারানোর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অথবা কোনো পছন্দের প্রিয় বস্তু নিজে না পেয়ে অন্য কেউ পেলেও ঈর্ষার উদ্রেক হয়। এই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক বাস্তব বা কাল্পনিক হতে পারে। অনেক সময় নিজের অক্ষমতা বা অন্যের পারদর্শিতা বা প্রশংসা লাভ শিশুর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে।

(ক) প্রান্তীয় শৈশবকালে প্রক্ষোভের স্থায়িত্ব খুব কম হয়। এই স্তরে শিশুদের নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা একেবারেই থাকে না। ঈর্ষার প্রকাশ খুব সহজে করে। প্রিয় খেলনা, প্রিয় ব্যক্তির উপর কেউ ভাগ বসালে শিশু ঈর্ষান্বিত হয়।

(খ) প্রাথমিক বাল্যকালে সহোদর ভাই-বোনের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ পায়। পিতা-মাতার ভালোবাসা হারানোর ভয়, নিরাপত্তাহীনতা শিশুর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে।

(গ) বিদ্যালয়ে প্রিয় শিক্ষকের অন্য সহপাঠীদের প্রতি মনোযোগ ঈর্ষার উদ্রেক সৃষ্টি করে।

(ঘ) প্রিয় বস্তু বা পছন্দের জিনিস যা শিশুর কাছে নেই, অন্য সহপাঠীর সেই বস্তু শিশুর মনে ঈর্ষার উদ্রেক সৃষ্টি করে। হিংসার প্রকাশ বিভিন্নভাবে হতে পারে, নিয়ন্ত্রণবিহীন ঈর্ষার ফলে শিশুরা বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে ঝগড়া মারামারি করে। শিশুর আঙুল চোষা, অতিরিক্ত ছেদ বা জিনিসপত্র ভাঙার প্রবণতা ইত্যাদি আচরণ ঈর্ষার উদ্‌গমনের ফলে হতে পারে।

৫.৪ জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ (প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর, বাল্যকাল, কৈশোর কাল) (Deveopment of emotions at different stages (pre-school, childhood and pubertal stages)

প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর (Pre-school stage) অর্থাৎ প্রান্তীয় শৈশবকালে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ :

তিন থেকে পাঁচ/ছয় বৎসর পর্যন্ত এই কালকে প্রান্তীয় শৈশবকাল বলা হয়। বিকাশের এই পর্যায়কে অনেক মনোবিজ্ঞানী প্রাক্-শৈশবকাল (Early childhood) নামেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই স্তরের বিকাশ বিশেষভাবে কার্যকরী।

প্রক্ষোভমূলক বিকাশের ক্ষেত্রে,

(i) এই স্তরে শিশুর প্রক্ষোভগুলির আরও পৃথকীকরণ হয়। গৃহ পরিবেশের গন্ডির বাইরে তার স্নেহ-ভালবাসা বিস্তৃতি লাভ করে। প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরে সমবয়সি বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষিকাদের প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ পায়। একই সঙ্গে আশঙ্কা (Anxiety)/উদ্বেগ, লজ্জা, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি প্রক্ষোভের বিকাশ ঘটে।

(ii) এই স্তরে তার প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার দ্রুত পরিবর্তন হয়। সামান্য কারণে রেগে যায় আবার পরমুহূর্তে ভুলেও যায়। এই স্তরেই প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে সুসংবন্ধ হয়ে প্রক্ষোভের বিকাশ শুরু করে।

(iii) এই স্তরে প্রক্ষোভের স্থায়িত্ব এত কম হয় যে একটি উদ্দীপক থেকে অপর উদ্দীপকে খুব দ্রুত প্রক্ষোভ সঞ্চালিত হয়।

(iv) বাহ্যিক উদ্দীপকের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকে বেশি প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

(v) এই স্তরে শিশুদের প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা একেবারেই থাকে না। খুব স্পষ্টভাবে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করে। সামান্য কারণে সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে।

(vi) কোনো কোনো সময় বিপরীতধর্মী প্রক্ষোভের প্রকাশও পরিলক্ষিত হয়।

(vii) প্রক্ষোভমূলক বিকাশের সঙ্গে এই স্তরেই শিশুর প্রক্ষোভ অনুবর্তিত হয়। গৃহে ও বিদ্যালয়ে যথাযথ নির্দেশনা শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশে সহায়তা করবে।

(viii) এই স্তরে পৃথক পৃথক বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশুর সেন্টিমেন্ট গঠিত হয়।

(ix) যৌন জীবনের বিকাশের দিক থেকেও এই স্তরে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড (Frued)-এর মতানুসারে এই স্তরেই ছেলেদের ঈদিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus complex) ও মেয়েদের ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স (Elektra camplex) পরিলক্ষিত হয় যা তাদের যৌনশক্তির স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই ঘটে থাকে।

বাল্যকালে (childhood) প্রক্ষোভমূলক বিকাশ :

ক) প্রাথমিক বাল্যকাল (Early childhood)

সাধারণত ছয় থেকে আট বৎসর পর্যন্ত কালকে এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(i) এই স্তরে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এই সময় শিশুরা কিছুটা প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। গৃহ-পরিবেশের বাইরে বৃহত্তর পরিবেশে তাদের মধ্যে এই ধরনের ভাব লক্ষ করা যায়। এর ফলে প্রক্ষোভ প্রকাশ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন কল্পিত কারণে শিশুদের মধ্যে ভয় দেখা যায়। নানা ধরনের আশঙ্কা তাদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করে।

(ii) যৌন-চেতনা এই স্তরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এই স্তরের যৌন-চেতনাকে সুপ্তকাম অবস্থা (Latency period) বলেছেন।

(iii) এই স্তরে শিশুরা প্রক্ষোভকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। পূর্ববর্তী স্তরে রাগের বহিঃপ্রকাশ স্পষ্টভাবে ঘটত। রাগ হলে রাগের বিষয়বস্তুকে আক্রমণ করা বা জিনিসপত্র ছোড়া প্রান্তীয় শৈশব স্তরে দেখা যেতো। কিন্তু এই স্তরে নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যভাবে রাগের প্রকাশ করতে দেখা যায়।

খ) প্রান্তীয় বাল্যকাল (Late childhood)

নয় থেকে এগারো বছরের বালক-বালিকাদের এই স্তরের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণত বিদ্যালয়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। প্রক্ষোভমূলক জীবন-বিকাশ এই স্তরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(i) এই স্তরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আনন্দের প্রকাশ খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

(ii) এই স্তরে কাল্পনিক ভয়ের পরিবর্তে যথাযথ প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ের ভাব দেখা যায়।

(iii) সহোদর ভাই বা বোনের প্রতি ঈর্ষা ভাব দেখা যায়। বাবা মা'র স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(iv) বাবা মার প্রতি প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অনেক সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়।

কৈশোর কালের (Pubertal stage) প্রক্ষোভমূলক বিকাশ :

ক) প্রাথমিক কৈশোর কাল (Early adolescence)

(i) এই স্তরে ছেলেমেয়েদের আনন্দের প্রকাশ কখনও খুব তীব্র হয় আবার কখনও অতিরিক্ত বিমর্ষভাব দেখা যায়।

(ii) এই স্তরে প্রায়ই হীনমন্যতার অনুভূতি (Inferiority feeling) দেখা যায়। লজ্জাভাব, অপরাধ বোধ, ভয় এই প্রক্ষোভগুলি তার যৌন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয়।

(iii) কোনো কোনো ক্ষেত্র আক্রমণাত্মক ভাব প্রকট হয়।

(iv) বাহ্যিক উদ্দীপকের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকে বেশি প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

খ) প্রান্তীয় কৈশোর কাল (Late Adolescence)

(i) এই স্তরে আত্মসচেতনতা জাগ্রত হয়। আত্মস্বীকৃতি পাওয়ার চাহিদা তাদের মধ্যে আশঙ্কা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

(ii) স্বীকৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই নিজেকে জাহির করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

(iii) উপযুক্ত সামাজিক বিকাশ প্রাক্ষোভিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। প্রাক্ষোভিক বিকাশ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং রাগ, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি উপযুক্ত পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে শেখে।

(iv) এই স্তরে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ সমাজ নির্ধারিত পথে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এই অবদমন ও অতিরিক্ত কৌতূহল প্রাক্ষোভিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

(v) ছেলে ও মেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই এই স্তরের শারীরিক পরিবর্তন তাদের প্রাক্ষোভিক জীবনকে প্রভাবিত করে। লজ্জাবোধ, অপরাধবোধ, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি প্রক্ষোভ তাদের জীবনে ব্যাকুলতা আনে। ধীরে ধীরে প্রক্ষোভমূলক বিকাশে সামঞ্জস্য আসে।

(vi) বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রক্ষোভ প্রকাশে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার কমিয়ে মানসিক আচরণ করে।

(vii) সামাজিক বিকাশ প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে নিয়ন্ত্রণ আনে ফলে দিবাস্বপ্নের প্রবণতা দেখা যায়।

বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রাক্ষোভিক বিকাশ

প্রাথমিক শৈশব	প্রান্তীয় শৈশব	প্রাথমিক বাল্যকাল	প্রান্তীয় বাল্যকাল	প্রাথমিক কৈশোর	প্রান্তীয় কৈশোর
প্রাক্ষোভিক পৃথকীকরণ শুরু হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রাক্ষোভিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া করে।	প্রাক্ষোভিক পৃথকীকরণের জন্য প্রক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। আশঙ্কা, লজ্জা, ঘৃণা ইত্যাদি প্রক্ষোভের প্রকাশ হতে থাকে। গৃহের বাইরে প্রাক্ষোভিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে এবং সেন্টি-মেন্টের বিকাশ আরম্ভ হয়।	নানা কারণে কাল্পনিক ভয় দেখা যায়। প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে।	আনন্দময় মনো-ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। সহোদর ভাই-বোনের প্রতি ঈর্ষাভাব জাগ্রত হয়।	প্রক্ষোভ প্রকাশে সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ করা যায়। নিরাপত্তা-হীনতা, হীনমন্যতা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভ যৌন-চেতনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়।	আশঙ্কা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ধীরে ধীরে প্রাক্ষোভিক বিকাশে সামঞ্জস্য আসে।

৫.৫ প্রক্ষোভমূলক বিকাশের অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ধারা : (Development of emotions as continuous and discontinuous)

মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রাক্ষোভিক বিকাশ তারই একটি অংশ মাত্র। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন উদ্দীপকের উপস্থিতিতে প্রক্ষোভগুলি নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশিত হয়। শিশুর প্রক্ষোভের প্রকাশও নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশিত হয়। শিশুর প্রক্ষোভের প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ সমাজের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে চলবে এটাই কাম্য। প্রাক্ষোভিক বিকাশে বাধা পেলে শিশু সহপাঠীদের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে ব্যর্থ হবে। শিশুর সঙ্গতিবিধানের এই ব্যর্থতা ক্রমশ তাকে হতাশায় আচ্ছন্ন

করে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। এই ধরনের শিশু সামাজিক জীবনেও নিজের অবস্থান নির্ণয় করতে পারে না। প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতাই একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাক্ষোভিক পরিণমন এক্ষেত্রে খানিকটা সহায়তা করে। বয়স অনুযায়ী ভালোবাসা, স্নেহ, আনন্দ, রাগ, ভয়, ঘৃণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইত্যাদির বিকাশ সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মতো ঘটতে থাকে। ব্যক্তির বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন কি বিচ্ছিন্ন এ ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানীদের মতপার্থক্য রয়েছে। যেসব মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন, তাদের মতে বিকাশ হল সমগ্র জীবনব্যাপী ক্রম-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঘটে। যে সব মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন বিকাশ একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তারা মনে করেন বিকাশ ঘটে কতকগুলি নির্দিষ্ট ও পৃথক স্তরের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন ধরনের নির্দিষ্ট আচরণ দেখা যায়। প্রতিটি স্তরের আচরণগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। বিকাশের এই বিচ্ছিন্ন ধারার তত্ত্বের সমর্থকগণ হলেন Jean Piaget, Erik Erikson, Freud, Kohlberg প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

৫.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রক্ষোভ মনোবিদ্যার এক জটিল বিষয় বস্তু। প্রক্ষোভ বলতে আমরা মনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমান অবস্থাকে বুঝি যা ব্যক্তিকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে। সামাজিক জীবনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যক্তির প্রক্ষোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই প্রক্ষোভের সুষ্ঠু বিকাশ না হলে জীবন-বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রক্ষোভের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ জীবনে নানা ধরনের সমস্যামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলিকে সমাজ-সম্মতভাবে প্রকাশের ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। জীবন বিকাশের ধারার ন্যায় প্রাক্ষোভিক বিকাশ— অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ধারায় ঘটে।

৫.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন:

১. প্রক্ষোভের উদাহরণ হল—
(ক) ঘুম (খ) হাঁটা (গ) রাগ (ঘ) খাওয়া

২. ইদিপাস কমপ্লেক্স দেখা যায়—
(ক) শৈশবে (খ) কৈশোরে (গ) বাল্যকালে (ঘ) মহিলাদের

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রক্ষোভ কাকে বলে?

২. প্রক্ষোভের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩. প্রাক্ষোভিক পরিণমন বলতে কী বোঝেন?

C. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. প্রক্ষোভমূলক বিকাশ কাকে বলে?

২. প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা কী?

৩. প্রাথমিক বাল্যকালে ও প্রান্তীয় বাল্যকালে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ-এর আলোচনা করুন।

D. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. প্রাক্ষোভিক বিকাশ বলতে কী বোঝায়? প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ দক্ষতার বিকাশ প্রয়োজন কেন? দুটি উদাহরণ দিন।

২. জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ৬

শিখন
(Learning)

৬.১ সূচনা (Introduction)
৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)
৬.৩ শিখনের ধারণা (Concept of Learning)
৬.৪ শিখন : আচরণবাদের ধারণাসমূহ (Learning : Ideas of Behaviourism)
৬.৫ মনের মূল কাঠামো (কার্যকরী স্মৃতি, দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি, মনোযোগ, সংকেতায়ন এবং পুনরুদ্রেক) (Basic architecture of the mind (working memory, longterm memory, attetion, encoding and retrival)
৬.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)
৬.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

৬.১ সূচনা (Introduction)

শিশুর জন্মলগ্ন থেকে তার আচরণ ধারা পরিবর্তিত হয় দৈনন্দিন পরিবেশের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। এই পরিবর্তিত আচরণধারা সৃষ্টি হয় মানসিক ক্রিয়া যেমন স্মৃতি, শিখন প্রক্রিয়া, মনোযোগ এবং পুনরুদ্রেকের মাধ্যমে। শিশু এই শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার আচরণের উন্নতিকরণ করে থাকে।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। শিখনের অর্থ, নীতিসমূহ এবং উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা

২। শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা

৩। আচরণবাদের ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন

৪। মনের মূল কাঠামোগত গঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ

৬.৩ শিখনের ধারণা (Concept of Learning)

শিখন সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে তাদের চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বর্তমানে শিখন সম্পর্কিত বহু তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটেছে। শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া যা শিক্ষা মনোবিদ্যার সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত সমগ্র শিখন সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হল।

৬.৩.১ শিখনের সংজ্ঞা (Definition of Learning)

পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বা মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আচরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শিখন বলা হয়। অর্থাৎ এই বিশ্বজোড়া পাঠশালা থেকে আমরা যা কিছু শিখি, সেই শেখার প্রক্রিয়াকেই শিখন বলা হয়। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ, সব কিছু বাধ্য করছে নতুন আচরণ করতে। এই ধরনের আচরণের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শিখন বলা হয়। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেগুলো হল নিম্নরূপ—

গিলফোর্ড (J.P. Guildford) :

শিখন এক ধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা আচরণের দ্বারাই সংঘটিত হয় (Learning is Change in Behaviour Resulting from Behaviour)।

ম্যাক্‌গিয়ক্ এবং আইরায়ন (Mc Gaugh & Irion)

কার্যাবলির অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার শর্তের মাধ্যমে পারদর্শিতার পরিবর্তন হল শিখন (Learning as change in performance through conditions of activity, practice and experience)।

ভাইগটস্কি (Vygotsky):

Vygotsky-র মতে, শিখন হল জ্ঞান নির্মাণের সামাজিক প্রক্রিয়া।

পিঁয়াজে (Piaget)

শিখন হল জ্ঞান নির্মাণের প্রক্রিয়া।

বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে শিখনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।—

আচরণবাদীদের মতে	জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানীদের মতে	নির্মাণবাদীদের মতে	সমাজনির্মাণবাদীদের মতে
শিখন হল অভিজ্ঞতার ফলে আচরণের পরিবর্তন।	শিখন হল জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা ইত্যাদি অর্জন	শিখন হল জ্ঞান নির্মাণের প্রক্রিয়া	শিখন হল জ্ঞান নির্মাণের সামাজিক প্রক্রিয়া।

৬.৩.২ শিখনের নীতিসমূহ (Principles of Learning)

মনোবিদ থর্নডাইক, স্কিনার, কোহলার প্রমুখেরা শিখনের একাধিক নীতির কথা বলেছেন, যেমন—

(ক) প্রস্তুতির নীতি (Principle of Readiness)

শিক্ষার্থীর দেহ, মন, প্রাক্ষোভিক দিক এবং আগ্রহ সঞ্চারের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে তোলা, যাতে শিক্ষার্থী শারীরিক এবং বৌদ্ধিক দিক থেকে সক্ষম হয়।

(খ) অনুশীলনের নীতি (Principle of Exercise)

অনুশীলন ব্যক্তিকে দক্ষ করে তোলে (Practice makes a man perfect)। কোনো বিষয় বারবার অনুশীলন করলে অর্থযুক্ত শিখন হয়ে থাকে।

(গ) ফলভোগের নীতি (Principle of Effect)

ফলভোগের নীতি প্রেষণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। ফলভোগের নীতি হ'ল— শিখন যত শক্তিশালী হবে শিখনের ফল তত শিক্ষার্থীর নিকট আনন্দের হবে। শিখন দুর্বল হলে শিক্ষার্থীর কাছে তা বিরক্তিকর হয়।

(ঘ) প্রাথমিকতার নীতি (Principle of Primaricy)

প্রথমে যে বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন হয় বা শিখন হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(ঙ) সাম্প্রতিকতার নীতি (Principle of Recency)

সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ, অর্থাৎ যেটি সম্প্রতি শেখা হয়েছে সেটি বেশি মনে থাকে, পরীক্ষার কাছাকাছি সময়ে যে বিষয়টি পড়া হয়, পরীক্ষায় তা বেশি মনে থাকে।

(চ) তীব্রতার নীতি (Principle of Intensity)

তীব্রতার নীতি হল বিষয়টিতে যদি মনোনিবেশ সহকারে, গভীর এবং স্পষ্টভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে বিষয়টি সম্বন্ধে দীর্ঘস্থায়ী শিখন সম্ভব হয়। শ্রবণের সাথে সাথে যদি দর্শনের মাত্রা পায় বিষয়টিতে তাহলে বিষয়টির তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে এবং স্মৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি থেকে যাবে।

(ছ) স্বাধীনতার নীতি (Principle of Freedom)

বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা যত বেশি স্বাধীনভাবে শেখার সুযোগ পাবে তারা তত বেশি দ্রুত এবং সঠিকভাবে শিখতে পারবে। শিখন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া তাই শিখনে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে শিক্ষার্থীরাও আগ্রহী হয়ে উঠবে।

(জ) প্রয়োজনীয়তার নীতি (Principle of Requirement)

কোনো কিছু শিখতে গেলে অবশ্যই শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, দক্ষতা অর্থাৎ শিখতে গেলে যা যা উপাদান এবং উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন তা যথাযথভাবে থাকা উচিত। তবেই শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়টিতে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

৬.৩.৩ শিখনের উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Learning)

শিখনের উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন :

শিখন শিক্ষার্থীদের আচরণের জ্ঞানমূলক, অনুভূতিমূলক এবং কর্মমূলক দিকের বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে।

(খ) শিক্ষণ-শিখন উদ্দেশ্যগুলি রূপায়িতকরণ :

শিখনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, প্রয়োগ, মনোভাব এবং আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করা।

(গ) উপযুক্ত বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটানো :

শিক্ষার্থীর মানসিক (বৌদ্ধিক), শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ভাষা অর্থাৎ সার্বিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটানোই হল শিখনের উদ্দেশ্য।

(ঘ) ব্যক্তিত্বের বিকাশ :

শিখনের উদ্দেশ্য হল শিশুর সার্বিক ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করা।

(ঙ) সার্থক অভিযোজন :

শিখন ব্যক্তিকে সমস্ত বিষয়ের সার্থকভাবে সমন্বয় ঘটাতে বা অভিযোজন ঘটাতে সক্ষম হবে।

(চ) জীবনের লক্ষ্য অর্জন :

প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব জীবন দর্শন আছে। ব্যক্তি সর্বদা চেষ্টা করে সেই জীবন দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিতে। তাই শিখন সর্বদা ব্যক্তিকে তার নিজস্ব লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথকে সুগম করে তোলে।

৬.৩.৪ শিখনের তত্ত্বসমূহ (Basic Theories of Learning)

বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। মোটামুটিভাবে তত্ত্বগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

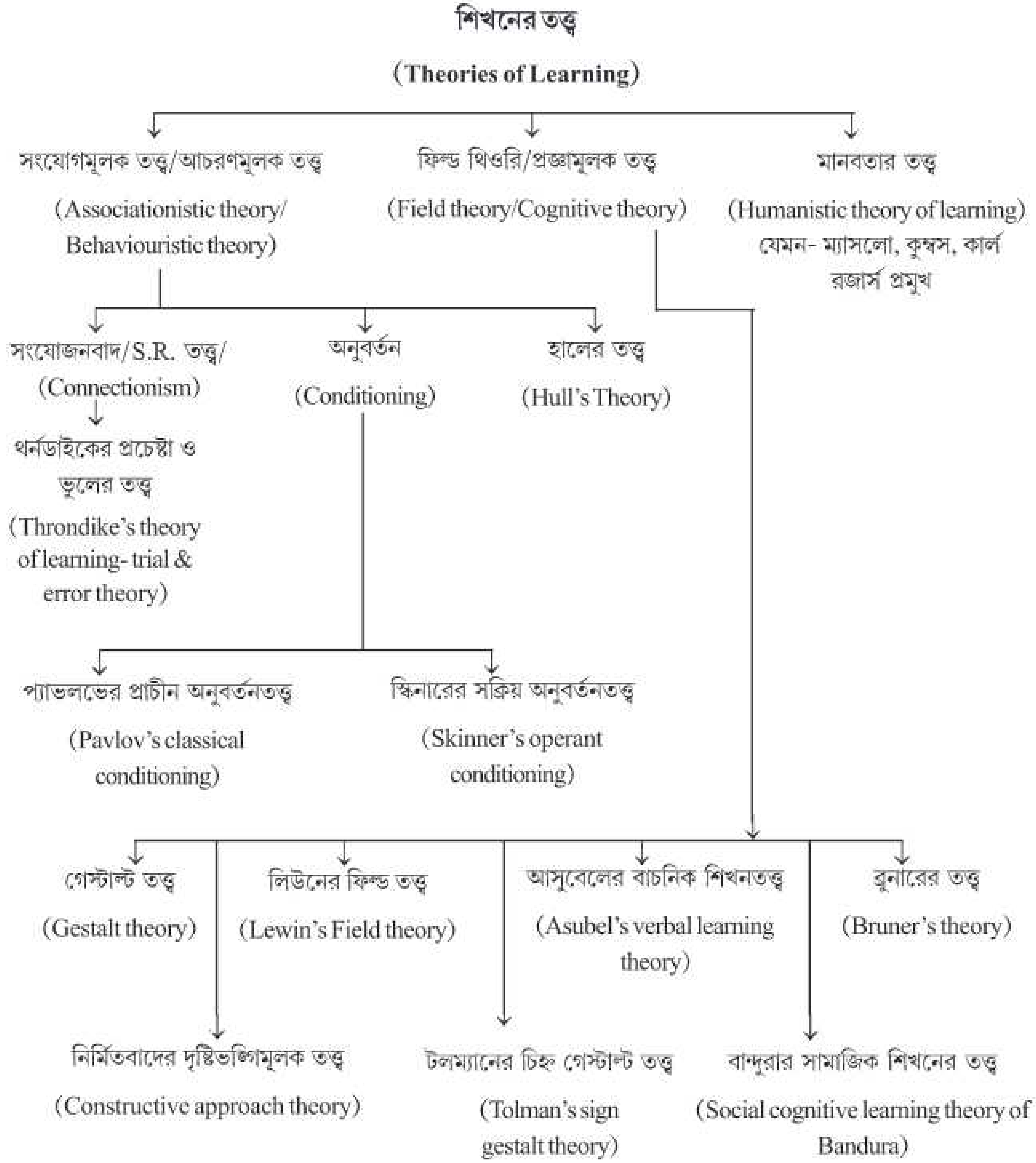

৬.৩.৫ শিখনে আচরণবাদী ও জ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য (Diference between behaviourist and cognitive perspective of learning)

	আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি	জ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি
ক	আচরণবাদী ধারণা অনুযায়ী শিখন আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া	জ্ঞানমূলক ধারণা অনুযায়ী শিখন ব্যক্তি নির্ভর আন্তরিক প্রক্রিয়া
খ	আচরণবাদীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইতর প্রাণীর উপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে, তার ফলাফলের দ্বারা মানুষের শিখনের ব্যাখ্যা করেন।	জ্ঞানবাদীরা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের শিখনের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
গ	আচরণবাদীরা কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন অনুশীলন করেন।	জ্ঞানবাদীরা শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া অনুশীলন করে শিখন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
ঘ	আচরণবাদী শক্তিদায়ক সত্ত্বার (Re-inforcement) প্রয়োগে আচরণের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন।	জ্ঞানবাদীরা শক্তিদায়ক সত্ত্বার (Re-inforcement) দ্বারা বোধগম্যতা বৃদ্ধি করেন শিক্ষার্থীদের।
ঙ	আচরণবাদীরা বিশ্বাস করেন, শিখনের সময়, শিক্ষার্থীর মানসিক সক্রিয়তা থাকে না। পরিবেশ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।	জ্ঞানবাদীরা মনে করেন, শিখনের সময় শিক্ষার্থীরা মানসিক দিক থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারাই উদ্দীপক নির্বাচন করে এবং বর্জন করে।
চ	আচরণবাদীরা শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনো গুরুত্ব দেন না। তারা শিখন বলতে একটি নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকে বোঝান।	জ্ঞানবাদীরা বিশ্বাস করেন, শিখনে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিখনে, তার আচরণের পুনর্গঠন হয়।

৬.৪ শিখন : আচরণবাদের ধারণাসমূহ (Learning : Ideas of Behaviourism)

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ দার্শনিকরা স্মৃতি (Memory), প্রত্যক্ষণ (Perception) ইত্যাদি প্রায় সমস্ত রকম মানসিক প্রক্রিয়াকে সংযোগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। মনোবিদ্ হবস্ (Hobbes), লক্ (Locke), হিউম (Hume), হার্টলে (Heartely)-র নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মনোবিদ্‌গণ শিখনকে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাই আধুনিক এই সংযোগবাদকে অনেকে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগমূলক তত্ত্ব বা আচরণমূলক তত্ত্ব হিসাবে নামকরণ করেছেন।

সংযোজনবাদী বা আচরণবাদীদের মতে, শিখন প্রক্রিয়া হল বিচারবুদ্ধি বিবর্জিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বন্ধনের (S–R Bond) ফলেই শিখন ঘটে।

আচরণমূলক তত্ত্বগুলির মধ্যে থর্নডাইকের সংযোগমূলক তত্ত্বটি অন্যতম।

৬.৪.১ থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Theory of Connectionism)

আমেরিকার মনোবিদ্ থর্নডাইক (E.L. Thorndike) 1899 খ্রিস্টাব্দে "Animal Intelligence" নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যা পরবর্তীকালে শিখন সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বিভিন্ন প্রাণীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ করে শিখনের সরলতম কৌশল আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেন শিখনের সরলতম কৌশল হল একটি উদ্দীপকের (Stimulus, S) সাথে একটি প্রতিক্রিয়ার (Response, R) সংযোজন। তাঁর মতে শিখন হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথার্থভাবে সম্পর্ক স্থাপন।

থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সম্পর্কিত পরীক্ষা (Trial & Error theory of Learning)

থর্নডাইকের মতে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ স্থাপনই হল শিখন। তিনি বিভিন্ন ধরনের ইতর প্রাণীর ওপর প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখনের পরীক্ষা করেন। তবে থর্নডাইকের বিড়ালের উপর পরীক্ষাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর পরীক্ষায় যে যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করেন, তাকে বলা হয় পাজ্‌ল বক্স (Puzzle box), এই সব বাক্স এমনভাবে তৈরি যে, তা থেকে কোনটায় বোতাম টিপলে, কোনটায় দড়ি টানলে বাক্সের দরজাটি খুলে যায়।

পরীক্ষা : থর্নডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে পাজ্‌ল বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং বাইরে কিছু খাবার রাখলেন। এটাই হল তাঁর পরীক্ষামূলক পরিস্থিতি (Experimental Set up)। এই অবস্থায় বিড়ালের প্রতিক্রিয়ার ওপর নজর রাখা হয়। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি প্রথমে খাচাঁ বা বাক্স থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্দেশ্যহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে খাঁচার মধ্যেছোটাছুটি করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিফল চেষ্টার পর হঠাৎ তার পা নির্দিষ্ট স্থানে পড়ামাত্র দরজা খুলে যায় এবং বাইরে এসে খাবার খায়। দ্বিতীয় দিনে থর্নডাইক একই পরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ করেন যে আগের দিনের মতোই বিড়ালটি লক্ষ্যহীনভাবে ছোটাছুটি করছে। তবে এবার প্রথম দিনের তুলনায় কম চেষ্টা ও কম সময়ে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরোতে সম্ভব হয়।

পর্যবেক্ষণ : এইভাবে পরপর বেশ কিছুদিন একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালিয়ে থর্নডাইক লক্ষ করেন যে, যতদিন যাচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে, (যেখানে চাপ পড়লে ছিটকিনি খুলে যায়) বিড়ালের প্রচেষ্টার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভুল প্রচেষ্টাগুলি ক্রমশ বাতিল হচ্ছে এবং সঠিক প্রচেষ্টা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে এমন একদিন এল যখন বিড়ালটিকে খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে সে নির্দিষ্ট স্থানে চাপ দিয়ে ছিটকিনি এবং দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল এবং খাবার খেল।

সিদ্ধান্ত : এই পরীক্ষা থেকে থর্নডাইক সিদ্ধান্তে আসেন যে, বিড়াল প্রচেষ্টা ও ভুলের সাহায্যে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছে এবং তার শিখন সম্পূর্ণ হয়েছে।

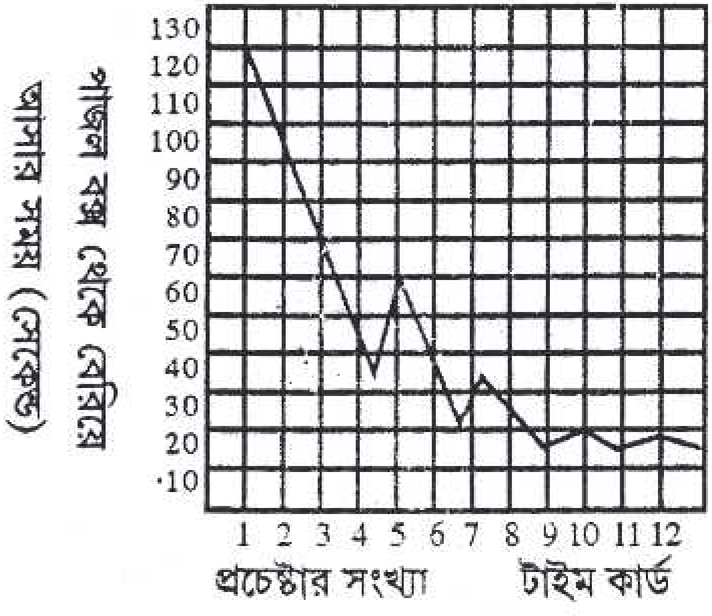

এই অবস্থায় থর্নডাইক বিড়ালের আচরণের সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেন—

- → শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও চাহিদার ওপর নির্ভরশীল
- → লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা
- → যান্ত্রিকতা
- → পুনরাবৃত্তি
- → ক্রমহ্রাস
- → বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি
- → ফলের উপর নির্ভরশীলতা
- → প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা
- → জানা থেকে অজানার দিকে এগোনো
- → আংশিক প্রতিক্রিয়া
- → সর্বজনীনতা

- **থর্নডাইকের শিখনের নীতি বা সূত্র (Laws of Learning)**

থর্নডাইক তাঁর পরীক্ষা থেকে কতকগুলি সূচকের অবতারণা করেছেন। এইগুলিকে শিখনের সূত্র বলা হয়। থর্নডাইক মোট আটটি সূত্রের কথা বলেছেন। তার মধ্যে মুখ্য সূত্র তিনটি এবং গৌণ সূত্র হল পাঁচটি।

মুখ্য সূত্র :

(ক) **ফল লাভের সূত্র (Law of Effect) :** থর্নডাইকের পরীক্ষায়, বিড়াল খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবারেই খাদ্য পায়, তাই প্রত্যেকবার যতদূর সম্ভব সহজ পথে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। যদি খাদ্য পাওয়ার তৃপ্তি না থাকত, তাহলে সে সঠিক প্রতিক্রিয়ার পরিবতনীয় সংযোগের মাধ্যমে যদি সুখকর বা তৃপ্তিদায়ক ফল পাওয়া যায়, তবে ওই সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হবে। আর যদি সংযোগের ফলে বিরক্তিকর ফল পাওয়া যায়, তাহলে সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হবে। তাই এই সূত্রে ‘‘পরবর্তনীয় সংযোগ’’ (Modifiable connection) কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, ‘‘পরিবর্তনীয় সংযোগ দ্বারা সংস্কার করা যায়। তাঁর মতে প্রান্তিক অবস্থা, কোনো প্রচেষ্টা বা প্রতিক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হবে, তা নিধার্রণ করে দেয়।

(খ) **অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise) :** উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে তাকে দৃঢ়তর না করতে পারলে, পরে তা কার্যকরী হবে না। তাই কীভাবে তা দৃঢ় হয়, সে কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থর্নডাইক তাঁর দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করেছেন। একে বলা হয় অনুশীলনের সূত্র। অনুশীলনের সূত্রকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) **ব্যবহারের সূত্র (Law of Use) :** উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় বন্ধন স্থাপনের পরে যদি তাকে বারবার চর্চা করা হয়, তা হল সেই সংযোগের শক্তি বাড়বে। তবে অন্যান্য সবকিছু অপরিবর্তিত থাকলে বন্ধনটি শক্তিশালী হবে। “When modifiable connection is made between a situation and a response during a length of time, that connection's strength is other things being equal, increased.”

(২) **অব্যবহারের সূত্র (Law of Disuse) :** যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংশোধনযোগ্য বন্ধন দীর্ঘ সময়ব্যাপী তৈরি করা না হয় বা বারবার চর্চা করা না হয় সেক্ষেত্রে বন্ধনের শক্তি হ্রাস পায়। “When modifiable connection is not made between a situation and a response during a length of time, that connections strength is decreased.”

অনুশীলনের সূত্রটি ফললাভের সূত্রকে অনুসরণ করে। সাফল্যের প্রতিক্রিয়াটি বারবার করার ফলে সেটি ক্রমশ শক্তিশালী হয় এবং ব্যর্থ প্রতিক্রিয়াগুলি অনুশীলন না হওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়াগুলির শক্তি হ্রাস পায়।

(গ) **প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness) :** থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্নায়ুতন্তুর (Nerve) মাধ্যমে হয়। যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে প্রস্তুত থাকে তা বহন করতে দিলে, ব্যক্তির তৃপ্তি আসবে। আবার যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে প্রস্তুত নয়, তা জোর করে বহন করতে দিলে বিরক্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তাই থর্নডাইক তাঁর প্রস্তুতির সূচক উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক, মানসিক বা স্নায়বিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

গৌণ সূত্র (Minor Laws) :

মুখ্য সূত্র ছাড়াও পাঁচটি গৌণ সূত্রের কথা থর্নডাইক বলেছেন। সেগুলো হল—

(ক) **একই উদ্দীপকের প্রতি বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple response to the same stimulus)**

(খ) **মানসিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Mental set attitude etc.)**

(গ) **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity)**

(ঘ) **উপমানের সূত্র (Law of Assimilation)**

(ঙ) **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative shifting)**

- **একই উদ্দীপকের প্রতি বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of multiple response to the same stimulus)**

থর্নডাইক একই উদ্দীপকের সম্ভাব্য সমস্ত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে একটিমাত্র প্রতিক্রিয়াকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতার কথা বলেছেন। এই ক্ষমতা শিক্ষার্থীকে জটিল পরিস্থিতিতে শিখতে সাহায্য করে।

- **মানসিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Attitude, Set or Disposition)**

এই সূত্র অনুযায়ী শিক্ষার্থীর ইতিবাচক বা নেতিবাচক মানসিক অবস্থা শিখন পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: শিক্ষার্থীদ্দ শিখনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব থাকলে, সে বারবার প্রতিক্রিয়া নাও করতে পারে।

- **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity)**

এই সূত্র অনুযায়ী অভীষ্ট প্রতিক্রিয়ার জন্য কোনো কোনো সময় সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিক্রিয়ার অংশ বিশেষই যথেষ্ট।

- **উপমানের সূত্র (Law of assimilation)**

এই সূত্র অনুযায়ী পূর্বপরিচিত শিখন পরিস্থিতি এবং বর্তমান শিখন পরিস্থিতির সাদৃশ্য প্রতিক্রিয়াকে সহজ করে দিতে পারে। অর্থাৎ উভয় পরিস্থিতির আত্তীকরণ হলেই এটা সম্ভব।

- **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifting)**

এই সূত্র অনুযায়ী দুটি উদ্দীপকের মধ্যে অনুষঙ্গ থাকলে, একটির প্রতিক্রিয়া অপরটিতে সঞ্চালিত হতে পারে। এই সূত্রের সঙ্গে প্যাভলভের অনুবর্তন প্রতিক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখা যায়।

শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হল শিক্ষালয়ে বিভিন্ন পাঠ্যবস্তুর মাধ্যমে ছাত্রদের এমন কতকগুলি অভ্যাস ও মানসিক সংগঠন তৈরি করা যা তারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এরফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে থর্নডাইকের শিখন তত্ত্বের গুরুত্ব (Educational Importance of Thorndike's theory of Learning)

থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছে। এই তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) শিক্ষকের দায়িত্ব বৃদ্ধি :

প্রচেষ্টা ও ভুলের মতবাদই প্রথম মন্তব্য করে যে, শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতার জন্য দায়ী শিক্ষকের দক্ষতার অভাব। এর ফলে শিক্ষকের দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

(২) শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব প্রদান :

শিখনের সাফল্য নির্ভর করে পাঠ্য বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, এবং প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতির ওপর। বিষয়বস্তু নির্বাচনের আগে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির দিকে নজর দিতে হবে।

(৩) পাঠ্যবিষয়কে আনন্দদায়ক করে তোলা :

শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবিষয়কে এমনভাবে উপস্থিত করতে হবে, যাতে সে বিরক্তি প্রকাশ না করে এবং নিজের থেকেই শেখার তাগিদ অনুভব করে। শিক্ষা বাস্তবমুখী হলেই সেটি সম্ভব হয়।

(৪) শিক্ষকের আংশিক সহযোগিতা :

কোনো সমস্যা সমাধানে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য না করে আংশিকভাবে সাহায্য করবেন, যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার হয় ও সমস্যা সমাধানে সে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

(৫) বারংবার অনুশীলন :

পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে বারেবারে অনুশীলনের সুযোগ পায়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে।

(৬) শিক্ষার্থীর শাস্তি প্রাপ্য নয় :

প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব অনুযায়ী নতুন শিখনে শিক্ষার্থীর ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই এক্ষত্রে শিক্ষার্থীর কোনো শাস্তি পাওয়া উচিত নয়।

(৭) পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্যার উপস্থাপনা :

এ ধরনের শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামনে এমনভাবে সমস্যা উপস্থিত করতে হবে, যাতে সে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান সমস্যার সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

মন্তব্য :

বিশেষ করে থর্নডাইকের এই তত্ত্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়সমূহ শিখনের ক্ষেত্রে তাঁর ফললাভের ও অনুশীলনের সূত্র বিশেষভাবে কার্যকরী। শিখনের মূল কথা হল আচরণের পরিবর্তন আর এই পরিবর্তন আনতে হলে অনুশীলন ও ফল লাভ দুটিই প্রয়োজন।

৬.৪.২ অনুবর্তন (Conditioning)

অনুবর্তন ক্রিয়া হল— যদি কোনো নিরপেক্ষ উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বারবার উপস্থাপিত করা হয় তবে একসময় দেখা যাবে ওই স্বাভাবিক উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ওই নিরপেক্ষ উদ্দীপকটির সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বলা যায়, নিরপেক্ষ উদ্দীপকটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর শক্তি লাভ করেছে এবং সেই সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকটিকে উপস্থাপন করা মাত্রই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনাকেই অনুবর্তন ক্রিয়া (Conditioned Response) বলে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক প্যাভলভের পর থেকে অনুবর্তনের উপরে নানারকম পরীক্ষা আজও চলছে। প্যাভলভের পরবর্তীকালে, হাল (Hull), স্কিনার (Skinner) প্রভৃতি এই নীতির অনেক পরিবর্তন করে শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাই অনুবর্তনকে হিলগার্ড (Hillgard) এবং মার্কুইস (Marquis) দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্যাভলভের পদ্ধতিকে তারা বলেছেন অনুবর্তনের প্রাচীন পদ্ধতি (Classical conditioning) এবং তার পরবর্তী পদ্ধতিগুলিকে বলেছেন সক্রিয় অনুবর্তন (Operant Conditioning)।

- **প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব (Theory of Classical Conditioning)**

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে রাশিয়ান শারীরবিজ্ঞানী আইভান প্যাভলভ (Ivan pavlov) অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রথম করেন। ঠিক এই সময় মনোবিদ্যায় যে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছিল, তাকে বলা হয় আচরণবাদ (Behaviourism), প্যাভলভের অনুবর্তিত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ তিনি নিজে ছিলেন শারীরবিজ্ঞানী (Physiologist)। তাই, তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করার ক্ষমতা আছে। কোনো উদ্দীপক (Stimulus) ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে তার একটি প্রতিক্রিয়া (Response) হয়। সব প্রাণীর ক্ষেত্রে এক একটি উদ্দীপকের জন্য এক একটি স্বভাবত প্রতিক্রিয়া (Natural Response) নির্দিষ্ট আছে। আবার প্রত্যেক উদ্দীপকের একটি করে নির্দিষ্ট 'আচরণ মূল্য' (Behaviour Value) আছে। কতকগুলি স্বভাবজ আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে। এইগুলিকেই বলা হয় সহজাত আচরণ (Innate Behaviour)।

প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের পরীক্ষা :

প্যাভলভের অনুবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে কুকুরের লালাক্ষরণ সম্পর্কিত পরীক্ষাটি উল্লেখযোগ্য। একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে কিছু খাবার দেওয়া হলে দেখা যায় কুকুরের মুখ থেকে লালাক্ষরণ হচ্ছে। লালাক্ষরণ হল উদ্দীপক খাদ্যবস্তুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। প্যাভলভ লালক্ষরণের পরিমাপের ব্যবস্থাও করেছিলেন। এরূপর প্রতিদিন তিনি খাবার দেওয়ার আগে ঘণ্টা বাজানোর ব্যবস্থা করেন এবং ঘণ্টার শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই খাবার দেওয়া হয়। কিছুদিন এটি করার পর তিনি লক্ষ্য করেন খাবার দেওয়ার আগেই ঘণ্টাধ্বনি শোনাতেই কুকুরটির লালাক্ষরণ শুরু হচ্ছে। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে লালাক্ষরণের স্বাভাবিক কোনো সম্পর্ক নেই। ঘণ্টাধ্বনির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলো সজাগভাব। পুনরাবৃত্তি করার ফলে একটি উদ্দীপকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এ অবস্থায় কুকুর খাদ্য ছাড়াই শুধুমাত্র ঘণ্টাধ্বনিতে লালাক্ষরণের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। একেই প্যাভলভ বললেন অনুবর্তিত আবর্তক্রিয়া (Conditioned reflex)। এই শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক অর্থে আবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) বলা যায় না। তাই বর্তমানে মনোবিজ্ঞান একে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া বলে থাকেন বা সংক্ষেপে CR-ও বলে থাকেন। যেমন এখানে ঘণ্টা ধ্বনির শব্দে লালাক্ষরণ হল অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response; CR)। যে উদ্দীপকের (Stimulus) সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে যুক্ত ছিল, তাকে বলা হয় অনাবর্তিত উদ্দীপক (Unconditioned Stimulus;) বা সংক্ষেপে US. যেমন, এখানে খাদ্যবস্তু অনাবর্তিত উদ্দীপক। যে কৃত্রিম উদ্দীপক দ্বারা বর্তমান অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, তাকে বলা হয় অনুবর্তিত উদ্দীপক (Conditioned Stimulus; CS)। আর এই উদ্দীপকের সাথে যুক্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় অনাবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Unconditioned Response) বা UR। এখানে ঘণ্টাধ্বনি হল অনুবর্তিত উদ্দীপক (CS) এবং সজাগভাব প্রতিক্রিয়া (Alertness) হল অনাবর্তিত প্রতিক্রিয়া (UR)। যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে, তাকেই বলা হয় অনুবর্তিত প্রক্রিয়া বা অনুবর্তন (Conditioned responses mechanism or conditioning)।

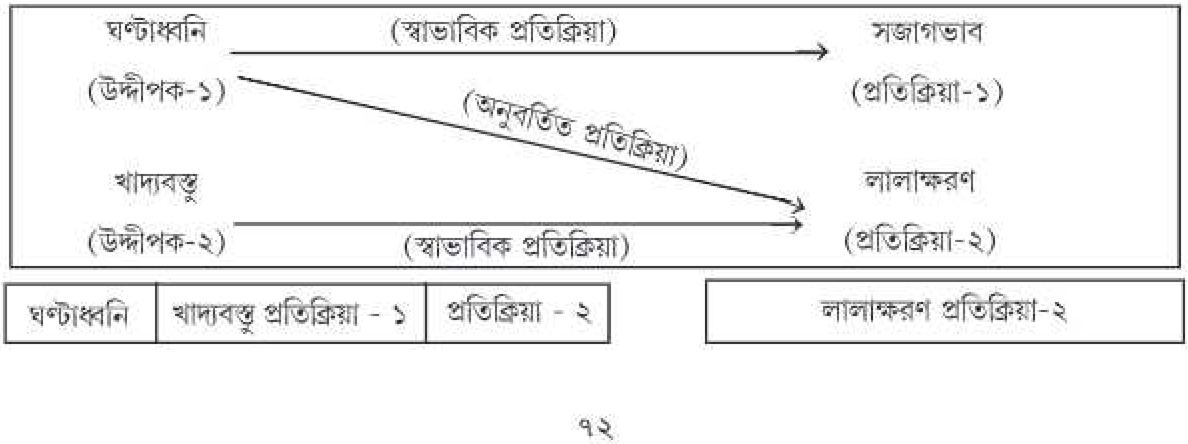

প্রাচীন অনুবর্তনের শর্ত বা বৈশিষ্ট্য (Characteristics or Conditions of Classical Conditioning)

(১) যে উদ্দীপকের অনুবর্তন করতে হবে (Conditioned Stimulus), সেটি অপর স্বাভাবিক উদ্দীপকের (Unconditioned Stimulus) পূর্বে উপস্থাপন প্রয়োজন অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনিকে (Sound of the bell) যদি আমরা অনুবর্তন করতে চাই তাহলে খাদ্য দেওয়ার আগেই ঘণ্টাধ্বনি করতে হবে।

(২) অনুবর্তিত উদ্দীপকের (Conditioned Stimulus) অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অপর অনাবর্তিত উদ্দীপককে (Unconditioned Stimulus) উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনি থাকতে থাকতেই খাদ্য উপস্থাপন করতে হবে। তা না হলে অনুবর্তন সম্ভব হবে না। প্যাভলভ তাঁর পরীক্ষায় ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ করার পূর্বেই প্রতিদিন খাদ্য উপস্থাপন করতেন।

(৩) অপর অনাবর্তিত উদ্দীপকটি (Unconditioned Stimulus) অনুবর্তিত উদ্দীপকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে অনুবর্তন সম্ভব হবে না। ক্ষুধার্ত কুকুরের কাছে ঘণ্টাধ্বনির চেয়ে খাদ্যবস্তু অনেক বেশি শক্তিশালী উদ্দীপক তাই ঘণ্টাধ্বনি অনুবর্তিত হয়েছিল।

(৪) যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুবর্তন ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় উদ্দীপক একই ক্রমে বারবার উপস্থাপন করতে হবে। পুনরাবৃত্তি অনুবর্তনের একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের উপযোগিতা (Educational Implication of Classical Conditioning)

ইতর প্রাণী থেকে শুরু করে মানবশিশুর শিখনে প্যাভলভীয় প্রাচীন অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপযোগিতা লক্ষ করা যায়। এর শিক্ষাগত তাৎপর্যগুলি হল —

(১) **শিশুর ভাষাগত বিকাশ :** শিশুকে ভাষা শেখানোর সময় কোনো একটি বিশেষ পরিচিত বস্তু বা ব্যক্তির সাথে বিশেষ একটি শব্দকে যোগ করে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন বিশেষ মহিলাকে দেখিয়ে 'ঠাকুরমা' শব্দটি বারবার উচ্চারণ করতে থাকলে শিশু 'ঠাকুরমা' শব্দটি শেখে। এই পদ্ধতিতে শিশু বহু শব্দ ও ভাষা আয়ত্ত করে।

(২) **শিশুর শিখন-দক্ষতা :** এই কৌশলের দ্বারা শিশু শিখন-দক্ষতা অর্জন করে। লেখা, পড়া, বানান শুদ্ধ করা, নামতা মুখস্থ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুবর্তনের প্রভাব দেখা যায়।

(৩) **শিশুর অভ্যাস গঠন :** শিশুর অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠা। নিয়মিত দাঁত মাজা, ঠিক সময়ে পড়তে বসা ইত্যাদি।

(৪) **কু-অভ্যাস দূর করা :** বানান ভুল, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি কু-অভ্যাস দূর করতে অনুবর্তন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

(৫) **শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ :** প্রাক্ষোভিক বিকাশে অনুবর্তনের বিশেষ, ভূমিকা দেখা যায়। মানুষের জীবনে জটিল প্রক্ষোভ অনুবর্তনের ফল। প্রক্ষোভ-উদ্দীপকের ব্যাপকতা অনুবর্তনের কারণেই ঘটে।

(৬) **শিশুর আগ্রহ বা অনাগ্রহ সৃষ্টি :** শ্রেণি শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর অনাগ্রহ বা আগ্রহ অনুবর্তন প্রক্রিয়ারই ফল। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি ভালোবাসা, তিনি যা পড়ান সেই বিষয়ে অনুবর্তিত হয়।

(৭) **শিক্ষকের আচরণ শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুবর্তন :** শিক্ষক-শিক্ষিকার আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, অভ্যাস প্রভৃতি শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুবর্তিত হয়। সেইজন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের আচরণ হবে মার্জিত, পোশাক হবে রুচিসম্মত এবং অভ্যাস হবে অনুকরণযোগ্য।

মন্তব্য :

প্যাভলভের পরীক্ষা থেকে সংযোগাত্মক অনুবর্তন (Positive Conditioning) এবং বিয়োগাত্মক অনুবর্তন (Negative conditioning) দেখা যায়। সংযোগাত্মক অনুবর্তন (Positive conditioning) হল, যে পদ্ধতিতে কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া এবং উদ্দীপকের মধ্যে যে কৃত্রিম সংযোগ স্থাপন হয়। আবার অনুবর্তনের দ্বারা বিপরীত ফলও লাভ করা যায়। বারবার পুনরাবৃত্তির ফলে বিরূপ ফল লাভ করলে প্রাণী উদ্দীপক উপেক্ষা করতে শেখে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় বিয়োগাত্মক অনুবর্তন

(Negative Conditioning)। সংযোগাত্মক বা বিয়োগাত্মক দু'ধরনের অনুবর্তনই চিরস্থায়ী হয় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ কুকুরকে যদি বারবার ঘণ্টাধ্বনি করার পর খাবার দেওয়া না হয়, তা হলে তার আর ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে লালাক্ষরণ হয় না। এইভাবে অনুবর্তনের বিলোপ ঘটে। এই ধরনের অনুবর্তনের লোপ পাওয়াকে অপানুবর্তন, (De-conditioning) বলা হয়। আবার মাঝে মাঝে অনুবর্তিত প্রক্রিয়াকে সজীব রাখার প্রক্রিয়াকে প্যাভলভ নাম দিয়েছেন পুনঃসংযোজন (Reinforcement)। অনুবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর শিখন এবং মানুষের ক্ষেত্রে কিছু যান্ত্রিক অভ্যাসের আয়ত্তীকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়।

- **সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব :**

যে শিখন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রতিক্রিয়ার ফলটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ওই প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের সম্ভাব্যতাকে বৃদ্ধি করা হয় তাকে বলা হয় সক্রিয় অনুবর্তন (Operant conditioning)। স্কিনার (B. F. Skinner)-এর মতে, আচরণ দু'ধরনের যথা—

(ক) রেসপন্ডেন্ট (Respondent) : যে সব আচরণে নির্দিষ্ট উদ্দীপক আছে যেমন— লালা নিঃসরণের জন্য খাদ্য, চোখের সংকোচনের জন্য উজ্জ্বল আলো ইত্যাদিকে বলা হয় রেসপন্ডেন্ট জাতীয় আচরণ।

(খ) অপারেন্ট (Operant) : যে সব প্রতিক্রিয়ার নির্দিষ্ট কোনো উদ্দীপক নেই তাকে বলা হয় অপারেন্ট জাতীয় আচরণ।

মনোবিদ স্কিনার Minnesota ও Indiana বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে অপারেন্ট অনুবর্তনের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হয়। এইগুলি 1904 খ্রিস্টাব্দে Indiana বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সম্মেলন আহুত হয়। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল 'Experimental Analysis of Behaviour'।

স্কিনারের পরীক্ষা : সক্রিয় অনুবর্তনের ওপর পরীক্ষা করার জন্য স্কিনার একটি বিশেষ বাক্স ব্যবহার করেন যা 'Skinner Box' নামে পরিচিত। এই বাক্সে একটি ট্রে আছে। ট্রে-টি একটি যন্ত্রের দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে একটি বোতামের ওপর চাপ দিলেই ট্রেতে খাবার চলে আসে।

স্কিনার একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে তাঁর তৈরি বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করান। পরীক্ষার সঙ্গে ইঁদুরটিকে পরিচিত করার জন্য প্রথমে ট্রেতে খাবার রাখা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইঁদুরটি বাক্সে রাখা অবস্থায় বোতামে চাপ দিয়ে খাবার আনা হয়। প্রথম পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইঁদুরকে 'ট্রে' করে খাদ্য নিয়ে আসা সম্পর্কে পরিচিত করা, আর দ্বিতীয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইঁদুরটিকে স্কিনারের পরীক্ষার সঙ্গে পরিচিতি করা। এরপর ইঁদুরটিকে পুনরায় বাক্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ইঁদুরটি 'ট্রে'-র দিকে ছুটে যায় খাদ্য পাওয়ার আশায়, কিন্তু খাদ্য না পাওয়ায় নানারকম সঞ্চালনমূলক আচরণ করতে থাকে। হঠাৎ ইঁদুরটি Box-এর মধ্যে রক্ষিত বোতামটির উপর চাপ দেওয়ার ফলে ট্রের মধ্যে খাদ্যবস্তু এসে পড়ে। এই পরীক্ষা অনেকবার পুনরাবৃত্তি করার পর দেখা যায় ইঁদুরটিকে বাক্সে রাখা মাত্র সে সোজা বোতামের কাছে গিয়ে বোতাম টিপে খাদ্য নিয়ে আসে। অর্থাৎ বলা যায় যে, এই প্রক্রিয়ায় শক্তিদায়ী উদ্দীপক খাদ্য বোতামে চাপ দেওয়ায় প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করছে।

এইভাবে বোতামে চাপ দেওয়া এবং খাদ্য পাওয়ার মধ্যে অনুবর্তন ঘটে। এই অনুবর্তনে ইঁদুরের (এখানে শিক্ষার্থী) সক্রিয়তা একান্তভাবে প্রয়োজন বলে একে সক্রিয় অনুবর্তন বলে।

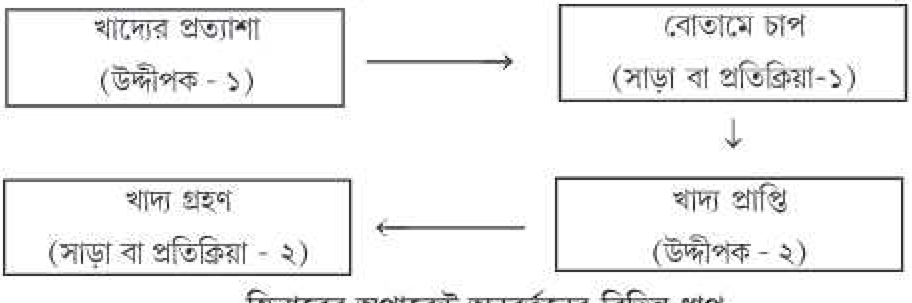

স্কিনারের অপারেন্ট অনুবর্তনের বিভিন্ন ধাপ

অপারেন্ট অনুবর্তনে প্রতিক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই উদ্দীপক আসে (বোতাম টেপার পরে খাদ্য) প্রতিক্রিয়ার পূর্বে নয়। অপারেন্ট আচরণের পরে যদি শক্তিদায়ক উদ্দীপক দেখা দেয় তবে অপারেন্ট অনুবর্তন বা আচরণ পুনর্বার ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

অপারেন্ট অনুবর্তনের নীতি (Principle of Operent Conditioning)

অপারেন্ট অনুবর্তন কিছু কৌশলের মধ্যে দিয়ে সাধিত হয়। এই কৌশলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল আচরণের রূপদান বা Shaping এবং শক্তিদায়ক উদ্দীপকের (Reinforcement) ধারণা।

আচরণের রূপদান বা Shaping

Shaping বা আচরণের রূপদান হল অপারেন্ট অনুবর্তনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, প্রাণীর মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণ নিয়ে আসার জন্য সু-নির্বাচিত এবং পরিকল্পিতভাবে শক্তিদায়ী উদ্দীপকের (Re-inforcement) উপস্থিতিকেই Shaping বলে। এর সাহায্যে ধীরে ধীরে প্রাণীর মধ্যে আচরণটির রূপ দেওয়া হয়।

শক্তিদায়ক উদ্দীপক (Reinforcer)

স্কিনার আচরণ পরিবর্তনের কৌশল হিসাবে রি-এনফোর্সার (Re-infocer) ব্যবহার করেছেন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হিসাবে যা (SR) তত্ত্বে দেখা যায়। শক্তিদায়ক উদ্দীপকের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি যা প্রতিক্রিয়ার হারকে বৃদ্ধি করে। এই শক্তিদায়ক উদ্দীপককে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(১) **ধনাত্মক শক্তিদায়ক উদ্দীপক (Positive reinforcer) :** ধনাত্মক শক্তিদায়ক উদ্দীপক হল আচরণকে ধরে রাখে বা শক্তিশালী করে। যেমন— প্রশংসা, অর্থ, যশ সবই ধনাত্মক শক্তিদায়ক উদ্দীপক।

(২) **ঋণাত্মক শক্তিদায়ক উদ্দীপক (Negative reinforcer) :** এই উদ্দীপক হল প্রাণীর কাছে অবাঞ্ছিত, যেমন- অপযশ, নিন্দা ইত্যাদি। আবার এই উদ্দীপক অনেক সময় বিশেষ আচরণ করতে সাহায্য করে। যেমন— শিক্ষক, পিতামাতা, যাতে অসন্তুষ্ট না হয় তার জন্য নিয়মিত পড়াশোনা করা।

(৩) **শাস্তিদায়ক উদ্দীপক (Punisher reinforcer) :** এই উদ্দীপক হল প্রাণীকে যা কিছু করতে বাধা দেয়, যেমন— কোনো অবাঞ্ছিত আচরণ পুনরাবৃত্তি না করার জন্য শাস্তি বা প্রহার দেওয়া।

এছাড়াও আরও কয়েকটি নীতির কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন—

(ক) **প্রাথমিক প্রস্তুতি (Set) :** অপারেন্ট অনুবর্তন শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রাণীর প্রাথমিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

(খ) **বিলোপসাধন (Extinction) :** বাঞ্ছিত শক্তিদায়ক উদ্দীপক যদি না পাওয়া যায় তাহলে এই অনুবর্তনের বিলোপ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, বোতাম টেপার পরেও যদি খাদ্য না পায়, ইঁদুরটি আর বোতাম টিপতে সক্রিয় হবে না।

(গ) **স্বতঃস্ফূর্ত পুনরাবির্ভাব (Spontaneous recovery) :** অপারেন্ট অনুবর্তনের যদি বিলোপসাধন হয়, সেক্ষেত্রে প্রাণীকে কিছু সময়ের জন্য দূরে রেখে পুনরায় একই পরিস্থিতিতে নিয়ে আসা হয় এবং দু-একবার শক্তিদায়ক উদ্দীপক দেওয়া হয় তাহলে অপারেন্ট অনুবর্তন পুনরায় দেখা যাবে।

(খ) **স্থায়িত্ব (Permanency) :** অর্জিত আচরণের স্থায়িত্ব নির্ভর করে শক্তিদায়ক উদ্দীপকের উপস্থিতির উপর।

শক্তিদায়ক উদ্দীপক কখন এবং কীভাবে ব্যবহার করতে হবে যে সম্পর্কে স্কিনার কতকগুলি নীতির কথা বলেছেন। এই শক্তিদায়ক নীতি বা ব্যবস্থাকে বলা হয় সিডিউল (Schedule)—

(১) **Interval Schedule :** এই সিডিউল-এ নির্দিষ্ট সময় পর রি-এনফোর্স ব্যবহার করা হয়।

(২) **Ratio Schedule :** এই সিডিউলে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সঠিক প্রতিক্রিয়া করলে রি-এনফোর্সমেন্ট দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রাণীর পারদর্শিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৩) **Fixed Interval Schedule :** নির্দিষ্ট সময়ের পরে ব্যক্তিকে রি-এনফোর্সমেন্ট সরবরাহ করা হয়।

(৪) **Variable internal Schedule :** এই সিডিউলে সময় অন্তরের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। সময় তালিকার মধ্যে যে-কোনো সময়ে রি-এনফোর্সমেন্ট সরবরাহ করা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় অনুবর্তনের প্রয়োগ (Application of Operant Conditioning in Education) :

সক্রিয় অনুবর্তন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অনুবর্তনের প্রয়োগগুলি হল—

(১) আচরণ বা প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার ফলের উপর। একটি প্রাণীকে যদি কোনো আচরণ শেখানোর প্রয়োজন হয়, তাহলে যা করা প্রয়োজন ওই নির্দিষ্ট আচরণের সঙ্গে প্রাণীর পছন্দ মতো শক্তিশালী উদ্দীপক যুক্ত করা। কাজেই শিখনের ক্ষেত্রে পরিবেশকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর সাফল্যের মাত্রা সর্বোচ্চ হয় এবং হতাশা ন্যূনতম হয়।

(২) সক্রিয় অনুবর্তনের নীতি আচরণ সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। শিশুর আচরণ সংশোধন করতে গেলে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত শক্তিদায়ক উদ্দীপক নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত আচরণের সাথে শক্তিশালী উদ্দীপকের বন্ধন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ সক্রিয় অনুবর্তনের শক্তিদায়ী উদ্দীপক এবং শেপিং (Shapping)-এর নীতি নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণীর মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণ স্থায়ী করা যায়।

(৩) স্কিনারের মতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ নির্ভর করে সক্রিয় অনুবর্তনের উপর। আমরা ভাষা শিখি কারণ যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য এবং চাহিদাপূরণ বা প্রয়োজন মেটাই যা পুরস্কারের সমতুল্য।

(৪) শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষক শক্তিদায়ক উদ্দীপকের সরবরাহের দক্ষতা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করবেন।

(৫) শিক্ষাক্ষেত্রে 'টিচিং মেশিন' ও প্রোগ্রাম শিখনের আবিষ্কার সক্রিয় অনুবর্তনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সক্রিয় অনুবর্তন অনুযায়ী কার্যকরী শিখন নির্ভর করে—

(ক) শিখনের বিষয়বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীদের সফলতার মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

(খ) দ্রুত 'ফিডব্যাক' (Feed back) সরবরাহ করা হয়।

(গ) শিক্ষার্থী নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনের সুযোগ 'টিচিং মেশিন' এবং পরিকল্পিত শিখন পদ্ধতিতে শর্তগুলি পূরণ করে।

- **প্রাচীন অনুবর্তন ও সক্রিয় অনুবর্তনের পার্থক্য (Difference Between Classical and Operant Conditioning Theory of Learning)**

পার্থক্যের বিষয়	প্রাচীন অনুবর্তন (S-টাইপ)	সক্রিয় অনুবর্তন (R-টাইপ)
১. উদ্ভাবক	এই অনুবর্তনের উদ্ভাবক হলেন বিশিষ্ট শারীরতত্ত্ববিদ আইভান প্যাভলভ (Ivan Pavlov)	এই অনুবর্তনের উদ্ভাবক হলেন বি.এফ স্কিনার (B.F. Skinner)
২. ভিত্তি	এর ভিত্তি হল টাইপ-I শিখন অর্থাৎ রেসপন্ডেন্ট জাতীয় আচরণ (যে আচরণে নির্দিষ্ট উদ্দীপক আছে)	এর ভিত্তি হল টাইপ- II শিখন অর্থাৎ অপারেন্ট জাতীয় আচরণ (যে আচরণে নির্দিষ্ট কোন উদ্দীপক নেই)

পার্থক্যের বিষয়	প্রাচীন অনুবর্তন (S-টাইপ)	সক্রিয় অনুবর্তন (R-টাইপ)
৩. উদ্দেশ্য	অনুবর্তিত উদ্দীপকের উদ্দেশ্য হল উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার বন্ধন ঘটানো (S-R বন্ধন)	সক্রিয় অনুবর্তনের উদ্দেশ্য হল পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক আচরণের মধ্য দিয়ে প্রাণীকে উপযুক্ত আচরণের দিকে নিয়ে যাওয়া।
৪. মূল বিষয়বস্তু	উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন	আচরণের সংশোধন
৫. ইচ্ছাধীনতা	প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়	প্রাণীর ইচ্ছাধীন
৬. গুরুত্বের বিষয়	এই অনুবর্তনের সময় নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া হয়।	এই অনুবর্তনে প্রেষণা ও পুরস্কারের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
৭. স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ	প্যাভলভীয় অনুবর্তন কৌশল প্রাণীর স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	অপারেন্ট অনুবর্তন প্রাণীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৮. স্বাভাবিক ও অনুবর্তিত উদ্দীপকের মধ্যে সম্পর্ক	এক্ষেত্রে স্বাভাবিক উদ্দীপক অনুবর্তিত উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত থাকে।	প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে শক্তিদায়ী উদ্দীপক যুক্ত থাকে।
৯. প্রাণীর আচরণের ওপর উদ্দীপকের প্রভাব	এখানে স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপস্থাপন প্রাণীর আচরণের উপর নির্ভর করে না।	এখানে প্রাণী নির্দিষ্ট আচরণ করলেই শক্তিদায়ী উদ্দীপক আসে।
১০. উদ্দীপকের উপস্থিতির সময়	এই ধরনের অনুবর্তনে শক্তিদায়ী উদ্দীপক পূর্বে আসে।	এক্ষেত্রে প্রাণীর প্রতিক্রিয়া ঘটার পর শক্তিদায়ী উদ্দীপক সরবরাহ করা হয়।
১১. অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার সংঘটন	প্রাচীন অনুবর্তনে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার কোনো অস্তিত্ব থাকে না।	সক্রিয় অনুবর্তনে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াটি অন্তত একবার ঘটবেই।

৬.৪.৩ সমগ্রতাবাদ তত্ত্ব : (Gestalt Theory)

Gestalt একটি জার্মান শব্দ। যার অর্থ হল Pattern বা অবয়ব। এই মতবাদ অনুসারে শিখন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, অংশবিশেষের সমষ্টি নয়। কোনো একটি বস্তুর বিচ্ছিন্ন অংশের মাধ্যমে সামগ্রিক রূপকে উপলব্ধি করা যায় না, সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। গেস্টাল্ট মনোবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Max Weartheimer (ম্যাক্স ওয়ার্দিমার), Kurtz-Koffka (কার্চ কাফকা) এবং Wolfgang Kohler (উল্ফগাঙ্গ কোহলার)।

এই তিনজন মনোবিদের পরীক্ষার ফলেই এই তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এই পরীক্ষায় একটি শিম্পাঞ্জীকে খাঁচায় বন্ধ করে খাঁচার বাইরে কিছু কলা রাখা হয়। এবং খাঁচার মধ্যে দুটি লাঠি ছিল যে দুটিকে একসঙ্গে জুড়তে পারলে কলার নাগাল পাওয়া যাবে। প্রথমে শিম্পাঞ্জীটি আলাদা আলাদাভাবে দুটি লাঠি দিয়ে এরপর একটি লাঠি দিয়ে অপর লাঠিকে ঠেলা দিয়ে, কলার নাগাল পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। এরপর লাঠি দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি লাঠি অপর লাঠিটির ফাঁকা প্রান্তে ঢুকিয়ে ফেলে এবং খাবার টেনে নিতে সক্ষম হয়।

গেস্টাল্ট মনোবিদদের মতে শিম্পাঞ্জীটি এখানে প্রচেষ্টাভুল পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেনি। সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক উপলব্ধি করে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে পরিস্থিতির সামগ্রিক রূপটি ধরতে পারল এবং তখনই সে সমস্যার সমাধানে সক্ষম হল।

গেস্টাল্ট মনোবিদরা অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের কয়েকটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। যথা—

প্রথমত, শিক্ষার্থী প্রথমে শিখন পরিস্থিতির বা সমস্যার সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ করে। **দ্বিতীয়ত,** এই প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে শিখনমূলক পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করে। **তৃতীয়ত,** এর ফলে শিক্ষার্থী সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়।

সামগ্রিকভাবে অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, শিখন পরিস্থিতি এবং পুনরাবৃত্তি ও সামান্যীকরণ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

এছাড়াও গেস্টাল্ট মনোবিদরা সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণের জন্য আরও কতকগুলি নীতির উল্লেখ করেছেন—

১) **সংগঠন বিচ্ছিন্নকরণের নীতি** : পরিস্থিতির সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ করতে হলে প্রথমেই আমরা বস্তুগুলিকে মূল সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিই।

২) **সাদৃশ্যের নীতি** : সদৃশ বিষয়বস্তু বা ধারণা আমরা সহজেই সংগঠিত করতে পারি এবং মনে রাখতে পারি।

৩) **নৈকট্যের নীতি** : যেসব বিষয়বস্তু বা ধারণা স্থানগত বা সময়ের প্রেক্ষিতে কাছাকাছি থাকে সেগুলিকে সহজেই সংগঠিত করা যায়।

৪) **ধারাবাহিকতা নীতি** : বিষয়বস্তু বা ধারণার মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকলে তাদেরকে সহজেই সংগঠিত করা যায়।

৫) **পরিমিতির নীতি** : পূর্বার্জিত শিখনের সাথে সামঞ্জস্য রাখলে বিভিন্ন বিষয়ের সামগ্রিক রূপ উপলব্ধি করা খুব সহজ হয়।

সুতরাং গেস্টাল্ট মনোবিদরা শিখনের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাদের শিখন তত্ত্বকে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন (learning by insight) বলা যেতে পারে।

- **শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাল্টের তত্ত্বের গুরুত্ব :**

বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারসাধন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামগ্রিকতা বোধ ও শিক্ষা : গেস্টাল্ট মনোবিদরা দেখিয়েছিলেন শিখন তখনই সম্ভব যখন শিখন পরিস্থিতির সামগ্রিক রূপ শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই কারণে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিক পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এই তত্ত্ব যান্ত্রিকভাবে প্রচেষ্টাভুল নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

পাঠক্রম পরিকল্পনা : বর্তমানে পাঠ্যসূচির সংগঠন এবং পাঠক্রম পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। যে কোনো পাঠ্য বিষয় শুধুমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমষ্টি নয়, তথ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তা পাঠক্রমে উপস্থাপিত করা হয়।

মানসিক প্রক্রিয়াকে শিখনকে ব্যাখ্যা : এই তত্ত্বানুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ, কৌতূহল ইত্যাদি তার অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে এবং শিখন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ শিক্ষার্থীর যুক্তিবোধ, বিচারশক্তি এবং সৃজনশীলতা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেয়।

সামগ্রিক প্রত্যক্ষণের নীতিগুলির প্রয়োগ : শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে কার্যকর করে তোলার জন্য প্রত্যক্ষণের বিভিন্ন নীতিগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যেমন— সংগঠিত বিষয়গুলি থেকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি দূর করে প্রাসঙ্গিক এবং সাধারণধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি বিচ্ছিন্ন করা, বিভিন্ন সদৃশ বিষয়গুলি চিহ্নিত করা, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি পাঠদান করে সেগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা, পাঠ্য বিষয় ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করা, বিভিন্ন অংশগুলির সাথে পূর্বার্জিত শিখনের সামঞ্জস্য স্থাপন করে পাঠদান করা ইত্যাদি বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং শিক্ষার্থীকে সমস্যার সমাধানে সক্রিয় করা হয়।

সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তীকালে এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই শিখনের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

৬.৫ মনের মূল কাঠামো (কার্যকরী স্মৃতি, দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি, মনোযোগ, সংকেতায়ন এবং পুনরুদ্রেক) (Basic architecture of the mind (working memory, longterm memory, attetion, encoding and retrival)

মনের মূল কাঠামো আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই স্মৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। স্মৃতি সম্পর্কিত ধারণা নিম্নে বর্ণিত হল—

৬.৫.১ স্মৃতি (Memory)

মনের কতকগুলি স্তর আছে, যথা— অবচেতন স্তর, চেতন স্তর এবং প্রাক্ চেতন স্তর। যে বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি তার একটা ছাপ আমাদের মনের অবচেতন স্তরে থেকে যায়। সাধারণ অর্থে আমরা স্মৃতিকে একটি গুণবাচক বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। স্মৃতি বলতে মনের অবচেতন স্তর থেকে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে চেতন স্তরে পুনরুদ্রেক করা।

স্মৃতির সংজ্ঞা (Definition of Memory)

মানসিক শক্তিতত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিদ্‌গণ যুক্তিকরণ, বিচারকরণ, কল্পনা ইত্যাদির মতো স্মৃতিকেও মনের একটি শক্তি বলে মনে করেন। বর্তমানে স্মৃতিকে মানসিক শক্তির পরিবর্তে মানসিক প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করা হয়।

মনোবিদ উডওয়ার্থ (Woodworth)-এর মতে, "যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা পূর্বে শেখা কোন কাজকে একইভাবে পরবর্তীকালে সম্পাদন করতে পারি, তাই হল স্মৃতি" (Doing what one has learned to do)

মনোবিদ স্টাউট (Stout)-এর মতে, "পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে আদর্শগতভাবে তার পুনরুদ্রেক করার প্রক্রিয়াই হল স্মৃতি ("Memory is the ideal revival, so far the ideal revival is more reproductive in which the subjects of past experience are reinstated as far as possible in the order and manner of their original occurrence")।

মনোবিদ রস (Ross)-এর মতে, "অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক যে জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়, তাই হল স্মৃতি ("Memory is a complex process involving the establishment of depositions, their retention and the recalling of experience that have left the depositions behind them")।

৬.৫.২ স্মৃতির উপাদান (Components of Memory)

স্মৃতি হল জটিল মানসিক প্রক্রিয়া যাকে তিনটি উপাদানে ভাগ করা যায়—

(১) শিখন (Learning)

কোনো বিষয় স্মরণ করার জন্য প্রথম যে মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন তা হল শিখন। কোনো বিষয়বস্তুকে একাধিকবার পাঠের মাধ্যমে তাকে মনের অভ্যন্তরে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বিত করাকেই শিখন বলে। একাধিকবার পাঠের মাধ্যমে শিখনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এভাবে বারবার পাঠের মাধ্যমে বিষয়টি যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে, সেই অবস্থাকে বলা হয় পূর্ণ শিখন। পূর্ণ শিখনের পরও যদি পাঠ চালিয়ে যাওয়া হয়, তাকে বলে **অতি শিখন** যা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির পক্ষে সহায়ক।

(২) সংরক্ষণ (Retention)

এটি স্মৃতির দ্বিতীয় পর্যায়। স্মৃতির ছাপগুলি মনের মধ্যে ধরে রাখতে হয় বা সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। ফ্রয়েড অনুগামী মনোবিদ্‌গণ বলেন, অভিজ্ঞতাগুলি মনের অবচেতন স্তরে প্রতিরূপের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। এই প্রতিরূপগুলিকে মনের অবচেতন স্তর থেকে চেতন স্তরে নিয়ে আসাকেই স্মরণ বলে।

(৩) পুনরুত্থাপন (Re-Production or Retrieval)

পুনরুত্থাপন বলতে বোঝায় যে বিষয়টি আয়ত্ত হয়েছে বা পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনরুদ্রেক করা (Recall), যেমন — পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লেখা। আবার অনেক সময় অধীত বিষয় বা অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্রেক করতে না পেরে শুধু চিনতে পারাকে প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition) বলা হয়। যেমন — কোনো বন্ধুর নাম মনে পড়ছে না কিন্তু চিনতে পারা যায়।

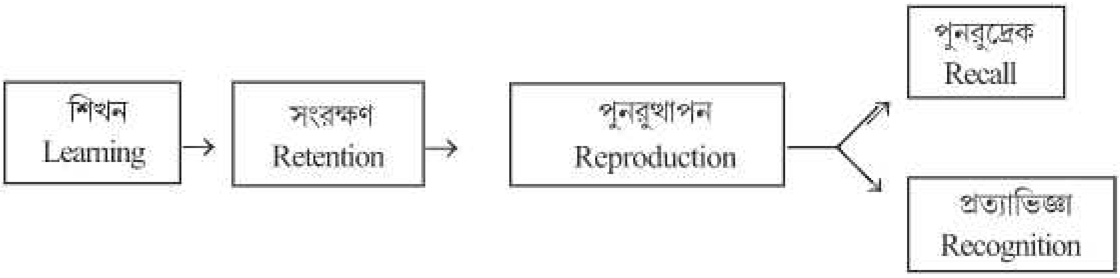

৬.৫.৩ কার্যকরী স্মৃতি বা স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি (Working Memory or Short Term Memory)

সংবেদনজাত তথ্য সংবেদনমূলক পর্যায় অতিক্রম করে সেকেন্ডের মধ্যে অন্তর্হিত হয় অথবা স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি পর্যায়ে চলে যায়। Atkinson তাঁর তত্ত্বে বলেছেন, স্মৃতির এই পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল সংবেদনমূলক স্মৃতির স্থায়িত্ব থেকে বেশি হলেও যথেষ্ট নয়। এই স্তরকে, **সক্রিয় সচেতন স্তর** বলে। এই স্তরে তথ্যের পরিবর্তন ও পরিমার্জন এমনভাবে করে নেওয়া হয়, যাতে ব্যক্তি তার নিজের মতো করে স্মৃতি সঞ্চিত করতে পারে। একেই **তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ** বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দ্রিয় যে সংবেদন গ্রহণ করে ঠিক সেই সংবেদন স্মৃতিতে থাকে না, থাকে পরিবর্তিত অবস্থায়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ করে এবং সেই তথ্য সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চিত তথ্য সংকেতের মাধ্যমে থাকে, যাকে বলে সংকেতায়ন (Encoding) এবং বিপরীত সংকেতায়ন করে তথ্য পুনরুদ্রেক করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে তথ্যগুলি অল্প স্থায়ী স্মৃতি থেকে অন্তর্হিত হয়। ব্যক্তি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করবে তা এই পর্যায়ের স্মৃতি ঠিক করে দেয়। সেজন্য স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিকে কার্যকরী স্মৃতি (Working Memory) বলা হয়।

৬.৫.৪ দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long Term Memory)

সংবেদনগত তথ্যসমূহ স্থায়ী হয় দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে বর্তমানে ব্যবহৃত নয় এমন অসংখ্য সংকেতায়িত Encoded বস্তু স্মৃতিতে থাকে। সংকেতায়ন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; ভাষাগত (Linguistic): কল্পগত (Image) এবং সঞ্চালনগত (Motor)। ভাষাগত সংকেতায়নে সংবেদনগত তথ্যকে শব্দের মাধ্যমে, কল্পনাগত সংকেতায়নে কল্প বা মানসিক প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে এবং শারীরিক দক্ষতাসমূহকে যেমন— সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, ফুটবল খেলা ইত্যাদি সঞ্চালনগত সংকেতায়নের মাধ্যমে মনে রাখা হয়।

সংরক্ষিত তথ্য দুই প্রকারের হয়—

(১) ঘটনামূলক স্মৃতি (Episodic Memory) : দৈনন্দিন জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে থাকে তা এই স্মৃতিতে সঞ্চিত হয় এবং প্রয়োজনে তার পুনরুদ্রেক ঘটে। হঠাৎ কোনো ঘটনা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া করার তথ্য এখান থেকেই আসে। এটা সময় এবং ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত। এই তথ্য দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে।

(২) **ভাষা নির্ভর স্মৃতি (Semantic Memory) :** পৃথিবীর সকল তথ্য সংকেতের মাধ্যমে এই স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়। এটিকে মানসিক অভিধান বলা হয়ে থাকে। যেখানে সাধারণ জ্ঞান সঞ্চিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নাম মনে এলেই তার গান, কবিতা মনে এসে যায়।

ইন্দ্রিয়জাত সংকেতায়ন এবং ভাষা নির্ভর সংকেতায়ন একত্রে কার্যকরী হলে স্মৃতি অধিক স্থায়ী হয়। স্মৃতি তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বের মূল বক্তব্যগুলি হলো—

(ক) স্মৃতির একটি মানসিক প্রতিরূপ আছে। এটি মূল বিষয়ের একটি সাংকেতিক রূপ।

(খ) স্মৃতির প্রতিরূপ ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ও ভাষাগত দুইই হতে পারে এবং এটা ব্যক্তিগত।

(গ) স্মৃতিতে সংরক্ষিত তথ্য সকলকে দুইভাগে ভাগ করা হয়— ঘটনাভিত্তিক ও ভাষাভিত্তিক।

(ঘ) তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ দুই রকমের হতে পারে— গভীর এবং অ-গভীর। এর উপর নির্ভর করে স্মৃতি স্থায়ী না সাময়িক।

৬.৫.৫ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

শিখনের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল স্মরণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকগণ স্মৃতির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে স্মরণ প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায় রয়েছে।

ক. **সংবেদন সঞ্চালনমূলক স্মৃতি পর্যায়** : লিখন প্রক্রিয়া শুরু হয় পরিবেশের সাথে ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং এইভাবেই পরিবেশ থেকে সংবেদনজনিত তথ্যগুলি আমরা গ্রহণ করি। সংবেদনজাত স্মৃতি মনোযোগ ও প্রত্যাভিজ্ঞার মাধ্যমে বাছাই করার পর তা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। স্নায়ুতন্ত্রে এর স্থিতিকাল মাত্র ১-৩ সেকেন্ড, যাতে এর অর্থ মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করতে পারে এবং মস্তিষ্ক এর অর্থ বিশ্লেষণের পর তা প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়।

খ. **স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি পর্যায় :** যে তথ্যগুলি সংবেদন সঞ্চালনমূলক স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় না, সেগুলি পরবর্তী পর্যায়ে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত হয়। এখানে যে-কোনো তথ্যের স্থায়ীত্বকাল ১৮-২০ সেকেন্ড। এবং এই একসাথে ৭ থেকে ৯টির বেশি বিচ্ছিন্ন তথ্য ধরে রাখতে পারে না। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিকে বলে স্মৃতির কর্মক্ষেত্র, তাই এই স্মৃতির অপর নাম কার্যকরী স্মৃতি। কারণ এখানে

- স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষণের জন্য তথ্যর পরিবর্তন,
- প্রতিক্রিয়া করার জন্য প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া সম্পাদন
- স্মৃতির সংগঠন নিয়ন্ত্রণ

এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পাদন হয়।

স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে তথ্যর মূলত দুইভাবে প্রক্রিয়াকরণ হয়।

- চর্চামূলক মহলা (Maintenance Rehearsal), অর্থাৎ যান্ত্রিকভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় বারবার পুনরাবৃত্তি। বোধহীন শিখনের বিষয়গুলি স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য বারবার আবৃত্তি করার দরকার হয়, যাতে ভুলে না যায়।
- বিশদীয় মহলা (Elaborative Rehearsal), এক্ষেত্রে নতুন তথ্যকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা, সম্পর্ক নির্ণয়, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংক্ষিপ্তকরণ, ইত্যাদির মাধ্যমে দীর্ঘকালের জন্য স্মৃতিতে সঞ্চয় রাখা হয়।

গ. **দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি পর্যায়** : স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে তথ্যর প্রক্রিয়াকরণের উপর সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হল স্মৃতির প্রকৃত ভাণ্ডার, যেখানে তথ্য স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়। এই স্মৃতিতে বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে তথ্যগুলি সংরক্ষিত হয়।

- **ভাষাগত সাংকেতায়ন** : এখানে ভাষাগত তথ্যগুলি শব্দের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়।
- **কল্পগত সাংকেতায়ন** : এখানে কল্প বা মানসিক প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষিত হয়।

- **সঞ্চালনগত সাংকেতায়ন** : সঞ্চালনমূলক দক্ষতাগুলি সংকেতের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়, যেমন সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত তথ্য দু'ধরনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়—

- **ঘটনামূলক স্মৃতি** (Episodic Memory) : এই স্মৃতিতে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত হয় এবং এই স্মৃতির সাহায্যে আমরা যে-কোনো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারি।
- **ভাষানির্ভর স্মৃতি** (Semantic Memory) : এক্ষেত্রে ভাষা-সংকেতের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষিত হয়। এবং এই ভাষানির্ভর স্মৃতিতে মূর্ত বিষয়ের পাশাপাশি বিমূর্ত বিষয়ও সংরক্ষিত হয়।

  এইভাবে আমরা যে-কোনো তথ্য স্মৃতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে পারি। তা সত্ত্বেও অনেক সময় বিস্মৃতি ঘটে।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্বের মডেল

(Atkinson, Shiffrin)

৬.৫.৬ বিস্মৃতি

স্মৃতির অভাবই বিস্মৃতি। যখন অতীত বা পূর্ব সংরক্ষিত তথ্য প্রয়োজনের সময় অনেক চেষ্টা করলেও মনে করতে পারি না, তখন তাকেই বলে বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতি সাময়িকও হতে পারে, কখনও বা তা দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে।

- **বিস্মৃতির কারণ :** বিস্মৃতির নানান কারণ রয়েছে, যথা—

ক. **অন্তরায় :** স্মৃতির পথে বাধাকেই অন্তরায় বলা হয়। যখন একটি বিষয় অপর বিষয়ের সংরক্ষণে বাধা দেয় তখন তাকে বলে অন্তরায়। এই অন্তরায় আবার দু'ধরনের হতে পারে।

- একটি তথ্য সংরক্ষণের পরপরই দ্বিতীয় আরেকটি তথ্য সংরক্ষণ করতে চাইলে, প্রথম তথ্যটির সংরক্ষণ দুর্বল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ পরবর্তী বা দ্বিতীয় তথ্যটি প্রথম তথ্যের সংরক্ষণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, একেই বলে **পশ্চাদমুখী অন্তরায়**।
- আবার কখনও কখনও প্রথম তথ্যের সংরক্ষণ এতটাই দৃঢ় হয় যে পরবর্তী তথের সংরক্ষণে বাধা দেয়, একেই **সম্মুখবর্তী অন্তরায়** বলে।

খ. **বোধহীন শিখন :** অর্থহীন বিষয় অর্থাৎ কোনো বিষয় না বুঝে মুখস্থ করলে, বা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আয়ত্ত করলে সহজেই তার বিস্মরণ ঘটে। কারণ এই ধরনের শিখনে তথ্যর প্রক্রিয়াকরণ খুবই নিম্নস্তরের হয়। ফলে সংরক্ষণও দুর্বল হয়।

গ. **সময়ের কারণে বিস্মৃতি :** স্মৃতি বিষয়ক গবেষক এবিংহস বলেছেন কোনো কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষিত হবার পর যত সময় অতিবাহিত হয়, স্মৃতি ততই দুর্বল হতে থাকে। তিনি পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন, কোনো কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষিত হবার পর প্রথম দিকে বিস্মৃতির হার দ্রুত হলেও তারপর ক্রমশ কমতে থাকে। যদিও শেষপর্যন্ত কিছুটা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তার আর বিস্মৃতি ঘটে না।

ঘ. **ইচ্ছাকৃত বিস্মরণ :** মনোবিদ ফ্রয়েডের মতে অপ্রিয় বিষয়, বেদনাদায়ক বা অবাঞ্ছিত বিষয় আমরা ভুলে যেতে চাই। এবং ভুলে যাওয়ার এই তাগিদ অচেতন (unconscious) বা নির্জ্ঞান মন থেকে সৃষ্টি হলে বিষয়টি আমরা ভুলে যায়। কিন্তু সচেতনভাবে ভুলে যাওয়ার তাগিদ থাকলে আমরা সহজে ভুলি না।

ঙ. **প্রক্ষোভজনিত বিস্মরণ :** রাগ, ভয়, ঘৃণা, শোক, উদ্বেগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ বা আবেগগুলি তীব্রভাবে দেখা দিলে অনেকসময়ই বিস্মরণ ঘটে। তবে এই বিস্মৃতি সাময়িক।

চ. **ক্লান্তি :** শিখনের সময় ক্ষুধা, রোগ, অতি পরিশ্রম বা মানসিক ক্লান্তি থাকলে, সেটির বিস্মৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

ছ. **রোগজনিত বিস্মরণ :** বিশেষ বিশেষ মানসিক রোগ, স্নায়বিক রোগের কারণেও বিস্মরণ ঘটে। যেমন অ্যালজাইমার (Alzheimer) নামক স্নায়বিক রোগের কারণে স্মৃতি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় এবং একসময় বিলুপ্ত হয়, যাকে অ্যামনেশিয়া (Amnesia) বলে।

জ. **স্মৃতির বিকৃতি :** অনেকসময়ই সংরক্ষিত তথ্য যথাযথভাবে বিন্যস্ত না থাকায় একটির সাথে অপরটি মিলে মিশে যায়। পরীক্ষার সময়, অনেক সময়ই ছাত্রছাত্রীরা এক উত্তর লিখতে অন্য উত্তর লিখে ফেলে, এই ধরনের বিস্মৃতিকে স্মৃতির বিকৃতি বলে।

ঝ. **শৈশবের স্মৃতিলোপ :** কিছু কিছু বয়সের স্মৃতি খুব কম পরিমাণে মনে থাকে, আবার কোন কোন বয়সের স্মৃতি স্পষ্ট মনে থাকে। যেমন শৈশবের স্মৃতি কিছুটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ লোপ পায়, যেমন দু'বছর বয়সের স্মৃতি পরবর্তীকালে কিছুই মনে করতে পারি না, একেই বলে শৈশবের স্মৃতিলোপ।

ঞ. **নেশাদ্রব্য সেবনজনিত বিস্মরণ :** মদ, গাঁজা, আফিম, ড্রাগস ইত্যাদি নেশাদ্রব্য অতিরিক্ত সেবন করলেও অনেকসময়ই বিস্মরণ ঘটে।

- **বিস্মৃতি হ্রাসকরণের পদ্ধতি :** বিস্মৃতির সম্পূর্ণ দূরীকরণ সম্ভব নয়। অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় জিনিস বা বেদনাদায়ক ঘটনার বিস্মরণ প্রয়োজন। তথাপি অনেকসময় অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু বা ঘটনার বিস্মরণ ঘটে, তাই বিস্মরণ হ্রাস করা প্রয়োজন এবং সংরক্ষণ ক্ষমতার উন্নয়ণ ঘটানো প্রয়োজন। তার জন্য—

  - কোনো বিষয় বা পাঠ মুখস্থ করার সময়, বিষয়টি ছোট হলে মুখস্থ করে আয়ত্ত করা যেতে পারে একেবারে। আর বিষয়টি বড় হলে তাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে নিয়ে, একটি অংশ মুখস্থ করার পর, তার পরবর্তী অংশ মুখস্থ করা অংশের সাথে যোগ করে পড়লে, সবটা মুখস্থ হয়ে যায়, সংরক্ষণ দৃঢ় হয়।
  - দুটি পাঠের মধ্যে অন্তর্বর্তী বিরতি দিয়ে পূর্বে পাঠ করা অংশকে সংহত করার চেষ্টা করলে, পাঠ্য বিষয়টির সংরক্ষণ ভালো হয়।
  - বিচ্ছিন্ন বিষয় স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাই দ্রুত তথ্যগুলি সমন্বিত তথা সংহত করা প্রয়োজন। কারণ পরস্পর সম্পর্কিত বিষয় স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়।
  - অর্থবহ শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই তথ্যকে অর্থবহ করে তুলে তাদের মধ্যেকার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝে বিষয়ের সামগ্রিক রূপ সর্বাগ্রে তুলে ধরতে হবে।
  - প্রায়শই শিক্ষণীয় বিষয়গুলির চর্চা বজায় রাখার জন্য অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে হবে।
  - পড়ানোর পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনলে বিস্মৃতি কম হয়।

এছাড়াও বিস্মৃতি হ্রাসকরণের কিছু কৌশল রয়েছে, যেমন—

ক. **SQ4R কৌশল :** শিখনের উন্নতি ঘটিয়ে বিস্মরণ কমানোর জন্য SQ4R কৌশলের কথা বলেছেন Thomas এবং Robinson, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে শিখনের জন্য ধারাবাহিক পন্থা অবলম্বন করতে হয়, এর স্তরগুলি হল—

S— Survey বা অনুসন্ধান : অর্থবহ শিখনের জন্য যে বিষয়টি শিক্ষার্থী আয়ত্ত করবে, সেই সংক্রান্ত তথ্যসমূহ অনুসন্ধান করবে, পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেই সংক্রান্ত ধারণা গঠনে সচেষ্ট হবে।

Q—Question বা প্রশ্নকরণ : এই পর্যায়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থী নানা প্রশ্ন করবে এবং এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, সহপাঠী এমনকি নিজের বিচার বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে পারে।

R— Read বা পঠন : এরপর শিক্ষার্থী বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য অধ্যয়ন করবে।

R— Reflect বা প্রতিফলন : উপরিউক্ত তিনটি পর্যায়ে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলি সংগঠিত এবং অর্থপূর্ণ করে তুলে অর্জিত জ্ঞানের সাথে পূর্ব জ্ঞানের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য বিচার করবে।

R— Recitation & Recall বা পুনরাবৃত্তি ও পুনরুদ্রেক : সংগৃহীত তথ্যগুলি মৌখিক বা লিখিতভাবে পুনরাবৃত্তি করবে এবং প্রয়োজনে অর্জিত অভিজ্ঞতার সাথে পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক ঘটাবে।

R— Review বা পুনর্বিবেচনা : এইভাবে শিক্ষার্থী যে বিষয়টি আয়ত্ত করল তা পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করবে, নিজেদের ত্রুটি বা দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং বিষয়টি আয়ত্ত করবে।

খ. **Mnemonic কৌশল :** Mnemonic হল একটি গ্রীক্ শব্দ, যার অর্থ স্মরণে সহায়ক এবং এই কৌশল স্মৃতির উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে, এর অন্তর্ভুক্ত কৌশলগুলি হল—

- Loci Method : Latin শব্দ 'Loci' এর অর্থ স্থান বা অবস্থান, এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এখানে সময় বা স্থানগত অবস্থানের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি স্মরণে রাখতে হয়।
- Narrative Chaining Method : এক্ষেত্রে যে-কোনো ঘটনা বা বিষয় ধারাবাহিকভাবে অথবা গল্পের মাধ্যমে মনে রাখা হয়।
- Initial Letter Strategy : এখানে যা স্মরণে রাখতে হবে, তার প্রথম অক্ষরের সাহায্য নিয়ে বিষয়টি মনে রাখা হয়, যেমন রামধনুর সাতটি রঙ পরপর মনে রাখার জন্য, সাতটি রঙের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দ 'বেণীআসহকলা'-র সাহায্যে স্মরণে রাখা হয়।
- Key word Method : এই পদ্ধতিতে কঠিন, অপরিচিত, ব্যতিক্রমী শব্দ বা পদগুলি মনে রাখার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি স্মরণে রাখা হয়।

সুতরাং বলা যায়, এই কৌশলগুলি প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থী স্বল্পসময়ে অধিক বিষয়বস্তু শিখতে পারবে, স্মরণে রাখতে পারবে এবং এটি শিক্ষার্থীর বিস্মরণ কমাতেও সাহায্য করবে।

- **শিখন সঞ্চালন ও বিস্মৃতি :** বিস্মৃতির সাথে শিখন সঞ্চালনের সম্পর্ক আছে। যেমন—
  - ইতিবাচক সঞ্চালন : প্রথম শিখন দ্বিতীয় শিখনে সাহায্য করলে বা তাকে প্রভাবিত করলে, তাকে ইতিবাচক সঞ্চালন বলে। যেমন সাদৃশ্যযুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ইতিবাচক সঞ্চালন হয়, বা কোন ঘটনা, সূত্র, নিয়ম সামান্যীকরণ করা গেলে পরবর্তী শিখনে তার ইতিবাচক সঞ্চালন ঘটে।
  - নেতিবাচক সঞ্চালন : প্রথমটির শিখনের ফলে দ্বিতীয়টির শিখন ব্যাহত হলে, তাকে নেতিবাচক সঞ্চালন বলে।
  - শূন্য সঞ্চালন : প্রথমটির শিখন, দ্বিতীয় শিখনকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে না পারলে তাকে বলে শূন্য সঞ্চালন।

শিখন সঞ্চালনের সাথে বিস্মৃতির সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, পশ্চাদবর্তী ও সম্মুখবর্তী অন্তরায়, শিখনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই অন্তরায়জনিত বিস্মৃতি কমানোর একটি প্রধান উপায় হল শিখন-সঞ্চালন সংক্রান্ত নীতিগুলির যথাযথ ব্যবহার।

৬.৫.৭ মনোযোগ (Attention)

প্রাচীনকালে, মানসিক শক্তিতে বিশ্বাসী মনোবিদ্‌গণ মনোযোগকে মনের একটি গুণ হিসাবে ব্যবহার করতেন। তাঁরা মনে করতেন স্মরণ ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ইত্যাদির মতোই মনোযোগও একধরনের ক্ষমতা। আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনোযোগকে মনের একটি ক্রিয়া বা তাকে মনোযোগ প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

মনোযোগ কথার অর্থ হল মনকে একান্তভাবে যুক্ত করা। সাধারণত 'মনোনিবেশ' কথাটির সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল (Mc Dougall) এর মতে, 'যে মানসিক সক্রিয়তা আমাদের প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাই হল মনোযোগ' (Attention is merely conation or striving considered from the point of view of its effects on cognitive process)।

মনোবিদ্ স্টাউট (Stout) মনে করেন, 'মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার পেছনে যে মানসিক সক্রিয়তা কাজ করে, তাই মনোযোগ' (Attention is conation determining cognition)।

মনের সক্রিয়তা যত বেশি হয় মনোযোগের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পায় এবং জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতাও তত সামগ্রিক হয়। এই ধরনের বহু সংজ্ঞা বিভিন্ন মনোবিদ্‌গণ দিয়েছেন।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention)

(১) **মনোযোগের কেন্দ্রানুগতা :** আধুনিক মনোবিদ্‌গণ এবিষয়ে একমত যে, মনের একটি কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া (central process),

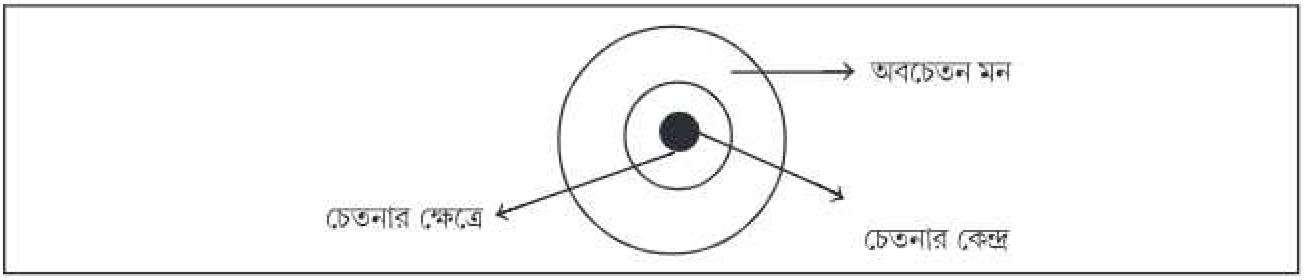

অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার ফলে উদ্দিষ্ট বস্তু আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হয়। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী মনের বিভিন্ন স্তরকে দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার বাইরে বড়ো অংশটি হল অবচেতন মন (Unconscious mind) আর কেন্দ্রটি হল চেতন মনের কেন্দ্রস্থল (Core of consciousness)। ভেতরের ছোটো বৃত্তটি হল চেতনার বিস্তৃতি। অর্থাৎ ওই ক্ষেত্রের অন্তর্গত যে-কোনো বস্তু সম্বন্ধে আমরা সচেতন।

(২) **মনোযোগের নির্বাচনী ক্ষমতা :** মনোযোগ প্রক্রিয়ায় বস্তু নির্বাচন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, বিপরীতক্রমে মনোযোগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নির্বাচনী ক্ষমতা ।

(৩) **মনোযোগ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়া :** আমরা যখন কোনো বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই, তখন তার সমস্ত রকম দোষ-গুণ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ আমরা বস্তুকে বিশ্লেষণ করে দেখি। কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক সংবেদনের মাধ্যমে

বস্তুমুখী জ্ঞান আমাদের হয় না। বস্তুধর্মী জ্ঞান একক এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আসে। তাই মনোযোগই বস্তু যখন চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে, তখনই আমরা তার সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতাকে সংশ্লেষণ করি। আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, মনোযোগের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়া, উভয়ই কাজ করে।

(৪) **মনোযোগের পরিবর্তন :** মনোযোগ কোনো বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারে না, এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা।

(৫) **মনোযোগের চঞ্চলতা :** উদ্দীপকের উদ্দীপনা শক্তি যত ক্ষীণ হবে তত মনোযোগের চঞ্চলতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ এই বৈশিষ্ট্যকে একটি তরঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন।

(৬) **মনোযোগের পরিসর :** আমরা ইচ্ছা করলেই যত ইচ্ছা বস্তুর উপর মনোযোগ দিতে পারি না। এর কারণ একত্রে অনেক বস্তুকে আমরা চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থাপিত করতে পারি না। ব্যক্তিগত এই সীমাকে বলা হয় মনোযোগের পরিসর (Span of Attention)।

মনোযোগের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Attention)

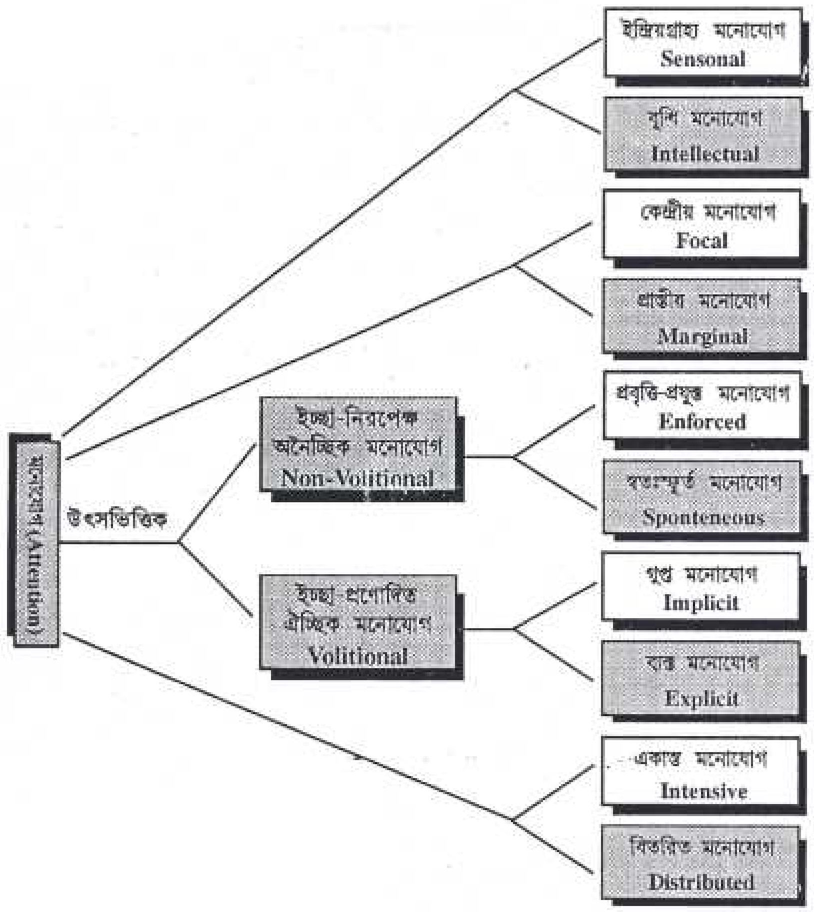

- **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনোযোগ :** কোন বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি মনোযোগ দিলে তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনোযোগ বলে।
- **বুদ্ধিগ্রাহ্য মনোযোগ :** আমরা যে বস্তুকে নিয়ে চিন্তা করছি তার প্রতি মনোযোগ দিলে তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য মনোযোগ বলে।
- **কেন্দ্রীয় মনোযোগ :** কোনো নির্দিষ্ট উদ্দীপক বা বস্তুর প্রতি মনোযোগকেই বলে কেন্দ্রীয় মনোযোগ।
- **প্রান্তীয় মনোযোগ :** যখন ব্যক্তি পরিবেশের কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর অন্যদের আপেক্ষিক বর্জনের দিকে মনোনিবেশ করলে, তাকে প্রান্তীয় মনোযোগ বলে।
- **একান্ত মনোযোগ :** যখন ব্যক্তি কোনো বিষয়ের প্রতি এতটাই গভীরভাবে মনোযোগ দেয়, যে অন্য কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতি সে সচেতন থাকে না, তাকেই একান্ত মনোযোগ বলে।
- **বিতরিত মনোযোগ :** একই সাথে বহু বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিলে তাকে বিতরিত মনোযোগ বলে।

মনোযোগের এই শ্রেণিবিভাজনগুলির মধ্যে মনোবিদ রসের, মনোযোগের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা শ্রেণিবিভাজন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনোযোগকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

- **ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ :** যে মনোযোগ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, অর্থাৎ চিরস্থায়ী মানসিক সংগঠন দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়ন্ত্রিত তাকে ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ বলে। এটি আবার দু'ধরনের—
    - আরোপিত মনোযোগ : এই ধরনের মনোযোগ ব্যক্তির জৈব মানসিক প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

      উদা : ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যের প্রতি মনোযোগ।
    - অর্জিত মনোযোগ : আমাদের সেন্টিমেন্ট যা আমরা বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়ত্ত করেছি, তার দ্বারা যে মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত, তাকেই বলে অর্জিত মনোযোগ।

      উদা : দেশের প্রতি প্রবল ভালোবাসার কারণে দেশ সংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনায় মনোযোগী হওয়া।
- **ইচ্ছা প্রণোদিত মনোযোগ :** আমাদের মানসিক ইচ্ছা বা প্রেরণার তাড়নায় কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগী হলে, তাকে ইচ্ছা প্রণোদিত মনোযোগ বলে। এটি দু'ধরনের—
    - গুপ্ত মনোযোগ : কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করা হলে, তাকে গুপ্ত মনোযোগ বলে।

      উদা : আঁকার প্রতি তীব্র আগ্রহে অনেকে শিল্পী হন।
    - ব্যক্ত মনোযোগ : কোনো বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য বারবার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হলে, তাকে ব্যক্ত মনোযোগ বলে।

      উদা : পাড়ার প্যান্ডেলে প্রিয় গান বাজা সত্ত্বেও পরীক্ষার কারণে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে।

মনোযোগের নির্ধারক (Conditions of Attention)

আমরা আমাদের চারপাশের বহু বস্তুর মধ্য থেকে বিশেষ একটিকে নির্বাচন করে মনোযোগ দিই। ওই বিশেষ বস্তুটিকে আমরা কেন নির্বাচন করছি, সেই কারণগুলিই হল মনোযোগের নির্ধারক। অর্থাৎ যে শর্তগুলি ওই বিশেষ বস্তুকে নির্বাচনে সাহায্য করছে সেগুলিই মনোযোগের নির্ধারক। এটি দু'প্রকার—

i) বাহ্যিক বা বস্তুগত নির্ধারক

ii) অভ্যন্তরীণ বা ব্যক্তিগত নির্ধারক

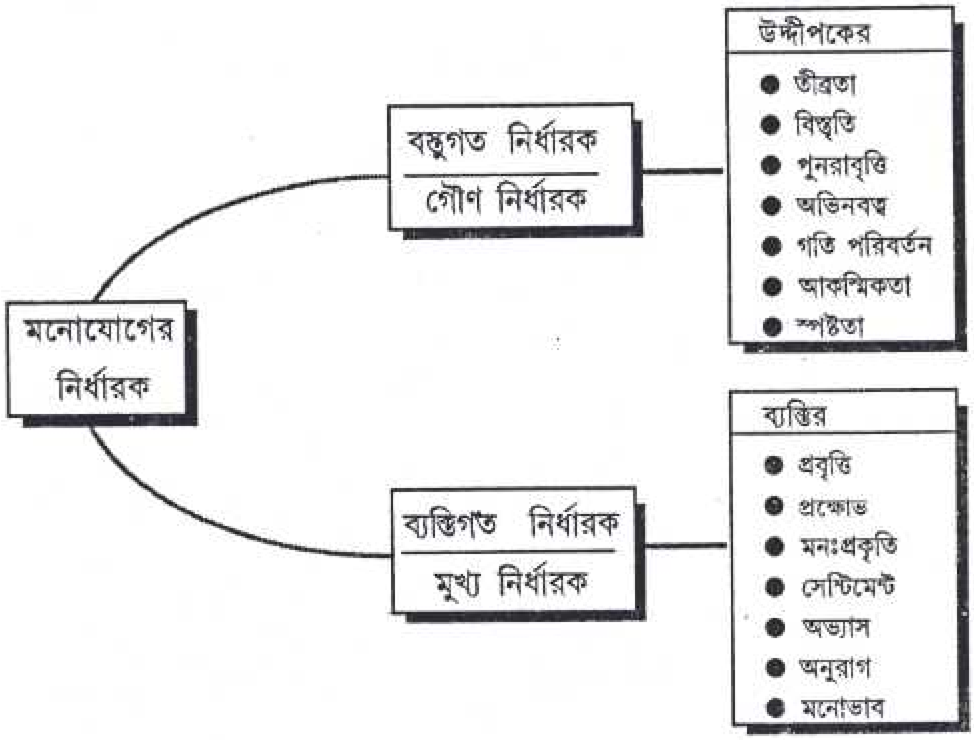

মনোযোগের ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলি হল—

i) **প্রবৃত্তি :** আমাদের যে সহজাত প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা মনোযোগের বিষয় নির্বাচন করি।

ii) **প্রক্ষোভ :** বিশেষ বিষে প্রক্ষোভমূলক অবস্থা আমাদের বস্তু নির্বাচনে সহায়তা করে। যেমন— ভয় পেলে আমরা যখন দৌড়ে পালাই তখন পাশাপাশি কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করে।

iii) **মনঃপ্রকৃতি :** মনঃপ্রকৃতি অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি। যেমন— কারর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হল সব কাজে খুঁত ধরা, তার সবকিছু বস্তুর খারাপ দিকটার প্রতি মনোযোগ যায়।

iv) **সেন্টিমেন্ট :** সেন্টিমেন্ট একটি অর্জিত জৈব মানসিক প্রবণতা যা ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে সাহায্য করে। যেমন— একই রকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সেন্টিমেন্টের দরুন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেয়।

v) **অভ্যাস :** অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও আমরা মনোযোগের বস্তু নির্বাচন করি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস যাদের তাদের অপরিষ্কার কিছু দেখলই মনোযোগ চলে যায়।

vi) **অনুরাগ ও মনোভাব :** ব্যক্তি যে বিষয়ে অনুরাগী সেই বিষয়ে সে মনোযোগ দেয়। যেমন— যাদের খেলার প্রতি অনুরাগ

তারা সকলবেলার কাগজ পেলেই প্রথমেই খেলার খবরের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনেকসময় অতীত অভিজ্ঞতার দরুন বস্তুকে কেন্দ্র করেও বিশেষ কোনো মনোভাব গড়ে ওঠে।

মনোযোগের বস্তুগত নির্ধারকগুলি হল—

i) **তীব্রতা** : উদ্দীপকগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে তীব্র যেমন—উজ্জ্বল রং, উজ্জ্বল আলো, তীব্র গন্ধ, জোর আওয়াজ ইত্যাদি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ii) **বিস্তৃতি/আকার** : ছোটো বস্তুর থেকেও আকারে বড়ো বস্তু আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

iii) **পুনরাবৃত্তি** : উদ্দীপকের তীব্রতার মতোই তার বারবার পুনরাবৃত্তি ও মনোযোগ আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

iv) **অভিনবত্ব** : যে কোনো বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব মনোযোগ আকর্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

v) **পরিবর্তনশীলতা/গতিপরিবর্তন** : হঠাৎ কোনো পরিবর্তন হলে মনোযোগ সেদিকে চলে যায়। যেমন— রাস্তায় চলমান গাড়ি থেকে সব গাড়িকে ছাড়িয়ে বেশি গতিতে এগিয়ে যাওয়া গাড়িটির প্রতি বেশী মনোযোগ যায়।

vi) **আকস্মিকতা** : আকস্মিক বস্তুর প্রতি আমাদের মনযোগ আগে যায়। যেমন— হঠাৎ বিদ্যুতের চমক আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করে।

vii) **স্পষ্টতা** : অস্পষ্ট বস্তু অপেক্ষা স্পষ্ট বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি।

সুতরাং বলা যায়, মনোযোগ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত শর্ত তেমনি অন্য দিকে বস্তুগত শর্তের ওপরেও নির্ভরশীল। আবার অনেক সময় ব্যক্তির মানসিক অবস্থাও মনোযোগের নির্ধারক হিসাবে কাজ করে।

মনোযোগের শিক্ষাগত গুরুত্ব (Educational Implications of Attention)

শিক্ষার সাথে মনোযোগের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিখন এবং শিক্ষণের প্রথম শর্তই হল শিক্ষার্থীর মনোযোগ। তাই শিখনের জ্ঞানমূলক তত্ত্বে এমনকি আচরণবাদেও মনোযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কীভাবে আকর্ষণ করা যায় সেই সম্পর্কীয় তথ্য এবং কৌশল শিক্ষকের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন—

i) শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বা কার্যগুলির মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য আনতে হবে যা শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করবে। শিশুর চাহিদা সম্পর্কে তাই শিক্ষক অবগত থাকবেন এবং চাহিদাকে কেন্দ্র করেই শিশুর শিখন বিন্যস্ত করতে হবে। প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠক্রম হবে খেলাভিত্তিক এবং শিক্ষণ পদ্ধতি হবে ক্রীড়াকেন্দ্রীক।

ii) উচ্চ প্রাথমিক স্তরে যখন শিশুর মধ্যে ইচ্ছামুলক মনোযোগ লক্ষ করা যায় তখন শিক্ষণীয় বিষয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত করে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে এবং তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষত জ্ঞানমূলক শিখনের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ অত্যন্ত বাঞ্ছিত এবং প্রয়োজনীয়।

iii) বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় শিক্ষককে লক্ষ রাখতে হবে তা যেন শিক্ষার্থীদের মনোযোগের পরিসর অতিক্রম না করে। প্রয়োজন হলে বৃহৎ বাক্যকে ছোটো ছোটো বাক্যে রূপান্তরিত বা বিভক্ত করে পাঠদান করতে হবে।

iv) মনোযোগের নির্ধারকগুলি প্রয়োজন মতো প্রয়োগ করতে হবে। যেমন—পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণগুলি যাতে উপযুক্ত পরিমাণে বড়ো হয়, রঙিন হয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষের পাঠদানে বৈচিত্র্য আনতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে শ্রেণিশিক্ষণকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা প্রয়োজন।

v) মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা এবং চঞ্চলতা সম্পর্কেও শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। কারণ মনোযোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কিছুক্ষণ অন্তর এটা অন্য বিষয়ে গমন করে। আবার অনেক সময় মনোযোগ সত্ত্বেও কিছু সময় অন্তর তা

অন্তর্হিত হয়। তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে কোনো কিছু অধিক সময়ব্যাপী আলোচনা না করে শিক্ষণ মাঝে মাঝে বিষয় অন্তরে চলে যাওয়া।

vi) ব্যক্তিভেদে মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতার পার্থক্য দেখা যায়। কেউ দীর্ঘ সময়ের জন্য মনোযোগ ধরে রাখে, আবার কারোর মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা অল্প। শিক্ষকগণ এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেবেন।

সবশেষে বলা যায়, মনোযোগ আকর্ষণ শিক্ষণ এবং শিখন প্রক্রিয়ার প্রথম এবং প্রধান শর্ত। তাই শিক্ষার্থীভেদে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার মধ্যে ইচ্ছাপ্রণোদিত মনোযোগ আকর্ষণের সবরকমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৬.৫.৬ সংকেতায়ন (Encoding)

স্মরণ প্রক্রিয়ার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যখন সংবেদন গ্রহণ করে ঠিক সেই সংবেদন স্মৃতিতে থাকে না, থাকে পরিবর্তিত অবস্থায়। একেই সংকেতায়ন বলে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে সংবেদনগুলিকে সংকেতায়ন করে। সংকেতায়ন বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন— ভাষাগত (Lingustic), কল্পগত (Image), এবং সঞ্চালনগত (Motor)। ভাষাগত সংকেতায়নে সংবেদনজাত তথ্যকে শব্দের মাধ্যমে সংকেতায়িত করা হয়। কল্পগত সংকেতায়নে কল্প বা মানসিক প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে এবং সঞ্চালনগত সংকেতায়নে সঞ্চালনের বা চলনের মাধ্যমে মনে রাখা হয়।

৬.৫.৭ পুনরুদ্রেক (Retrieval)

অধীত বিষয় বা পূর্ব-অভিজ্ঞতাগুলিকে স্মরণ করা (Recall) বা চিনে নেওয়াকে পুনরুদ্রেক (Recognition) বলা হয়।

পুনরুত্থাপন বলতে বোঝায় অধীত বিষয় বা পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনরুদ্রেক করা বা চিনে নেওয়া। পুনরুদ্রেকের উদাহরণ হল কবিতা আবৃত্তি করা বা পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লেখা। পুনরুদ্রেককে দুভাবে ভাগ করা হয়— প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক এবং পরোক্ষ পুনরুদ্রেক। যেমন— রামের কথা মনে হলে শ্যামের কথা মনে পড়ে।

পুনরুদ্রেকের আরও একটি ভাগ হল প্রত্যাভিজ্ঞা বা চিনে নেওয়া। আমরা অনেক সময় অধীত বিষয় বা অভিজ্ঞতা পুনরুদ্রেক করতে পারি না কিন্তু চিনতে পারি। যেমন— কোনো বন্ধুর নাম মনে করতে পারছি না, কিন্তু একজন যদি সেই বন্ধুর নাম উল্লেখ করে সেক্ষেত্রে বন্ধুর নাম চিনে নিতে পারি। পুনরুদ্রেকের সঙ্গে প্রত্যাভিজ্ঞার মৌলিক পার্থক্য হলো পুনরুদ্রেক ঘটে বস্তু অনুপস্থিতিতে আর প্রত্যাভিজ্ঞা ঘটে বস্তুর উপস্থিতিতে।

৬.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিখন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বর্তমান। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া যা শিক্ষা মনোবিদ্যার সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে। শিখনের নীতি আলোচনার সময় থর্নডাইক, স্কিনার, প্যাভলভ— এদের মতবাদ বিশেষভাবে আলোচিত হয়। শিখনের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। শিখনের একাধিক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। যথা— থর্নডাইকের

সংযোজনবাদ, প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব এবং স্কিনারের অপারেন্ট অনুবর্তন তত্ত্ব ইত্যাদি। মনের মূল কাঠামো আলোচনার ক্ষেত্রে স্মৃতি, মনোযোগ, সংকেতায়ন এবং পুনরুদ্রেক এই চারটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৬.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. থর্নডাইকের গৌণ সূত্রের সংখ্যা হল—

(ক) ৩টি (খ) ৫টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি

২. 'Shaping' ধারণার প্রবক্তা হলেন—

(ক) থর্নডাইক (খ) প্যাভলভ

(গ) কোহলার (ঘ) স্কিনার

৩. শিখনের 'প্রচেষ্টা ও ভুল' তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন—

(ক) প্যাভলভ (খ) থর্নডাইক

(গ) স্কিনার (ঘ) কোহলার

৪. 'কার্যকরী স্মৃতির' অন্য নাম হল—

(ক) তাৎক্ষণিক স্মৃতি (খ) সংবেদনশীল স্মৃতি

(গ) স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি (ঘ) অর্জিত স্মৃতি

৫. 'অন্তর্দৃষ্টির জন্য প্রয়োজন—

(ক) শিক্ষার্থীর মনোযোগ (খ) শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা

(গ) শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান (ঘ) সবগুলি

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. শিখনের সংজ্ঞা দাও।

২. শিখনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৩. সংযোজনবাদ বলতে কী বোঝ?

৪. শিখন সংক্রান্ত থর্নডাইকের প্রস্তুতির সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৫. শিখন সংক্রান্ত থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৬. থর্নডাইকের গৌণ সূত্রগুলি কী কী?

৭. অনুবর্তন কী?

৮. অনুবর্তনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৯. অপানুবর্তন বলতে কী বোঝানো হয়?

১০. 'অপারেন্ট অনুবর্তন' বলতে কী বোঝ?

১১. Negative Reinforcer ও Punisher এর মধ্যে তফাৎ কী?

১২. Punisher বলতে কী বোঝানো হয়?

১৩. শ্রেণিকক্ষে অপারেন্ট অনুবর্তনের দুটি প্রয়োগ উল্লেখ করো।

১৪. শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের তাৎপর্য উল্লেখ করো।

১৫. স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি কাকে বলে?

১৬. দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি কাকে বলে?

১৭. মনোযোগের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

১৮. কার্যকরী স্মৃতি কী?

১৯. নির্মিতিবাদ বলতে কী বোঝায়।

২০. নির্মিতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

C. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. শিখনের সংজ্ঞা দাও। শিখনের মূল নীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. শিখন সংক্রান্ত থর্নডাইকের 'প্রচেষ্টা ও ভুল' তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনা করো। এর শিক্ষাগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৩. থর্নডাইকের মুখ্য সূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করো।

৪. প্রাচীন অনুবর্তনবাদ কী? প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তনবাদের মূল তত্ত্বটি লেখো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ উল্লেখ করো।

৫. স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের মূল নীতিগুলি আলোচনা করো। শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় অনুবর্তনের প্রয়োগ উল্লেখ করো।

৬. গেস্টাল্ট তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। গেস্টাল্ট তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য লেখো।

৭. স্মৃতির শ্রেণিবিভাগগুলির বর্ণনা দাও।

৮. মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা দাও। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

৯. প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব ও অপারেন্ট অনুবর্তন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যগুলি বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৭

জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া (Cognition)

৭.১ সূচনা (Introduction)

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৭.৩ নির্মিতিবাদ সম্পর্কে ধারণা (Constructivism : Introduction to the concept)

৭.৪ ভাইগটস্কির তত্ত্ব (Vygotsky's Theory)

৭.৫ জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা, ব্যক্তিগত এবং সমাজ সংস্কৃতির পার্থক্য, শিখনে অসুবিধা, বহির্ভুক্তি এবং অন্তর্ভুক্তি ও তাদের প্রভাব (Individual and Socio-cultural Difference in Cognitive understanding, Learning difficulties, Term of Exclusion and Inclusion and their Impact) :

৭.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

৭.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

৭.১ সূচনা (Introduction)

বাইরের জগতের অভিজ্ঞতার সঠিক আত্তীকরণ এবং পুনর্নির্মাণ হল জ্ঞান। শিক্ষার্থীর মনে সামাজিক অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু ধারণা থাকে শিক্ষার্থীরা সেই ধারণার সঙ্গে নতুন ধারণাগুলি যুক্ত করে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার নির্মাণ করে। অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাকে দলগত সহায়তা, বৌদ্ধিক আলোড়ন, অভিজ্ঞতামূলক শিখন, সহযোগী শিখন, সমস্যাভিত্তিক শিখন, আবিষ্কারধর্মী শিখন প্রভৃতির মাধ্যমে বিষয় সমূহকে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতায় পরিণত করা যায়।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। শিক্ষার্থীদের নির্মিতিবাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করা।

২। পিঁয়াজের তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

৩। ভাইগটস্কির তত্ত্ব শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

৪। জ্ঞানমূলক শিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক সংস্কৃতির ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে।

৭.৩ নির্মিতিবাদ সম্পর্কে ধারণা (Constructivism : Introduction to the concept)

৭.৩.১ নির্মিতিবাদ (Constructivism)

পিঁয়াজে, ডিউই, এডমন্ড হামেরি, ইভি গ্লসারফেল্ড, লেভ ভাইগটস্কি এবং জোসেফ নোভক প্রমুখ শিক্ষাবিদদের শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণার মধ্য দিয়ে শিখনে নির্মিতিবাদের প্রবেশ ঘটেছে। নির্মিতিবাদ শিখনের একটি অত্যাধুনিক ধারণা যা সম্পূর্ণভাবে

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। নির্মিতিবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে জ্ঞান নির্মাণ করে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান সংগঠিত করে। সক্রিয়ভাবে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে ফল পায়, তার দ্বারাই জ্ঞান নির্মাণ করে। অর্থাৎ শিক্ষক জ্ঞান সরবরাহ করেন না, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই জ্ঞান গঠন করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যে-কোনো বিষয় নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করে এবং নিজের মতো করে মানসিক প্রতিকল্প গঠন করে। এই নিজের মতো করে জ্ঞান সৌধ নির্মাণ করার প্রচেষ্টাই হল নির্মিতিবাদের মূল কথা। Constructivist learning theory says that all knowledge is constructed from a base of prior knowledge. Therefore children learn best when they are allowed to construct a personal understanding based an experiencing things and reflecting on those experiences.

বহির্জগতের অভিজ্ঞতা → আত্তীকরণ → পুনর্নির্মাণ → জ্ঞান

নির্মিতিবাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Constructivism)

(১) শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
(২) প্রতিচ্ছবি নির্মাণ
(৩) সংযোগ স্থাপন
(৪) বিষয় উপলব্ধি

(১) **শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা :** নির্মিতিবাদ শিখনের প্রথম শর্ত — শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা। সক্রিয়তা বলতে বোঝায় বিষয় উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টা। শিখনে সফলতা আনতে হলে প্রথমেই শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। শিখন-পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা কৌতূহলী হবে এবং তাদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি হবে, তারা আগ্রহী ও মনোযোগী হয়ে উঠবে।

(২) **প্রতিচ্ছবি নির্মাণ :** ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক ঘটলে, শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে নতুন তথ্যটিকে দেখে, শুনে, প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে একটি প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে। এই প্রতিচ্ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ তথ্য বাছাই করা হয়।

(৩) **সংযোগ স্থাপন :** স্মৃতিতে সংরক্ষিত পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই প্রতিচ্ছবির সংযোগ স্থাপন করা হয়।

(৪) **বিষয়ের উপলব্ধি :** একই বিষয়ের উপলব্ধি বিভিন্ন শিক্ষার্থীর কাছে বিভিন্ন। এই বিষয়ের উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ ও মনোযোগের ওপর নির্ভর করে। জানা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন তথ্য সংযোজনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, প্রেষণার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শিক্ষার্থী নিজস্ব সক্রিয়তার মাধ্যমে পুরাতন জ্ঞানের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে নতুন তথ্য সংযোজিত করে নতুন ধারণা গড়ে তুলে জ্ঞান-সৌধের সম্প্রসারণ ঘটায়।

শিশুর অভিজ্ঞতা + সক্রিয় অংশগ্রহণ + নতুন ধারণা = জ্ঞান নির্মাণ

নির্মিতিবাদের মূল সূত্র :

(১) আগে তথ্য, পরে তত্ত্ব
(২) তথ্যের উৎস, তথ্যের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে কর্ম পরিকল্পনা স্থির করা হবে।
(৩) শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে নিজেরা নিজের মতো করে তথ্য অনুসন্ধান ও অনুধাবণ করবে।
(৪) দলগত কাজের সুযোগ, পারস্পরিক মত বিনিময়।
(৫) পূর্বের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন।
(৬) নতুন ধারণা গঠন।
(৭) জ্ঞান-সৌধের সম্প্রসারণ।

৭.৩.২ পিঁয়াজের তত্ত্ব (Piaget's Theory)

শিখন : পিঁয়াজের মতে, ''শিখন হল কোনো বস্তু সম্পর্কে প্রাকৃতিক এবং যৌক্তিক অভিজ্ঞতা এবং তার প্রতিক্রিয়া।" শিখন তখনই সম্ভব হয় যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে সেই শিখনের জন্য যে মানসিক গঠনের প্রয়োজন, শিক্ষার্থী যদি সেই স্তরে উপনীত হয়ে থাকে।

প্রজ্ঞামূলক বিকাশ (Cognitive Development) : প্রজ্ঞার বিকাশ বলতে সাধারণত মস্তিষ্কের গঠনতন্ত্র ও চিন্তনের বিকাশকে বোঝায়। প্রজ্ঞামূলক বিষয়ের মধ্যে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন— ভাষা, মানসিক প্রতিবিম্ব, চিন্তন, যুক্তিযুক্ত বিচার ক্ষমতা, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা এবং মস্তিষ্কের বিকাশ।

পিঁয়াজের তত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহ (Basic Assumption of Piagets Theory)

সুইস (Swiss) মনোবিদ জাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget) প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ধারণার প্রবক্তা। সাইমন বিঁনের (Simon Binet) সাথে কাজ করার সময় পিঁয়াজে লক্ষ করেন যে শিশুরা কোনো অবস্থাতেই বয়স্কদের থেকে কম বুদ্ধিমান নয়, শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে মূল তফাৎ হল তারা কীভাবে চিন্তা করে এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন। 'আমরা কীভাবে শিখি' বা 'আমাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ কীভাবে হয়'— এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পিঁয়াজে প্রথম একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারণার জন্ম দেন যা পরে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রভাবিত করে। পিঁয়াজে তার প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি ধারণার কথা বলেছেন যেগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

(১) স্কিমা (Schema)

স্কিমা (Plural schemata or schemas) ধারণাটি প্রথম পাওয়া যায় ইম্যানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant)-এর দর্শনে। পরবর্তীতে পিঁয়াজে 'স্কিমা' শব্দটি তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্বে ব্যবহার করেন 1923 সালে। পরবর্তীতে Fredrick Burtlett ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বর্তমান মনোবিজ্ঞানে Schema হল অর্জিত তথ্যের সংগঠন যা মস্তিষ্কে জমা থাকে। এই তথ্য সরল বা জটিল উভয়ই হতে পারে। স্কিমা কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এককের সমষ্টি। স্কিমার গঠন সাধারণত অভিজ্ঞতানির্ভর এবং স্কিমা সর্বদা পরিবর্তনশীল একটি বিষয়। তথ্যের মধ্যে যত বেশি সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকবে এবং অভিজ্ঞতা যত শক্তিশালী হবে, ব্যক্তির স্কিমাও তত ভালো হবে। সমগ্র জীবন ধরেই এই স্কিমা সঞ্চিত হয় ও সম্প্রসারিত হয়।

স্কিমা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। যথা— অভিযোজন (Adaptation) এবং সংগঠন (Organisation)। অভিযোজন আবার দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত হয়। যথা— আত্তীকরণ (Assimilation) এবং সহযোজন (Accommodation)।

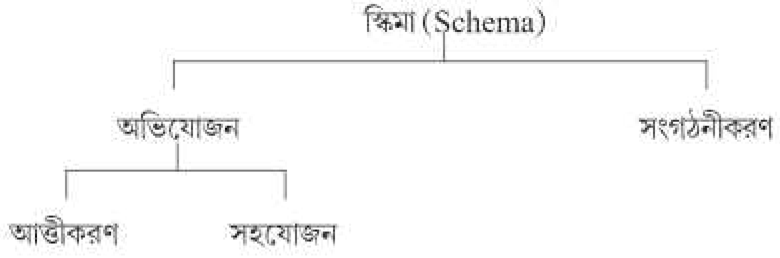

(2) অভিযোজন (Adaptation)

অভিযোজন মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। অভিযোজন দুটি প্রক্রিয়াতে সম্পন্ন হয়— আত্তীকরণ ও সহযোজন। যখন শিক্ষার্থী কোনো নতুন তথ্য, চিন্তা, বা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, তখন তা সরাসরি অভিযোজিত হয়ে তার স্কিমাতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং স্কিমার সম্প্রসারণ ঘটে। এটি হল আত্তীকরণ।

আবার অনেক সময় নতুন তথ্য, চিন্তা বা অভিজ্ঞতা বর্তমান স্কিমা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না, সমস্যা দেখা দেয়। তখন সেই তথ্যের, চিন্তার বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে বর্তমান স্কিমার সাথে অভিযোজিত করা হয়, ফলে পুনরায় সাম্যাবস্থা ফিরে আসে এবং স্কিমা সম্প্রসারিত হয়। এটি হল সহযোজন। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে অভিযোজন প্রক্রিয়াটি দেখানো হল :

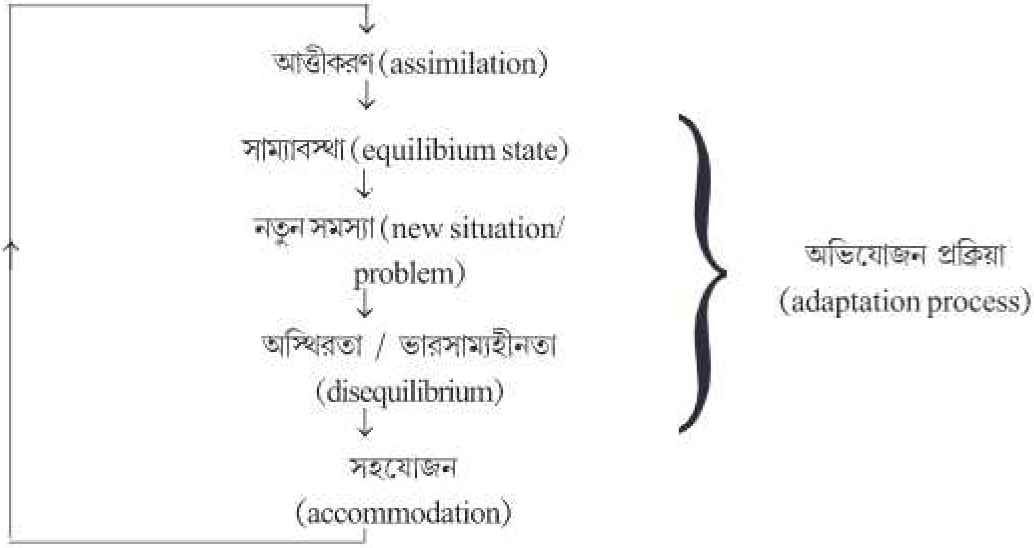

(৩) সংগঠন (Organisation)

স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনসমূহ সংগঠিত হয়ে আরও জটিল চিন্তামূলক কাজ করতে সক্ষম হয়। একেই সাংগঠনীকরণ বলে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বই পাঠ করতে গেলে ঠিকমতো বই ধরতে হবে, পাতা উলটাতে হবে এবং চোখ সঞ্চালন করতে হবে। এই তিনটি সংবেদন-চালকমূলক প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করেই বই পড়ার কাজটি করা সম্ভব। তথ্যের আত্তীকরণের সাথে স্কিমা সম্প্রসারিত ও সংগঠিত হয়। এই সংগঠিত তথ্যসম্বলিত স্কিমা অনেক জটিল চিন্তামূলক কাজ করতে সক্ষম হয়, এটি সংগঠন নামে পরিচিত, উদাহরণ হিসাবে গাড়ি চালনার ধারণা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, গাড়ি খোলা ও বন্ধ করা, চালু করা, আয়না, লাইট, ব্রেক ইত্যাদি পরীক্ষা করা, গিয়ার পরিবর্তন ও আরও অনেক সরল ছোটো ছোটো কাজের স্কিমা একত্রিত হয়ে গাড়ি চালানোর মতো একটি জটিল কাজ সম্পন্ন করে।

পিঁয়াজে প্রস্তাবিত প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তর (Piaget's stages of Cognitive Development)

Piaget প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে চারটি স্তরের কথা বলেছেন :

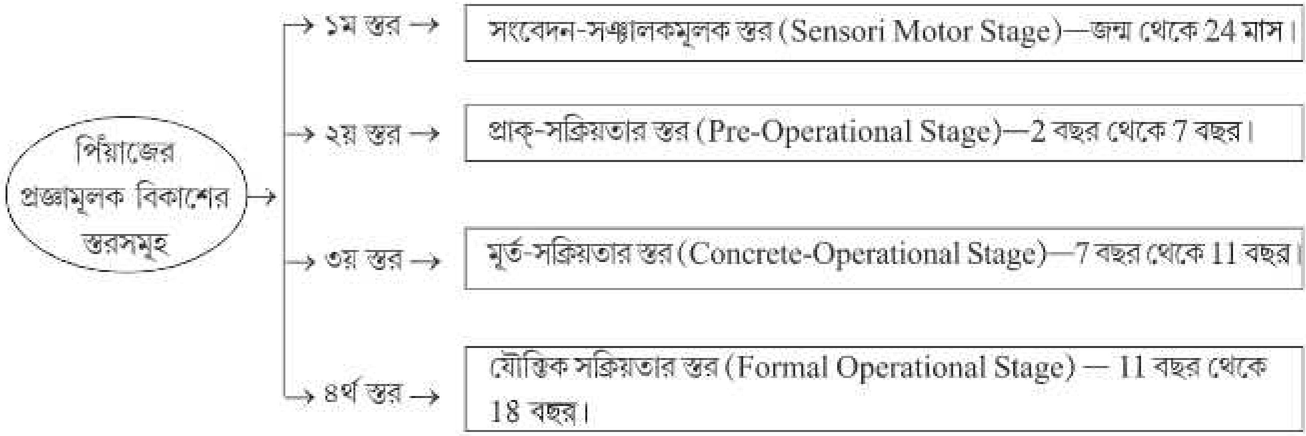

(১) সংবেদন-সঞ্চালকমূলক স্তর (Sensori Motor Stage)

এটি হল পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের প্রথম স্তর। এই স্তরের বয়সসীমা জন্ম সময় থেকে প্রায় ২ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই সময় প্রজ্ঞার খুব দ্রুত হারে বিকাশ প্রথম স্তর। শিশু তার ইন্দ্রিয়গত স্থান ও দেহ সঞ্চালনের দ্বারা বহির্জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

এই স্তরের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য হল :

১. জন্মের প্রথম মাসের মধ্যে শিশু সাধারণত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরের উদ্দীপককে সাড়া দেয়।

২. জন্মের পর ১-৪ মাসের মধ্যে শিশুর চক্রাকার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়,— অর্থাৎ শিশু যে কাজে আনন্দ পায়, তারই চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি করে।

৩. এই স্তরের শেষের দিকে শিশুর মানে সাংকেতিক চিন্তনের বিকাশ শুরু হয় বা পরবর্তী বিকাশ স্তরকে প্রভাবিত করে।

৪. শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার বিকাশ ঘটে এবং শিশু নিজেকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে।

৫. এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বস্তুর স্থায়িত্ব (Object permanence) সম্পর্কে শিশু কাল্পনিক অনুমান ও মানসিক চিত্র অঙ্কন। যদি কোনো বস্তুকে শিশুর সামনে লুকিয়ে রাখা হয়, তাহলেও সে বুঝতে পারে যে বস্তুটি আছে। যদিও প্রাথমিকভাবে তার আচরণ থেকে এটা মনে হয় বস্তুটি সত্যিই হারিয়ে গেছে।

(২) প্রাক্-সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational Stage)

প্রজ্ঞামূলক বিকাশের এই স্তরটি শিশুর ২ বৎসর বয়স থেকে ৭ বৎসর বয়সের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই স্তরে শিশুর চিন্তন একটি সাংকেতিক স্তরে থাকে যদিও তারা কোনরকম প্রজ্ঞামূলক সক্রিয়তা দেখাতে পারে না। শিশুর চিন্তন এই স্তরে সক্রিয় পূর্ববর্তী স্তরে থাকে (প্রাক্ /Pre) অর্থাৎ শিশু এই সময় যুক্তিপূর্ণ এবং অধোগামী চিন্তা-ভাবনা করতে ব্যর্থ হয়।

এই স্তরের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য হল :

১. শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতার চিন্তা (Egocentricism) এখানে বর্তমান থাকে।

২. শিশু ভাষার ব্যবহার শুরু করে এবং বর্হিজগতের সাথে আরো ভালোভাবে নিজেকে পরিচিত করতে শেখে। অর্থাৎ বাস্তববাদের (Realism) সৃষ্টি হয়।

৩. একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উপরে শিশু মনসংযোগ করে। একই সময়ে একাধিক বস্তুর কথা ভাবনার ক্ষেত্রে তার সমস্যা দেখা দেয়।

৪. এই স্তরের শুরুতে শিশুদের মধ্যে খেলার প্রবণতা দেখা দেয় কিন্তু তারা সমান্তরাল খেলা (parallel play) খেলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অর্থাৎ তারা খেলার ঘরে অন্যদের সাথে খেলার পরিবর্তে নিজের মতো করে নিজের খেলা খেলতে পছন্দ করে।

৫. শিশুদের ভানমূলক খেলা (Pretended play) খেলতে দেখা যায়। অনেক সময় তারা কাল্পনিক চরিত্রদের (যেমন superheroes) কমিকস্ চরিত্রর (comic character) সাথে খেলা করে।

৬. শিশু সর্বপ্রাণবাদে (Animism) বিশ্বাস করে অর্থাৎ সে ভাবে যে নির্জীব বস্তুর (inanimate object) মধ্যেও যেমন পুতুল, টেডি ইত্যাদির মধ্যে মানুষের মতো প্রাণ ও অনুভূতি আছে।

৭. শিশুর মধ্যে কৃত্রিমতাবাদ (Artificialism) দেখা যায়। সে বিশ্বাস করে যে পরিবেশের অনেক কিছুই মানুষের সৃষ্টি।

(৩) মূর্ত-সক্রিয়তায় স্তর (Concrete-Operational Stage)

পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তৃতীয় স্তর হল মূর্ত-সক্রিয়তা স্তর যা শিশুর 7 বৎসর থেকে 11 বৎসর বয়স পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এই স্তরে শিশুর সংগঠিত ও যুক্তিবদ্ধ চিন্তার বিকাশ ঘটে। প্রজ্ঞা বিকাশের ক্ষেত্রে এই স্তরের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ শিশু এই স্তরে যুক্তিসম্মত চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে। শিশুর মধ্যে সংরক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং সে উর্ধ্বগামী বা অধোগামী চিন্তাভাবনা করতে পারে। যদিও শিশু এই স্তরে সাধারণত কোনো বিমূর্ত বা প্রকল্পিত (Abstract or hypothetical) চিন্তা করতে পারে না, তাই স্তরটির নাম মূর্ত (Concrete) সক্রিয়তার স্তর।

এই স্তরের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য হল :

১. শিশুর মধ্যে সংরক্ষণ বোধ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সে বুঝতে পারে যে-কোনো বস্তুর বাহ্যিক বা দৃশ্যগত পরিবর্তন ঘটলেও মূল বস্তুটির পরিবর্তন হয় না, একই থাকে। এই বোধ কেই বলে সংরক্ষণ (conservation)

২. একাধিক সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বস্তুর মধ্য থেকে শিশু বস্তুকে গুণগত বা আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক করতে পারে এবং সমদৃশ্য দলকে এক করতে পারে। শিশুর এই বোধকে শ্রেণিকরণ বলে (classification)।

৩. শিশুর মধ্যে ক্রমপর্যায় (Seriation)-এর ধারণা গড়ে ওঠে।

৪. শিক্ষার্থী উল্টোমুখী গণনা বা চিন্তন করতে সমর্থ হয়।

৫. শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাতত্ত্বের ধারণা গড়ে ওঠে, সে সংখ্যার সংরক্ষণ করতে পারে।

(৪) যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (Formal-Operational Stage)

পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের চতুর্থ তথা শেষ স্তর হল যৌক্তিক-সক্রিয়তার স্তর। এই স্তরটি আনুমানিক 11 বৎসরের পর থেকে শুরু হয় এবং সাবালকত্ব বা পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই স্তরে শিশু বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে এবং তার সৃজনীমূলক চিন্তাভাবনাকে নিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারে।

এই স্তরের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১. শিশুরা বিমূর্ত ও প্রকল্পিত চিন্তনে সমর্থ হয়।

২. অবরোহী চিন্তনের (Deductive Thinking) সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুক্তিপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে।

৩. অনভিজ্ঞ বিষয় সম্পর্কে তারা ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারে।

৪. পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বস্তুর যথার্থতা প্রমাণ করতে পারে।

৫. সামাজিক, নৈতিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকে শিক্ষার্থীর মূর্ত ও বিমূর্ত চিন্তা বৃদ্ধি পায়।

৭.৩.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে পিঁয়াজের তত্ত্বের গুরুত্ব (Educational Impact of Piaget's Theory)

মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। পিঁয়াজে তার তত্ত্বে একটি সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রজ্ঞার বিকাশের ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে পিঁয়াজের তত্ত্বের মূল ধারণাগুলি হল—

১. বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা বা স্তর রয়েছে। সকলকে নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বিকাশ সরল থেকে জটিলের দিকে বিকশিত হয়।

২ অভিযোজন এবং সাংগঠনীকরণের মধ্য দিয়ে জ্ঞান তথা প্রজ্ঞার বিস্তার ঘটে। প্রজ্ঞার বিকাশের সব স্তরে এগুলি কার্যকর থাকে।

৩. প্রজ্ঞার বিকাশের চারটি স্তর রয়েছে। প্রজ্ঞা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ক্রমাগত ধীরভাবে স্থানান্তরিত হয়। প্রতিটি স্তর অদ্বিতীয় এবং অনন্য শিখন তথা চিন্তন প্রণালী নিয়ে গঠিত।

৪ পিঁয়াজের তত্ত্বে শিক্ষার্থীর চিন্তন ফলাফলের থেকে তার চিন্তন পদ্ধতির উপর অনেক জোর দেওয়া হয়েছে।

৫. পিঁয়াজে বিকাশের ধারাতে ব্যক্তিগত পার্থক্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

৬. স্ব-শিখনে এবং শিখন কর্মে শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয়েছে।

৭. পিঁয়াজে শিশুকে বয়স্কদের মতো করে ভাবনার ধারাকে প্রত্যাখান করেছেন।

৭.৪ ভাইগটস্কির তত্ত্ব (Vygotsky's Theory)

নির্মিতিবাদে যে রূপগুলি পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে সামাজিক নির্মিতিবাদ অন্যতম। রাশিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ লেভ ভাইগটস্কি (Lev Vygotsky; 1896-1934)-কে আমরা সামাজিক নির্মিতিবাদের জনক বলতে পারি। Vygotsky প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা, সামাজিক আদানপ্রদান ও সামাজিক প্রেক্ষিতের উপর প্রাধান্য দেন। পিঁয়াজের (Piaget) সমসাময়িক হয়েও তিনি প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সামাজিকতার প্রভাবকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভাইগটস্কির সমাজ নির্মাণবাদের ধারণা বা মূলনীতি (Basic Theories or Principles of Social Constructivism by Lev Vygotsky)

সামাজিক নির্মিতিবাদের ক্ষেত্রে ভাইগটস্কির মুল ধারণাগুলি হল :

ক) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction)

ভাইগটস্কির মতে প্রজ্ঞার বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মৌলিক ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। ভাইগটস্কি এখানে পিঁয়াজের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। Piaget-র মতে শিখনের পূর্বে বিকাশ অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটে। কিন্তু Vygotsky-র মতে সামাজিক শিখন বিকাশের পূর্বে ঘটে (Social Learning precedes Learning)। সমাজ-সংস্কৃতির এই বিকাশের ধারা দুটি স্তরে পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি ঘটে সামাজিক স্তরে। এই স্তরে শিশু সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিশু নিজের অভ্যন্তরে উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পূর্বতর জ্ঞান ও ধারণার বিকাশের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। ("Every function in the child's cultural development appears twice : first, on the social level, and later, on the individual level; first, between people (inter-psychological) and then inside the child (intra-psychological)" (source :Vygotsky, L. (1978). Interaction between Learning and Development. Readings on the development of Children, 23 (3), 34-41.)

খ) ভাষার বিকাশ (Language Development)

Vygotsky-র মতে যে-কোনো প্রকার সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভাষা language অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে-কোনো প্রকার সামাজিক প্রেক্ষিতে কথপোকথনের মূল স্তম্ভ হল ভাষা। Vygotsky-র মতে সাধারণত তিনটি স্তরে ভাষার এই বিকাশ ঘটে:

১ম স্তর : সামাজিক বা বাহ্যিক ভাষা (Social or External speech)

২য় স্তর : আত্মকেন্দ্রিক ভাষা (Egocentric speech)

৩য় স্তর : অন্তঃস্থিত বা অভ্যন্তরীণ ভাষা (Inner speech)

প্রথম স্তরে শিশু তার সীমাবন্ধ ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে তার খুব সাধারণ চিন্তাভাবনা (যেমন ক্ষুধা, আনন্দ, তৃপ্তি, অতৃপ্তি ইত্যাদি) প্রকাশ করে ও অন্যদের আচরণকে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয় স্তরে শিশুর ভাষার বিকাশ ও ব্যবহার মূলত নিজের আচরণকে নির্দেশ ও চালনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এবং তৃতীয় স্তরে, যেহেতু শিশু তার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ভাষার ব্যবহারের উপর দক্ষ হয়ে ওঠে, তাই এই স্তরে শিশুর ভাষার বিকাশ মূলত তার চিন্তন ও কর্মের দ্বারা প্রকাশিত হয়। শিশু এই স্তরে উচ্চতর মানসিক কার্যকলাপে (যেমন-মানসিক গণনা, ভাবনা ইত্যাদি) নিজেকে প্রস্তুত রাখে।

অর্থাৎ ভাষার বিকাশ ব্যক্তিকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত পোষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং প্রজ্ঞা বিকাশের গতির ক্ষেত্রে বা প্রজ্ঞার ব্যবহারিক কার্যকারীতার ক্ষেত্রে ভাষার অবদান অনস্বীকার্য।

গ) The More Knowledgeable Other (MKO)

MKO বলতে এমন একজনকে বোঝায়, যে, শিক্ষার্থীর (learner) থেকে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথাকথিতভাবে অধিক জ্ঞানের বা দক্ষতার অধিকারী। সাধারণ অর্থে একজন শিক্ষার্থী MKO বলতে একজন শিক্ষক, উর্ধ্বতন শ্রেণির কোনো ব্যক্তি, অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো সাথী বা সমাজের বয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে মনে করতে পারে। কিন্তু বর্তমান ডিজিটাল (Digital) যুগে কম্পিউটার (computer) বা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন কোনো যন্ত্র (machine) যেমন-রোবট (Robot)-কেও আমরা MKO বলতে পারি।

ঘ) নৈকট্য বিকাশের সীমা (Zone of Proximal Development or ZPD)

সামাজিক নির্মিতিবাদের ক্ষেত্রে Vygotsky-র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল Zone of Proximal Development (ZPD) বা নৈকট্য বিকাশের সীমা। Vygotsky-র মতে ZPD হল "the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem-solving under adult guidance, or in collaboration with more capable peers." (Vygotsky, 1978, p.86)। শিশু নিজের চেষ্টায় কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারে। আবার এমন কিছু সমস্যা থাকে, যা সে নিজের ক্ষমতায় বা চেষ্টায় করতে পারে না। তার নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞান বা দক্ষতা সম্পন্ন (এক্ষেত্রে MKO) কারোর সাহায্য তার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ZPD হল বিকাশের ধারার সেই দুটি স্তরের দূরত্ব বা পার্থক্য যেখানে শিশু স্ব-চেষ্টায় সমস্যার সমাধান করে (প্রকৃত বিকাশের স্তর বা Actual development level) এবং যে স্তরে শিশু MKO-র সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে (সম্ভবনাময় স্তর বা potential devemopment level)। ZPD- ই হল প্রকৃত শিখনের ক্ষেত্র। MKO এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সীমাবন্ধ সহায়তাকারীর কাজ করে। কখনোই পূর্ণ সহায়ক-এর ভূমিকা পালন করে না। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে ZPD ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

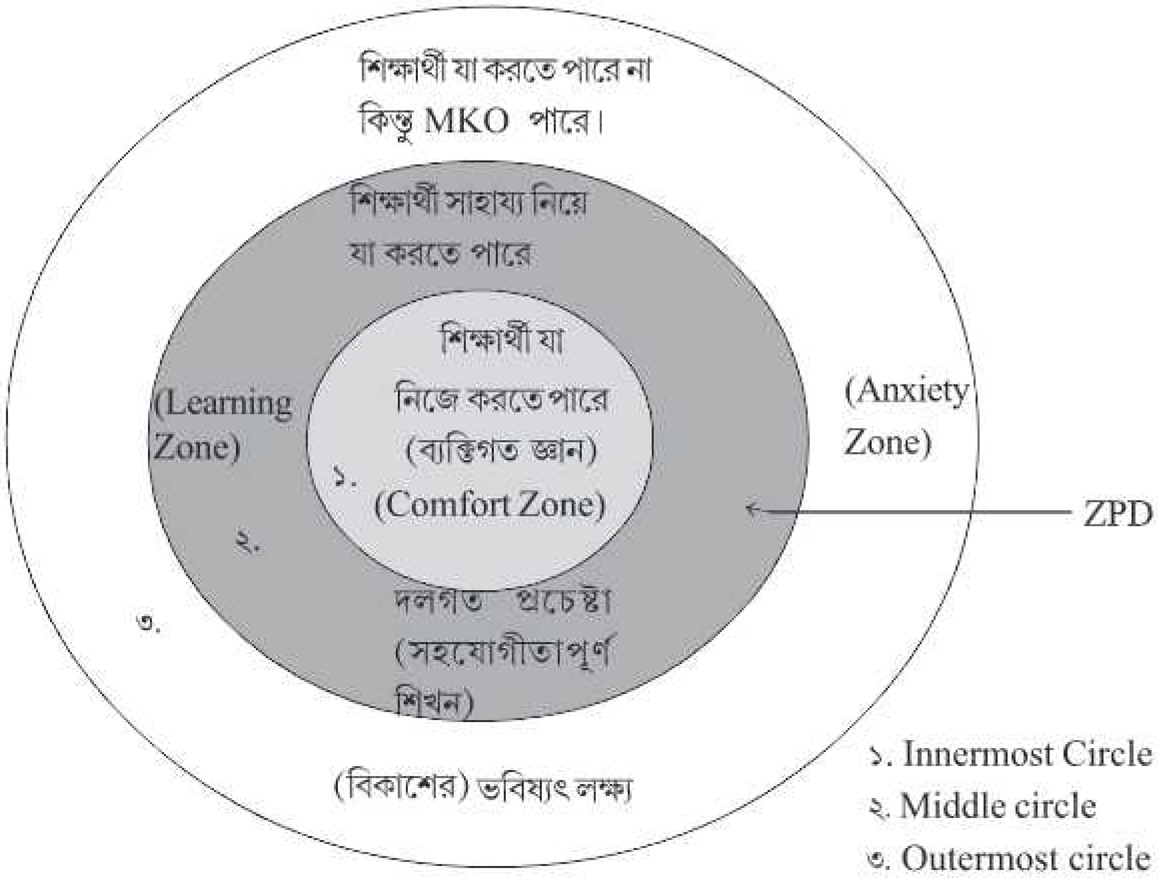

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, MKO-অপরিবর্তিত থাকলেও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা বিভিন্ন হতে পারে। যেমন-একই শিক্ষকের নিকট পাঠরত শিক্ষার্থীদের বিকাশের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়।

ঙ) ভারাবন্ধন (Scaffolding)

Vygotsky-পরবর্তী বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিকগণ পরবর্তীকালে ZPD-র তত্ত্ব প্রসঙ্গে 'Scaffolding' বা 'ভারাবন্ধন' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'Scaffolding' শব্দটি Dr. Jerome Bruner-এর উদ্ভাবন। Scaffolding একটি শিখন সহায়ক পদ্ধতি। Vygotsky বিশ্বাস করতেন যে একজন শিক্ষাবিদ বা MKO, একজন অনভিজ্ঞ বা নতুন শিক্ষার্থীকে ZPD-র মধ্য দিয়ে চালনা করার সময় অতি অবশ্যই শিখনে সহায়তা করবেন যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, বোধ ও দক্ষতার যথাযথ বিকাশ ঘটে এবং শিক্ষার্থী শিখনে আনন্দ ও অণুপ্রেরণা পায়। Scaffolding-এর উদ্দেশ্য হল যথা সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে তথ্য সরাবরাহ করে শিখনে সহায়তা করা এবং শিক্ষার্থীকে সাবলম্বী করে তোলা। শিখনের অগ্রগতির সাথে সাথে সহায়তার পরিমাণ ব্যাস্তনুপাতে কমতে থাকে। অত্যাধিক সহায়তা শিক্ষার্থীকে নির্ভরশীল করে তুলতে পারে। তাই Scaffolding-এর ক্ষেত্রে MKO অতি অবশ্যই সতর্ক ও যত্নবান হবেন। Vygotsky বিভিন্ন Psychological Tool এবং Symbol-এর কথা এই প্রসঙ্গে বলেছেন। যেমন-ভাষা (language), মানচিত্র (Map), চিত্রাঙ্কন (Diagram), নেমোনিক কৌশল (Mnemonic Techniques), গণন প্রক্রিয়া (Counting System) ইত্যাদি।

- **ভাইগটস্কির তত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্ব (Educational Implication of Vygotsky's Theory)**

Vygotsky-র তত্ত্ব ও তার ধারণাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। Vygotsky-র তত্ত্বে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বিদ্যালয় পরিবেশ ও পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের ভাষা বিকাশের সেই সুযোগ দিতে হবে যাতে করে তারা ভাষা বিকাশের তৃতীয় স্তরে (inner speech) পৌঁছাতে পারে এবং তাদের উচ্চতর মানসিক চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। ZPD ধারণাটি বর্তমানে আরও বৃহৎ হয়ে ZPTD (Zone of Proximal Teacher Development)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশের জন্য ও তাকে শিখনে সাবলম্বী করে তুলতে শিক্ষক ক্লাসরুমে প্রকৃত Facilitator হয়ে ওঠেন। Scaffolding এর দ্বারা শিক্ষক একটি বৃহৎ বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরে ভাগ করে শিক্ষার্থীকে ইঙ্গিত বা আভাসদানের মাধ্যমে তার বিকাশ সাধিত করবেন। কোনো বিষয় শিখন বা পঠনের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে পরিকল্পিতভাবে ভেঙে গঠন করা, ছোটো ছোটো ধাপ তৈরি করাও একটি নির্দেশনামা Scaffolding-এর দ্বারা সম্ভব।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে Vygotsky-র সামাজিক নির্মিতিবাদের তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে তথা শিশুর বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশু সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, ভাষার বিকাশ ও সমাজের অনান্যদের সান্নিধ্যে এসে নিজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিকাশ সাধিত করে এবং নিজের মধ্যে জ্ঞান তথা প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটায়।

৭.৫ জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা, ব্যক্তিগত এবং সমাজ-সংস্কৃতির পার্থক্য, শিখনে অসুবিধা, অন্তর্ভুক্তি এবং বহির্ভুক্তি ও তাদের প্রভাব (Individual and Socio-cultural Difference in Cognitive understanding, Learning difficulties, Term of Exclusion and Inclusion and their Impact)

জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা (cognitive understanding) নির্মাণবাদের ধারণার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই জ্ঞানমূলক বোধগম্যতার দুটি দিক বর্তমান—প্রথমত, ব্যক্তিগত দিক যার প্রবক্তা হলেন জাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget) এবং দ্বিতীয়ত, সমাজ-সংস্কৃতি মূলক ধারা যারা প্রবক্তা হলেন লেভ ভাইগটস্কি (Lev Vygotsky)।

- **ব্যক্তি পার্থক্য ও জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা (Individual difference and Cognitive understanding)**

জ্ঞান ব্যক্তির নিজের সৃষ্টি। শিক্ষার্থী তার পূর্বতন অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে জ্ঞান নির্মাণ করে। ব্যক্তিগত স্কিমা (Schema) এখানে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্বিশেষে (Individual Difference) শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানমূলক বোধগম্যতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে হাওয়ার্ড গার্ডনারের (Howard Gardner) এর 'বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা' বা Multiple Intelligences-এর ধারণাটি খুবই যুক্তিপূর্ণ। গার্ডনার তার "Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences" (1983) বইতে বলেছেন যে শিখন কৌশলের উপর নির্ভর করে ব্যক্তির মধ্যে সাত (Seven) প্রকারের বুদ্ধিমত্তা দেখা যেতে পারে। এগুলি হল : 1. Visual-Spatial Intelligence 2. Linguistic Intelligence 3. Musical-Intelligence 4. Logical-Mathematical 5. Bodily-Kinesthetic Intelligence 6. Intrapersonal এবং 7. Interpersonal. অর্থাৎ ব্যক্তিগত তারতম্যের পার্থক্যে জ্ঞানমূলক বোধগম্যতাও পরিবর্তিত হয়।

সমাজ-সংস্কৃতির পার্থক্য এবং জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা (Socio-Cultural Difference and Cognitive understanding)

জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা আবার সমাজ-সংস্কৃতির পার্থক্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর কাছে তার জ্ঞানের একটি বৃহৎ উৎস হল সমাজ-সংস্কৃতি। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, ভাষা, পরিপার্শ্বিক পরিবেশ—সমস্তকিছুই শিশুর জ্ঞান নির্মাণে সহায়তা করে। বিভিন্ন মনোবিদ ও সমাজ তত্ত্ববিদদের মতে জন্মের সাথে সাথেই জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা ব্যক্তির মধ্যে শুরু হয় না; ব্যক্তি যখন বহির্জগতের সামনে (সমাজ) নিজেকে উন্মুক্ত করে জ্ঞান সঞ্চয় করে তখনই তার বোধগম্যতার জন্ম হয়। জ্ঞানের বিকাশ

বহুলাংশে এই সমাজ-সংস্কৃতি, সামাজিক আদানপ্রদান, রীতিনীতি ও বিভিন্ন সামাজিক দল ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। তাই সমাজ-সংস্কৃতিমূলক পার্থক্যের সাথে সাথে জ্ঞানমূলক বোধগম্যতারও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বহির্ভূক্তিকরণ ও অন্তর্ভুক্তকরণ শব্দের অর্থ এবং তাদের প্রভাব (Terms of Exclusion and Inclusion and Impact)

'Exclusion' ও 'Inclusion' শব্দদুটিকে বাংলায় অনুবাদ করলে যে অর্থ আসে তা হল 'বহির্ভূতকরণ' এবং অন্তর্ভুক্তকরণ। বর্তমান শতাব্দীতে শব্দগুলির ব্যাপকতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে শব্দ দুটি সমাজবিদ্যা, শিক্ষা, মনোবিদ্যা, অর্থনীতি এমনকি রাজনীতিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বহির্ভূক্তিকরণ (Exclusion)

বহির্ভূক্তিকরণ শব্দটির ব্যবহার মূলত সমাজ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটির প্রথম ব্যবহার ঘটে ফ্রান্সে। সমাজবিজ্ঞানে, সামাজিক নির্বাসন বা সামাজিক বহির্ভূক্তিকরণ বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলকে যারা বিভিন্ন কারণে সমাজের মূলস্রোত বা ধারা থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ এই সব ব্যক্তি বা দল অন্যান্য সাধারণ নাগরিকের মতো সমাজে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা, অধিকার, সম্পদ ইত্যাদির আহরণের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হন বা প্রত্যাখ্যাত হন। সামাজিক বহির্ভূতকরণের মূল কারণগুলি হল রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সংস্কৃতি মূলক বহির্ভূতকরণ। বহির্ভূতকরণ একই সাথে একটি প্রক্রিয়া এবং উৎপন্ন ফলাফল। Exclusion এর মূলত চারটি উপাদান বর্তমান। এগুলি হল :

১. যারা বঞ্চিত হচ্ছে সেই ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী

২. যে প্রতিনিধি বা মাধ্যমের (Agent or Agency) কাজের ফল হিসেবে এই বহির্ভূতকরণ ঘটছে।

৩. সেই সংস্থা বা সমাজ যেখান থেকে তাদের বহির্ভূক্তিকরণ ঘটছে এবং

৪. যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির মাধ্যমে পুরো বিষয়টি সাধিত হচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আবার বহির্ভূক্তিকরণ বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়াকে যেখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও অন্যান্যদের সাধারণ শিশুদের থেকে আলাদা করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

বহির্ভূক্তিকরণের প্রভাব (Impact of Exclusion)

১. বহির্ভূক্তিকরণ বিভিন্ন বঞ্চনার জন্ম দেয় যেমন—আর্থিক, সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক বা শিক্ষাগত।

২. বহির্ভূক্তিকরণের ফলে সমাজে অসাম্য, দারিদ্রতা ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটে।

৩. সমাজে প্রান্তিকীকরণ (marginalization) দেখা দেয় ও সমাজ কালিমালিপ্ত হয়।

৪. সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তিদের মধ্যে ভীতির জন্ম হয় ও তারা জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, স্বাধীনতাবোধ ব্যাহত হয়।

৫. সর্বোপরি জীবনযাত্রার মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে

অন্তর্ভূক্তিকরণ (Inclusion)

বহির্ভূক্তিকরণের ঠিক বিপরীত হল অন্তর্ভূক্তিকরণ বা Inclusion। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মধ্যে সকলকে নিয়ে মিলেমিশে থাকার মধ্যেই তার আনন্দ। ইহাই হল inclusion-এর মূল কথা। কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীকে সমাজসিদ্ধ প্রথাগত রীতিনীতি এবং ক্রিয়াকলাপে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করানোর মধ্য দিয়েই সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ ঘটে। Social Cohesion বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের কাছে আসে। আন্তঃসম্পর্কে বৃদ্ধি ঘটে এবং সংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিকরণ এখন অধিক হারে প্রচলিত। সমস্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, পিছিয়ে পড়া বা অক্ষম শিশু—সকলকে একসাথে প্রথাগত বিদ্যালয়ে সমাজের অন্যান্য সাধারণ শিশুদের সাথে বসিয়ে পাঠের ব্যবস্থা করাই হল শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তিকরণ। সমস্ত সম্প্রদায়ের ও ভিন্ন সক্ষমতার মানুষকে সমাজ তথা শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি না করাতে পারলে সমাজের অগ্রগতি যেমন বাধাপ্রাপ্ত হবে, তেমনই মানুষের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটবে না।

অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রভাব (Impact of Inclusion)

১. এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে একাত্মতা অনুভব করে।

২. সমাজের মধ্যে একজন মূল্যবান দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার সুযোগ ঘটে।

৩. সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে।

৪. আত্মসত্ত্বা বজায় রেখে (For who they are) সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে

৫. বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে জীবন সুখকর ও স্বাস্থ্যকর হয়।

৬. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসবোধ ঘটে। জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটে। সমাজ প্রগতিশীল পথে এগিয়ে চলে।

৭.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

বাইরের জগতের অভিজ্ঞতার সঠিক আত্তীকরণ এবং পুনর্নির্মাণ হল জ্ঞান। পিঁয়াজে, ডিউই, এডমন্ড হামেরি, ই.ভি.গ্লসারফেল্ড, ভাইগটস্কি এবং জোসেফ নোডক প্রমুখ শিক্ষাবিদদের শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণার মধ্য দিয়ে শিখনে নির্মিতিবাদের প্রবেশ ঘটেছে। নির্মিতিবাদের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জ্ঞানমূলক বোধগম্যতার দুটি দিক আছে। ব্যক্তি জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা এবং সমাজ-সংস্কৃতি জ্ঞানমূলক বোধগম্যতা। ব্যক্তি জ্ঞানমূলক বোধগম্যতার স্রষ্টা হলেন পিঁয়াজে এবং সমাজ-সংস্কৃতি জ্ঞানমূলক বোধগম্যতার স্রষ্টা হলেন ভাইগটস্কি।

৭.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. ZPD-র পূর্ণ অর্থ হল—

(ক) Zone of Proximal Development (খ) Zone of Primary Development

(গ) Zone of Possible Development (ঘ) Zone of Proper Development

২. 'স্কিমা' হল__________ র ক্ষুদ্রতম একক

(ক) নৈতিক কাঠামো (খ) শারীরিক গঠন

(গ) জ্ঞানীয় কাঠামো (ঘ) মানসিক গঠন

৩. 'সামাজিক নির্মিতিবাদের' প্রবক্তা হলেন—

(ক) পিঁয়াজে (খ) বান্দুরা

(গ) স্কিনার (ঘ) ভাইগটাস্কি

৪. পিঁয়াজে প্রস্তাবিত প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তর সংখ্যা হল—

(ক) ৫টি (খ) ৬টি

(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৫. মূর্ত-সক্রিয়তা স্তরের বয়সসীমা হল—

(ক) ০-২৪ মাস (খ) ৭-১১ বছর

(গ) ১১-১৮ বছর (ঘ) ২-৭ বছর

B. অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. স্কিমা কী?

২. অভিযোজন বলতে কী বোঝ?

৩. নির্মিতিবাদ বলতে কী বোঝ?

৪. Jean Piaget-র নির্মিতিবাদ তত্ত্বের স্তরগুলি কী কী?

৫. সহযোজন কী?

৬. নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৭. প্রাক-সক্রিয়তা/মূর্ত সক্রিয়তা/যৌক্তিক সক্রিয়তা স্তরের শিক্ষাগত তাৎপর্য লেখো।

৮. সর্বপ্রাণবাদ কী? কৃত্রিমতা কী?

৯. ZPD বলতে কী বোঝানো হয়?

১০. Scaffolding কী?

১১. Vygotsky-র সামাজিক নির্মিতিবাদের দুটি প্রয়োগ উল্লেখ করো?

১২. অন্তর্ভুক্তিকরণ/বহির্ভুক্তিকরণ বলতে কী বোঝায়?

C. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. প্রাথমিক শিক্ষায় নির্মিতিবাদের ভূমিকা আলোচনা করো।

২. Jean Piaget-র প্রজ্ঞার নির্মিতিবাদের তত্ত্বটি আলোচনা করো। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব বর্ণনা করো।

৩. সামাজিক নির্মিতিবাদ সম্পর্কে Lev Vygotsky-র তত্ত্বটি আলোচনা করো। তত্ত্বটির শিক্ষাগত তাৎপর্য লেখো।

অধ্যায় ৮

খেলা
(Play)

৮.১ সূচনা (Introduction)

৮.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.৩ খেলার অর্থ : বৈশিষ্ট্য, ধরন এবং প্রকারভেদ (Meaning of play, Characteristics, kinds and types of play)

৮.৪ খেলার কাজ (Function of play)

৮.৫ শিশুদের খেলায় মিশ্র সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক পার্থক্য (Cross cultural and socio-economic differences in children's play)

৮.৬ খেলা ও দলগত সক্রিয়তা, খেলার নিয়মাবলি, খেলার মাধ্যমে শিশুদের আপোষ পদ্ধতি এবং বিরোধ মীমাংসার ধরন (Games and group dynamics, rules of games, and how children learn to negotiate differences and resolve conflict)

৮.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

৮.৮ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

৮.১ সূচনা (Introduction)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একসঙ্গে বসবাস, বেড়ে ওঠা এবং যোগ্যতার স্বীকৃতি পাবার জন্যই মানুষ সমাজ তৈরি করেছে। অন্যের সামনে নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে, নিজের স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা শিশুদের সহজাত ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি; প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে এমনকি বার্ধক্য অবস্থাতেও মানুষের এই ইচ্ছা শেষ হয়ে যায় না। দলগত কোনো খেলাতে অংশগ্রহণ বা প্রতিযোগিতাতে একজন খেলোয়াড়ের যেমন ইতিবাচক প্রতিযোগিতার মন তৈরি হয় তেমনি, কতকগুলো মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে। যেমন — সহযোগিতা, আনুগত্য, নেতাকে মেনে চলার মানসিকতা, জাতীয়তাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি। উপরোক্ত গুণগুলো সমাজজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলা বা ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে এইসব গুণগুলো করায়ত্ত করা সম্ভব। তাই, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

৮.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। খেলার অর্থ, বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২। খেলার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৩। শিশুদের শারীরিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাষাগত্ জ্ঞানমূলক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশের সাথে খেলার যোগসূত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৪। শিশুদের খেলার ক্ষেত্রে মিশ্র সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক ভিন্নতা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৫। খেলা এবং দলগত সক্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৬। খেলার নিয়ম, খেলার মাধ্যমে শিশুদের আপোষ পদ্ধতি এবং বিরোধ মীমাংসার ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৮.৩. খেলার অর্থ : বৈশিষ্ট্য, ধরন এবং প্রকারভেদ (Meaning of play, Characteristics, kinds and types of play)

খেলার অর্থ : খেলা মানুষের আদিম ও অকৃত্রিম আচরণ। খেলার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, খেলার মধ্যে মানসিক শক্তির প্রবাহ হয়। খেলার সময় কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে স্নায়বিক শক্তির প্রবাহ হয় এবং তার ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করি। তিনি খেলাকে একটি বিশেষ প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত না করে সাধারণ শক্তির প্রবাহ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, "Play is the outcome of the primal libido or vital energy flowing not in the channel of instinct, but over-flowing, generating a vague appetite for movement and finding outlet in any or all the motor mechanism in town." সুতরাং, ম্যাক্‌ডুগালের এই মতবাদ অনুসারে আমরা বলতে পারি, খেলা হল জীবনীশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র; এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এক নতুন পথের সন্ধান দেন। খেলাকে জীবনীশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ড্রিভার বলেছেন, খেলার আনন্দ খেলার মধ্যেই থাকে, শিশু খেলার মধ্যে আনন্দ পায়, আনন্দ পায় বলেই সে খেলে। তাঁর মতে, "In play the value and significance of the activity are found in the activity itself."

তাই আমরা বলতে পারি, খেলা হল মানুষের এক স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক এবং সৃজনাত্মক ক্রিয়া যার উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত (Play is a sponteneous, pleasurable activity; creative in nature and having some intrinsic value behind it.)।

৮.৩.১ খেলার বৈশিষ্ট্য (Characteristies of play)

খেলার একাধিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল। যথা—

- খেলা শিশুর সহজাত প্রবণতা।
- খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। খেলার জন্য কোনো শিশুকে অনুরোধ করতে হয় না।
- খেলা একপ্রকার স্বাধীন আচরণ। খেলা চলাকালীন শিশুর আচরণ বাধাপ্রাপ্ত হলে সে বাধা কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।
- খেলা মাত্রই সৃজনশীল। খেলার মধ্যে দিয়ে কোনো কিছু সৃষ্টি করার প্রবণতা চরিতার্থ হয়। অন্যের কাছে এই সৃষ্টির কোনো গুরুত্ব না থাকলেও শিশুর কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম।
- খেলা অনাবিল আনন্দের আধার। খেলা আনন্দদায়ক প্রক্রিয়া।
- খেলার মাধ্যমে নিয়ম মানার প্রবণতা গড়ে ওঠে। খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে থাকে।
- খেলা শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। খেলার মাধ্যমে শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কর্মসম্পাদন কৌশল রচনায় সাহায্য করে।
- খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটে।
- খেলার মাধ্যমে প্রাচীন অভিজ্ঞতার অনুশীলন ঘটে।

৮.৩.২ খেলার ধরন (Kinds of play)

National Institute of Play, ক্যালিফোর্নিয়া খেলাকে সাতটি ধরনে বিভক্ত করেছে। যথা—

- **ঐক্যবিধান খেলা (Attunement play) :** এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংযোগ গড়ে ওঠে। যেমন — সদ্যোজাত শিশুর সাথে মায়ের।
- **শারীরিক খেলা (Body play) :** এই ধরনের খেলার মাধ্যমে শিশু নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশের সাহায্যে বাহ্যিক পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। যেমন — মুখ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আনন্দদায়ক শব্দ করা, বারবার মাটিতে লাফ দিয়ে তার থেকে আনন্দ পাওয়া ইত্যাদি।

- **উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে খেলা (Object play) :** কৌতূহল মেটানোর জন্য পুতুল নিয়ে খেলা, রান্নার সামগ্রী নিয়ে খেলা ইত্যাদি।
- **কাল্পনিক ভূমিকাভিনয়মূলক খেলা (Pretended play) :** এই ধরনের খেলায় শিশু কোনো ঘটনার কাল্পনিক ভূমিকাভিনয়মূলক প্রয়োগ ঘটায়। যেমন— রাজা-রানী খেলা, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ইত্যাদি।
- **সামাজিক খেলা (Social play) :** এই সকল খেলায় একাধিক শিশু একসাথে মিলেমিশে কোনো খেলা করে। যেমন— ব্লক দিয়ে বাড়ি তৈরি, একসাথে কোনো মডেল তৈরি করা ইত্যাদি।
- **গল্প বলা খেলা (Story telling play) :** এই ধরনের খেলায় ভাষাশিক্ষা হয়। যেমন— পিতা-মাতা শিশুর কাছে জোরে জোরে নাটকীয় ভঙ্গিতে কোনো গল্প বলে; পরবর্তী সময়ে শিশু তার নিজের ভাষায় সেই গল্পটি আবার বলে।
- **সৃজনাত্মক খেলা (Creative play) :** এই ধরনের খেলার মাধ্যমে নতুন কোনো কিছুর সৃষ্টি হয়। যেমন— ছবি আঁকা, নতুনভাবে কোনো বাদ্যযন্ত্রকে বাজানো ইত্যাদি।

৮.৩.৩ খেলার প্রকারভেদ (Types of play)

Sara Smilansky (১৯৯০) শিশুদের খেলাকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

- Functional play : এই ধরনের খেলায় শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়।
- Conditional play : এই ধরনের খেলা শৈশবস্থায় শুরু হয়ে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত চলতে পারে। এই ধরনের খেলায় স্নায়ু সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় এবং সৃজনশীলতা দেখা যায়।
- Games with rule : এই ধরনের খেলায় শিশুর খেলার নিয়মাবলি সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। খেলায় নিয়মাবলি শিশু গ্রহণ করে এবং সেইমতো নিয়ম মেনে খেলতে থাকে।
- Dramatic play : এই ধরনের খেলায় শিশু তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে এবং কোনো কিছুকে অনুকরণ করে খেলতে থাকে।

৮.৪ খেলার কাজ (Function of play)

শিশুদের শারীরিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাষাগত, জ্ঞানমূলক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশের সাথে খেলার যোগসূত্র (Functions of play : Linkages with physical, social, emotional, language, cogintive and motor development of children)

খেলার কাজ বলতে এককথায় বলা যায় ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন। এই বিকাশসাধন কীভাবে হয় নিম্নে তার কয়েকটি আলোচনা করা হল।

৮.৪.১ শারীরিক বিকাশ ও খেলা (Physical development and Play) : শারীরিক উন্নতি হল খেলাধূলার প্রত্যক্ষ ফল। খেলাধূলায় নিয়মিত অংশগ্রহণের ফলে শিশুর পেশিসমূহ আয়তনে ও শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে শিশু সুঠাম, বলশালী দেহের অধিকারী হয়। পেশিসমূহের এই উন্নতিসাধন শিশুর কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। নিয়মিতভাবে খেলাধূলার ফলে পেশিসমূহের প্রকৃতিও বেশি পরিমাণ কাজ করার অনুকূল হয়ে পড়ে।

খেলাধূলার অভ্যাস শিশুর দেহভঙ্গিমার (Posture) উন্নতি ঘটায়। বিভিন্ন দেহভঙ্গিমার ত্রুটিগুলো (Postural defects) খেলাধূলায় নিয়মিত অংশগ্রহণের ফলে দূর হতে পারে।

খেলাধুলার কার্যসূচি শিশুর অঙ্গীয় সক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে শিশুর শারীরিক সুস্থতা ও কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অঙ্গীয় বিকাশ (organic development), ব্যক্তির রক্ত সংবহণতন্ত্র (circulatory system), পৌষ্টিকতন্ত্র (digestive system), রেচনতন্ত্র (excretory system), তাপ নিয়ন্ত্রণ (heat regulatory) প্রভৃতি তন্ত্রগুলোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে জড়িত। নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ফলে শিশু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং দীর্ঘসময় ধরে কোনো একটি কাজ করতে সক্ষম হয় অপেক্ষাকৃত কম শক্তি খরচ করে এবং তুলনামূলক বেশি কার্যকরীভাবে। সুতরাং, জীবনকে উপভোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অবস্থার গুরুত্ব অনেক বেশি। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অবস্থা শিশুকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার শক্তি ও সামর্থ্য জোগায়।

খেলাধুলার কার্যসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণের ফলে শিশুর শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শিশু এবং দেশ ও জাতি বর্ধিত সক্ষমতার অধিকারী হয়। যার জন্য দেশ বা জাতি উন্নত হয়।

৮.৪.২ সামাজিক বিকাশ ও খেলা (Social development and play) : সামাজিক বিকাশের প্রধান লক্ষ্য হল শিশুর নিজের, দলের এবং সমাজের সভ্য হিসাবে যোগ্যতা অর্জন। মেলামেশার মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্ক স্থাপনই হল সমাজের মূল ভিত্তি। মানবিক সম্পর্ক স্থাপন বা উন্নতিসাধনে খেলাধুলার ভূমিকা লক্ষণীয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল সমাজের সংক্ষিপ্ত রূপ। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে যথাযথ মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য শিশুদের ওপর জোর দেওয়া হয়। খেলাধুলার কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের প্রায় সর্বপ্রকার সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে। তাই খেলাধুলার কার্যসূচির মধ্য দিয়ে শিশু মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের যে ক্ষমতা লাভ করে তা ভবিষ্যতে তাকে সমাজের অন্যান্যদের সাথে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

খেলাধুলার কার্যসূচির মূল ভিত্তি হল অলিম্পিকের আদর্শ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। তাই স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-দলাদলি সমস্ত কিছুর উপরে মানবিক সম্পর্ককে স্থান দেয় খেলাধুলা। খেলাধুলার সূচির মধ্যে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সঠিকভাবে পরিচালিত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েও খেলাধুলা প্রতিযোগী খেলোয়াড়দের প্রতি যথাযথ মানবিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনে সাহায্য করে। খেলাধুলার সূচির একটি বৈশিষ্ট্য হল তার ব্যাপকতা; তাই খেলাধুলার কার্যসূচি শিশুকে যথোপযুক্ত অভ্যাসের মাধ্যমে সহপাঠীদের প্রতি যথাযথ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং শিক্ষকদের প্রতি ভয়বিহীন মধুর সম্পর্ক গঠনে সাহায্য করে।

সুতরাং, খেলাধুলার সূচি শিশুকে তার সহযোগী বন্ধুবান্ধব, প্রতিযোগী, বিপরীত লিঙ্গ, বিচারক, সংগঠক, শিক্ষক প্রভৃতি সকলের সাথে, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সাথে যথাযথ মানবিক সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। ফলে শিশু ভবিষ্যতে দেশের সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে।

৮.৪.৩ প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও খেলা (Emotional development and play) : প্রক্ষোভ বলতে বোঝায় কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক উত্তেজনাময় অবস্থা বা অনুভূতি। ব্যক্তি প্রতি পদক্ষেপে সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে মানিয়ে চলছে এবং তা সম্ভব হচ্ছে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঠিক বিকাশের জন্যই। একটি শিশু তার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কীভাবে নিজেকে মানিয়ে চলবে সেটিই তার সবথেকে বড় সমস্যা। খেলাধুলা শিশুর কোনো প্রবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক প্রক্ষোভের অনুশীলন করায়। ফলত প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শিশুর সুষম প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটে।

৮.৪.৪ ভাষাগত বিকাশ ও খেলা (Language development and play) : খেলা সবথেকে উৎকৃষ্ট মাধ্যম যার মাধ্যমে একটি শিশু বহির্বিশ্বের সাথে পরিচিত হয়। একটি শিশু খেলার মাধ্যমেই শেখে কীভাবে অন্যদের সাথে মিশতে হয়, কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে হয়, কীভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং কীভাবে ভাষাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হয়। খেলার মাধ্যমে শিশু যেমন বিভিন্ন কলাকৌশল শেখে, তার থেকেও বড় তার ভাষার সঠিক বিকাশ ঘটে। শিশু যত বিকশিত হয়, তার ভাষাও তত বিকশিত হয়। খেলার সময় শিশু লক্ষ করে অন্যদের ঠোঁটের বিচলন, বহিঃপ্রকাশের ভঙ্গিমা এবং উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার পদ্ধতি। এগুলি সে গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত করে রাখে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— একটি শিশু কোনো খেলনা গাড়ি দেখে বলল — গাড়ি; পিতা-মাতা সঙ্গে সঙ্গে বললেন— বা !, কী সুন্দর গাড়ি! এভাবে শিশুর শব্দ সংগ্রহ বাড়ে। খেলার মাধ্যমে শিশু শেখে বিভিন্ন বিশেষ পদ, ক্রিয়া পদ; বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করতেও শেখে খেলাধুলার মাধ্যমে।

৮.৪.৫ প্রজ্ঞামূলক বিকাশ ও খেলা (Cognitive development and paly) : মানসিক বা প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যাবলি বলতে জ্ঞান আহরণ ও সেই সম্পর্কে চিন্তা করা আর বিশ্লেষণ করা বোঝায়। খেলাধুলা সঞ্চালনমূলক বিষয় নিয়ে গঠিত। প্রজ্ঞামূলক দিকের উন্নতি বলতে প্রধানত চিন্তাশক্তির বিকাশসাধন, জ্ঞানের প্রসারণ, প্রাক্ষোভিক দিকের উন্নতিসাধন প্রভৃতিকে বোঝায়। ব্যক্তিমনের এইসব দিকের উন্নতি মূলত স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক এবং উন্নত ধরনের কার্যসম্পাদনের ওপর নির্ভরশীল। খেলাধুলার প্রত্যক্ষ ফল— শারীরিক উন্নতি এবং সঞ্চালনমূলক উন্নতি প্রকট হবার ফলে পরোক্ষ অবদানগুলো সাধারণভাবে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু সঠিক এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে খেলাধুলা পরোক্ষভাবে মানসিক উন্নতিতে সাহায্য করে। জীবের ক্রমবিকাশের বিবর্তনবাদ থেকে জানা যায় যে প্রাণীদেহের সবচেয়ে প্রাচীন তন্ত্র হল পেশিতন্ত্র। তাই পেশিতন্ত্রের উন্নতি পরোক্ষভাবে অন্যান্য তন্ত্রগুলোর কাজ করার ক্ষমতাকে ধনাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে ঘটে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশসাধন। খেলাধুলার কার্যসূচি শিশুকে বিভিন্ন প্রকার সমস্যাজনিত পরিবেশে হাজির করে এবং তাদের সমাধানের চেষ্টা করতে বাধ্য করায়। ফলে শিশুর চিন্তাশক্তি বাড়ে, উপস্থিত বুদ্ধি বাড়ে এবং বাড়ে বিশেষ আস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

শিশুর সহজাত আবেগ ও প্রবৃত্তিসমূহের শিক্ষণীয় উপায়ে প্রকাশ ঘটার সুযোগ করে দেয় খেলাধুলার কার্যসূচি। ফলে শিশুর প্রবৃত্তিসমূহের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের অতিমানবীয় গুণের বিকাশ ঘটে।

৮.৪.৬ সঞ্চালনমূলক বিকাশ ও খেলা (Motor development and play) : ন্যূনতম শক্তি খরচ করে, শারীরিক চলনকে কার্যকর করা এবং শরীরের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করাই গতিসঞ্চালনমূলক উন্নতির উদ্দেশ্য। এই শারীরিক সঞ্চালন কতটা আকর্ষক, সৌষ্ঠব বা নান্দনিক তাও এর উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে পেশিসমূহের যোগাযোগকেই গতিসঞ্চালন বলা হয়। চিত্তাকর্ষক শারীরিক সঞ্চালন, দেহের আকর্ষণ বা নান্দনিক অবস্থান তখনই হতে পারে যখন পেশিতন্ত্রের সাথে স্নায়ুতন্ত্রের সুসমঞ্জস্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গতি সঞ্চালনমূলক উন্নতির ফলে মানুষের চলনকে (movement) অনেক আকর্ষণীয় ও ব্যবহারিক করে তোলে। যার ফলে শিশু কম পরিমাণ শক্তি খরচ করে তার যথাযথ ফল পায় এবং শিশুর চলনও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ধরনের উন্নতির ফলে শিশুর সঞ্চালনের পরিমাণও বেশি সংখ্যায় মজুত থাকে। শিশু সঞ্চালন সম্পর্কিত শিখনে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

প্রাত্যহিক জীবনেও স্নায়ুপেশীর গুরুত্ব অনেক। এর ফলে শিশুর শারীরিক সক্ষমতা বাড়ে এবং শিশুর সঞ্চালনগুলো খুব অর্থবহ হয়ে ওঠে।

৮.৪.৭ খেলার তত্ত্ব (Play theory) : খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। শিশুরা কেন খেলে? এই প্রশ্ন অনেক দিনের। বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্‌রা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে কিছু তত্ত্বের। খেলার বিভিন্ন তত্ত্বগুলো এখানে আলোচনা করা হল —

১. **উদ্বৃত্ত শক্তির তত্ত্ব (Surplus energy theory) :** এই তত্ত্বের প্রস্তাবক জার্মান কবি শিলার (Schiller) এবং সমর্থন করেন দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer)। এই তত্ত্বটি দেহতত্ত্বমূলক বা স্নায়বিক ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে খেলাকে বাড়তি শক্তিক্ষয়ের এক পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। শিশুরা খাদ্য থেকে যে পুষ্টি গ্রহণ করে তার সবটা দেহের প্রয়োজনে লাগে না সেই কারণে অতিরিক্ত শক্তিটা খেলাধূলার মধ্য দিয়ে খরচ করে। এই তত্ত্বটি কিছুটা সত্য। দেহের পুষ্টিসাধন ও দেহের কাজ করার ক্ষমতা খেলার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পায়। এই তত্ত্বের কিছু ত্রুটি আছে, যেমন— কারণ শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত যে দেহসঞ্চালন আর খেলা এক জিনিস নয়। খেলায় সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের ক্রমিক প্রকাশ দেখা যায়, যার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের দ্বারা দেওয়া সম্ভব হয় না।

শিশুরা পরিশ্রান্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও খেলতে থাকে, তাদের খেলা থেকে বিরত করা বেশি কষ্ট হয়। এই ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

বয়স্ক মানুষেরা সারাদিন পরিশ্রম করার পরও কেন খেলতে চায় তার ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় না।

২. **পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব (Recreation theory) :** জার্মান দার্শনিক লাজারস (Lazarus) এই মতবাদের প্রবর্তক। তাঁর মতে হৃত উৎসাহ ও শক্তি ফেরত পাওয়ার জন্য প্রাণী খেলা করে। আমরা কোনো কাজের পর যে ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করি, যদি কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন করি সেক্ষেত্রে আমরা ওই অবসাদ বা একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে পারি। এই তত্ত্বেরও কিছু ত্রুটি আছে, যেমন— প্রাণী বা মানুষ খেলার মধ্য দিয়ে যে শক্তির পুনরুজ্জীবন হয়, তা ঘুম বা বিশ্রামের মধ্যে দিয়ে হয় না কেন? এর সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এই তত্ত্বে একথা বলা হয়েছে যে কাজের ও দেহের অঙ্গের পরিবর্তন ঘটলে তবেই অবসাদ বা একঘেয়েমি কমে। কিন্তু শিশুরা খেলার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেইসব অঙ্গের ব্যবহার করতে চায় যেগুলির ব্যবহারে সে পূর্বেই অবসাদগ্রস্ত। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ নান (Nunn) বলেছেন, "This explanation is quite insufficient. Under the influence of play, the child not only continues the activity which has wearied him, but actually puts twice as much rigour into it."

৩. **প্রত্যাশামূলক তত্ত্ব (Anticipatory theory) :** মেলব্রান্স (Malebrance) এই মতবাদের প্রবর্তক এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ কার্ল গ্রুজ (Karl Groos)। এই মতবাদের সমর্থক এবং পরে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করেন খেলা নিয়ে এবং পরে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের প্রাণী খেলা করে না, মেরুদণ্ডী প্রাণীর আচরণের মধ্যে খেলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। শৈশবে দায়িত্বভার কম থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সংগ্রাম বহুল জীবনের মহড়া দেয় মানুষ খেলার মধ্য দিয়ে। শিশুরা খেলা করে কারণ ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক প্রত্যাশা থাকে বলে। এই ধরনের আচরণের মধ্যে কল্পনাবিলাস (make-believe) আছে। সুতরাং এর থেকে এই কথা বলা যায় যে খেলা শিক্ষাধর্মী; খেলা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি।

৪. **পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব (Recapitulation theory) :** ইহা কার্ল গ্রুজের বিপরীত মতবাদ। স্ট্যানলি হল (Stanley Hall)-এর স্রষ্টা। ইনি বলেছেন, আমরা খেলার মধ্য দিয়েই পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করি। হল (Hall) কার্ল গ্রুজের তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, প্রত্যাশামূলক তত্ত্ব আংশিক এবং এটি একটি বাহ্যিক সংব্যাখ্যান। তিনি আরও বলেছেন এই তত্ত্বে আমাদের সমাজের অতীত সংস্কারের ধারা গ্রহণ করা হয়নি এবং তার মূল্যও দেওয়া হয়নি। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু অবস্থায় অতীত সভ্যতার বিভিন্ন ধরনের পরিত্যক্ত কাজেরই আমরা পুনরাবৃত্তি করি। কোনো বিশেষ শ্রেণির কৃষ্টি বা সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটে খেলার মধ্য দিয়ে এই তত্ত্ব অনেকাংশে সত্য। বিভিন্ন দেশের শিশুদের মধ্যে খেলার সাদৃশ্য দেখা যায় এবং তার ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়।

৫. **প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব (Rivalry theory) :** বিখ্যাত মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (Macdougal) এই তত্ত্বের প্রস্তাবক। তিনি বলেছেন, মানুষ খেলার মধ্যে দিয়ে তার মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতাকে খেলার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মানুষের কতকগুলি জন্মগত কর্ম প্রবণতা আছে, যেগুলি শিশুকে বিশেষভাবে আচরণ করতে বাধ্য করে তার শৈশবে।

৬. **বিরেচনবাদ (Cathartic theory) :** ক্যাথারসিস্ (Catharsis) কথাটি ডাক্তারি শাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়। যার অর্থ হল অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার পদ্ধতি। বিশিষ্ট মনোবিদ ফ্রয়েড (Freud) একটি বিশেষ অর্থে এই কথাটি তাঁর মনোবিকলনের তত্ত্বে (Psycho-analytic theory) ব্যবহার করেন। তাঁর মতে বিরেচন (Catharsis) একটি কৌশল, যা বিভিন্ন প্রাথমিক প্রক্রিয়া (Primary Process) ঘটানোর পিছনে কাজ করে। মানুষের মনের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক চাহিদা বা আকাঙক্ষা (Antisocial desire) থাকে যেগুলিকে অবচেতন মনে চাপা দিয়ে রাখা হয়, কিন্তু ওইগুলি ওই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। তারা সংগঠিত হয় এবং গতি শক্তি (Driving Force) লাভ করে প্রত্যক্ষ আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাদের বাধা দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রকাশকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ফলে ওই সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো সমাজগ্রাহ্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং আমরা তৃপ্তি লাভ করি। এইভাবে কোনো অতৃপ্ত অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রত্যক্ষ বস্তুকে ত্যাগ করে অন্য সমাজগ্রাহ্য বস্তু বা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার যে পদ্ধতি, তাকে ফ্রয়েড বলেছেন প্রাথমিক প্রক্রিয়া (Primary Process)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী খেলাও এই ধরনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, মনের অনেক ময়লা আমরা খেলার মাধ্যমে পরিষ্কার করতে পারি। খেলার মধ্য দিয়ে আমরা সামাজিক অতৃপ্ত আকাঙক্ষাকে চরিতার্থ করি। এটিই এই তত্ত্বের মূল কথা।

৭. **জীবন সক্রিয়তার তত্ত্ব (Theory of Life Activity) :** আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ডিউই, ফ্রয়েবেল এঁরাই এই তত্ত্বের সমর্থক। এবং ডিউই-এর মতে জীবনের অভিব্যক্তি হল তার কর্মের মধ্যে। তিনি বলেছেন, "Life is by - product of activities"। খেলাকে তিনি এই জীবন-সক্রিয়তার এক বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। জীবনের এই সক্রিয়তাকে দুভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে — উদ্দেশ্যমূলক এবং উদ্দেশ্যহীন। কাজকে বলা হয় উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তা আর খেলাকে উদ্দেশ্যহীন সক্রিয়তা বলা হয়। তিনি আরও বলেন, খেলার মাধ্যমে শিশুর আত্ম-সক্রিয়তার (Self activity) প্রকাশ হয়।

এই তত্ত্বে ব্যবহারিক দিকের চেয়ে দার্শনিক চিন্তার প্রভাবই বেশি। তাই খেলার প্রকৃতি সম্পর্কে এটিকে একটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

উপরের বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু না কিছু সত্যতা আছে। তত্ত্বগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই যা আছে তা হল অপরিপূর্ণতা। তাই খেলার প্রকৃত সংব্যাখ্যান দিতে গেলে, এই সব তত্ত্বের মধ্যে সার্থক সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। আর যদি প্রত্যেকটি তত্ত্বের ভিতরে সার্থক সমন্বয় ঘটানো যায় সেক্ষেত্রে সেটি হবে খেলার প্রকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

৮.৫ শিশুদের খেলায় মিশ্র সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক পার্থক্য (Cross cultural and socio-economic differences in children's play)

শিশুদের খেলাধুলায় সাংস্কৃতিক মিশ্রণ এবং আর্থসামাজিক পার্থক্যের নিদর্শন ভীষণভাবে প্রকট।

ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিবার অনেক ছোটো এবং পরিবারের প্রত্যেকেই অত্যন্ত ব্যস্ত জীবনধারা পালন করেন। স্বভাবত শিশুর জন্য সময় দেওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই সকল দেশে শিশুদের জন্য আলাদা ঘর করা হয় যেখানে প্রচুর পরিমাণে খেলনা, পুতুল, খেলনা পশুপাখি, খেলনা গাড়ি ইত্যাদি থাকে, যেগুলো নিয়ে শিশু খেলা করে। আমাদের দেশেও ক্রমশ নিউক্লিয়ার পরিবারের ফলে বাইরের খেলা ছেড়ে শিশুরা ঘরোয়া খেলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। সেইজন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা, ভিডিও গেম্ ইত্যাদির কদর ক্রমশ ক্রমবর্ধমান।

আর্থসামাজিক বৈষম্যের কারণে সমাজে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সুবিদিত। মধ্যযুগীয় প্রবঞ্চনা ও শোষণের একটি সরল চিত্র ফুটে ওঠে 'রাজার কোটাল' খেলায়। চৌকিদার, তহশিলদাররা নিরক্ষর, সরল গ্রামবাসীদের নানারকম ভয় দেখিয়ে উৎকোচ গ্রহণ করত। খেলাটিতে মাটিতে একটি বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে একদল শিশু থাকে যারা হল চাষি এবং চাষির কলাবাগানের কাঁদি। বৃত্তের বাইরে একজন ঘুরতে থাকে, সে হল কোটাল। দু'পক্ষ ছড়ার মতো করে বলতে থাকে—

'বাগানের পিছনে ঘুরে কে?/আমি হলাম রাজার কোটাল/কীসের জন্যি ঘোরাঘুরি?/এক কাঁদি কলার লাগি/কাল যে নিছলা এক কাঁদি?/গরুর লাদ্ পড়ছে/ধুইয়া খাও নাই?/আরে ছি ছি থু থু/তবে আর এক কাঁদি নিয়া যাও।'

কথপোকথন শেষে কোটাল বৃত্তের ভেতরের একজনকে নিয়ে গিয়ে দূরে বসিয়ে রাখে এবং আবার ঘুরতে থাকে। ড. অসীম দাসের মতে সাধারণ মানুষের ওপর মধ্যযুগীয় প্রবঞ্চনা ও শোষণের একটি চিত্র খেলার মাধ্যমে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে 'লুন্ডই' খেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সামন্তযুগের 'জোর যার মুলুক তার' নীতি। 'জেলে মাছ' খেলাতেও বাংলাদেশে মধ্যযুগে চালু কুখ্যাত দাস কেনাবেচা ও কামিনীভোগের চিত্র লক্ষ করা যায়। এই ধরনের আর একটি খেলা 'এলাটিং-বেলাটিং'। দু-দল খেলোয়াড় একটি মধ্যরেখার দু'পাশে অবস্থান করে। একবার প্রথম পক্ষের খেলোয়াড়েরা হাত ধরাধরি করে ছড়া বলতে বলতে এগিয়ে আসে; তার পরেই দ্বিতীয় পক্ষের খেলোয়াড়েরা এগিয়ে আসে। সবশেষে দ্বিতীয় পক্ষ একজন বালিকাকে প্রথম পক্ষকে দিয়ে দেয়। ছড়াটি এই রকম—

'এলাটিং বেলাটিং সৈ লো/কি খবর আইল?/রাজা একটি সোনার বালিকা চাইল/কোন বালিকা চাইল?/অমুক (নির্দিষ্ট নাম) বালিকা চাইল/কী পরে যাবে?/ম্যাক্সি পরে যাবে/কীসে করে যাবে?/ট্যাক্সি করে যাবে/কত টাকা দেবে?/হাজার টাকা দেব/নিয়ে যাও নিয়ে যাও বালিকাকে'।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন সমাজের একটি করুণ ঘটনা কীভাবে খেলায় পরিণত হয়েছে।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে শিশুদের খেলার মধ্যে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ও আর্থসামাজিক বৈষম্য বিশেষভাবে বিদ্যমান।

৮.৬ খেলা ও দলগত সক্রিয়তা, খেলার নিয়মাবলি, খেলার মাধ্যমে শিশুদের আপোষ পদ্ধতি এবং বিরোধ মীমাংসার ধরন (Games and group dynamics, rules of games, and how children learn to negotiate differences and resolve conflict)

দলগত সক্রিয়তা (Group Dynamics) : দলগত সক্রিয়তার খেলা বলতে বোঝায় শিক্ষা পরীক্ষামূলক অনুশীলন যা শিশুদের নিজেদের সম্পর্কে জানতে, পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে, দলের কাজ সম্পর্কে জানতে এবং দলগত সক্রিয়তা তথা সমাজ মনোবিদ্যা গঠন করতে সাহায্য করে। দলগত সক্রিয়তা হল জটিল প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক গঠনের প্রক্রিয়া। কারণ, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—

১। দুটি ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক

২। ব্যক্তি ও দলের মধ্যে সম্পর্ক

৩। বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক

দলগত সক্রিয়তার খেলাধুলা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘটিত হয়। যেমন— ব্যক্তিগত বিকাশকে শক্তিশালী করা, চরিত্র গঠন এবং দলের সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করা ইত্যাদি। দলের নেতা অনেক সময় খেলার নেতা হিসাবেও কাজ করে থাকে। দলের নেতা এবং খেলার নিয়মাবলি পরিস্থিতির প্রয়োজনে পরিবর্তিত হতে পারে।

দলগত সক্রিয়তার খেলাধুলার মূল উদ্দেশ্য হল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে দলগত ভাবনার বিকাশসাধন, মাদকাসক্ত অবস্থা থেকে পুনর্বাসন ইত্যাদি।

দলগত সক্রিয়তার খেলাধুলার প্রকারভেদ :

১। উদ্যোমমূলক কার্যাবলি (Adventure based activities)

২। বরফ ভাঙার খেলা (Ice breaking games/Ice-Breaking)

৩। বৃহৎ দলের খেলা

৪। সাইকো ড্রামা

৫। ভূমিকা অভিনয়ের খেলা (Role-playing games)

৬। দল গঠনের খেলা

৭। আস্থা স্থাপনের খেলা

খেলার নিয়মাবলি :

- **ক্রিকেট :**

এই খেলা দুই দলে খেলা হয়। একটি দলে অধিনায়ক সমেত ১১ জন মাঠে খেলতে নামে। বর্তমানে দু'রকমের খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেমন সীমিত ওভারের খেলা এবং নির্দিষ্ট দিনের খেলা। দুই ধরনের খেলাতে নিয়কানুন দু'ধরনের।

মাঠের পরিমাপ : গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি হতে পারে; চারিদিকের দাগকে বাউন্ডারি বলে, যা কেন্দ্র থেকে ৬০-৭৫ গজ হয়; মাঝখানে পিচ থাকে যার দৈর্ঘ্য ২২ গজ এবং প্রস্থ ৮´ ৮´´, ও দুইদিকে মাঝখানে তিনটি করে ৬টি উইকেট থাকে, যার তিনটির সমন্বয়ে ৯´; উইকেট থেকে ৪´ দূরত্বে পপিং ও রিটার্ন ক্রিজ;

বল— গোলাকার লাল অথবা সাদা হবে যার ওজন ১৫৫.৯ গ্রাম থেকে ১৬৩ গ্রাম এবং পরিধি ২২.৪ সেমি থেকে ২২.৯ সেমি।

ব্যাট— দৈর্ঘ্য ৩৮´´-এর বেশি হবে না এবং ব্লেড ৪.২৫´´-এর বেশি হবে না।

পরিচালক গণের সংখ্যা ও নাম— দুইজন মাঠের ও একজন মাঠের বাইরের আম্পায়ার, দুইজন স্কোরার, একজন ম্যাচ রেফারি।

- **ফুটবল :**

এই খেলার মাঠ উত্তর-দক্ষিণ হওয়া উচিত। মাঠের সমতলে ঘাস থাকা প্রয়োজন, তবে বর্তমানে কৃত্রিম ঘাসও ব্যবহার করা হচ্ছে। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা সঠিক হওয়া উচিত। মাঠের চারপাশে যেন অন্তত ৩ গজ করে জায়গা থাকে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য।

পরিমাপ

১) **দাগ**—মাঠের প্রতিটি দাগ ৫´´ চওড়া এবং দাগ মাঠের অংশ। এটা সাদা রঙের হবে।

২) **দৈর্ঘ্য—** ১০০ থেকে ১৩০ গজ এবং প্রস্থ ৫০ থেকে ১০০ গজ। তবে আন্তর্জাতিক ম্যাচের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য × প্রস্থ ১১০ মি. × ৭৫ মি. এর বেশি হবে না এবং ১০০ মি. × ৬৪ মি. এর কম হবে না।

৩) **কর্নার এরিয়া**—এক গজ ব্যাসার্ধের সিকি বৃত্ত যেখানে কর্ণার ফ্ল্যাগ থাকবে যার উচ্চতা ৫´ এর কম হবে না।

৪) **গোল এরিয়া—** ২০ গজ × ৬ গজ-এর আয়তক্ষেত্র (দাগ সমেত)।

৫) **পেনাল্টি এরিয়া—** ৪৪ গজ × ১৮ গজ-এর আয়তক্ষেত্র যাকে পেনাল্টি বক্স বলে এবং গোলপোস্টদ্বয়ের মধ্যবিন্দু থেকে সমকোণে মাঠের মধ্যে ১২ গজ দূরত্বে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের পেনাল্টি স্পট এবং এই পেনাল্টি স্পটকে কেন্দ্র করে ১০ গজের ব্যাসার্ধে পেনাল্টিবক্সের উপর বৃত্তচাপ, যাকে পেনাল্টিআর্ক বলে।

৬) **গোলপোস্ট—** মাটি থেকে পোস্টের উচ্চতা ৮´ (বারের নীচ পর্যন্ত) এবং গোলপোস্টদ্বয়ের মধ্যের দূরত্ব ৮ গজ এবং পোস্ট ও বার ৫´´ × ৫´´ অথবা ৫´´ ব্যাসের গোলাকার হতে পারে।

৭) **কেন্দ্রবৃত্ত—** মধ্যরেখার একদম কেন্দ্রে ৬´´ব্যাসের কেন্দ্র স্পট করা হবে যাকে কেন্দ্র করে ১০ গজ ব্যাসার্ধের বৃত্ত করা হবে।

৮) **বল—** গোলাকার চামড়া অথবা সিন্থেটিক বস্তু দ্বারা আবৃত, পরিধি ২৭´´ থেকে ২৮´´, ওজন ৩৯৬ গ্রাম থেকে ৪৫৩ গ্রাম।

৯) **খেলোয়াড়ের সংখ্যা—** প্রতি দলে ১১জন করে খেলবে এবং তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই গোলরক্ষক হবে আলাদা পোষাক পরে। মোট ২২ জন খেলোয়াড় নথিভুক্ত করতে পারবে তবে খেলা শুরুর আগে ১৮ জন খেলোয়াড়ের নাম দিতে হবে। কোনো সময়েই একটি দলে ৭ জন খেলোয়াড়ের কম থাকলে খেলা শুরু হবে না।

সর্বাধিক তিনজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে (গোলরক্ষক সমতে)। যে-কোনো সময় গোলরক্ষকের পরিবর্তন করা যাবে যে-কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে তবে রেফারিকে জানিয়েই তা করতে হবে।

১০) **জয়-পরাজয় নির্ধারণ—** নির্দিষ্ট ৯০ মিনিটে (৪৫ + বিরতি + ৪৫) খেলার মীমাংসা না হলে পরবর্তী ৩০ মিনিট (১৫ + বিরতি + ১৫) খেলা হবে এবং এই সময়কালে গোল হওয়া মাত্র খেলা শেষ এবং একে গোল্ডেন গোল বলা হয়। যদি ১২০ মিনিটে (৯০ + ৩০) খেলার মীমাংসা না হয় তবে তখন টাই ভাঙা পদ্ধতি প্রয়োগ হবে।

প্রথমে টস হবে এবং যে দল জিতবে সে অবশ্যই পেনাল্টি কিক করবে প্রথমে। মোট ১০ জন (৫ + ৫) দুটি দলে পরপর কিক

করবে। যদি মীমাংসা না হয় তবে একটি করে কিক নিতে হবে এবং এইভাবে চলবে যতক্ষণ মীমাংসা না হবে।

ফুটবল খেলার আইন-এর কিছু পরিবর্তন—

ক) গোলপোস্ট ও ক্রসবার অবশ্যই সাদা রঙ-এর হবে।

খ) কর্নার থেকে ১১ গজ-এর দূরত্বে গোল লাইনের ও পার্শ্ব লাইনের বাইরে সমকোণে একটি দাগ থাকবে। কর্নার করবার সময় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় ওই দাগ-এর বাইরে থাকবে।

- **থ্রোবল :**

মাঠ সমতল ঘাস বা কাঠের মেঝে হবে, দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং প্রস্থ ৩০ ফুট, ৯ জন খেলোয়াড় একটি দলে মাঠে খেলবে। দৈর্ঘ্য বরাবর মধ্যরেখা থাকবে এবং ১২ ইঞ্চি মাঠের বাইরে খুঁটি দিয়ে নেট টাঙানো হবে। নেটের উচ্চতা মাঝখানে মাটি থেকে ৭ ফুট, নেট থেকে দুইদিকে ৩ ফুট দূরত্বে নেটের সমান্তরাল রেখা দিয়ে নিউট্রাল অঞ্চল করতে হবে। এই অঞ্চলে বল পড়লে আউট হবে এবং কোনো খেলোয়াড় এই অঞ্চলে পা রেখে বল পার করতে পারবে না। বলের পরিমাপ প্রমাণ ৫নং ফুটবল এবং যার পরিধি ২৭ ইঞ্চি থেকে ২৯ ইঞ্চি। বল একহাত বা দুইহাত দিয়ে অপরপ্রান্তে পার করতে হবে। ১৫ সংখ্যায় গেম হবে এবং ১৪ সংখ্যাতে সমান হলে দুই সংখ্যার পার্থক্যে খেলার মীমাংসা হবে। খেলা তিন গেমে সিদ্ধান্ত হবে।

- **কাবাডি :**

দুই দলে খেলা হবে, প্রতিটি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকবে এবং ৭ জন করে মাঠে খেলবে। তিনটি খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে। দুই অর্ধে ২০ মিনিট (পুঃ) ও ১৫ মিঃ (মঃ) করে খেলা হবে ৫ মিনিটের বিরতি দিয়ে।

কমপক্ষে ৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলা শুরু করা যাবে। মাঠের বাইরের জমি স্পর্শ করলে খেলোয়াড় আউট হবে (লবি মাঠের বাইরের অংশ) তবে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেলে লবি মাঠের অংশ বলে বিবেচিত হবে। 'কাবাডি' পরিষ্কার উচ্চারণ হবে এবং নিজের অর্ধ থেকে শুরু করে নিজের অর্ধেই শেষ করবে। নিজের অর্ধে শেষ না করলে আউট হবে। নিজের অর্ধ থেকে শুরু না করলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। নিজের অর্ধে ফিরে আসবার ৫ সেকেন্ডের মধ্যে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে কাউন্ট শুরু করতে হবে। একজনের অধিক খেলোয়াড় কাউন্ট একসঙ্গে দেবে না। কোনো খেলোয়াড়কে মারাত্মকভাবে ধরা যাবে না এবং ঠেলে মাঠের বাইরে বের করা যাবে না। বাক্ লাইন অবশ্যই পার হতে হবে, না হলে আউট হবে। বোনাস লাইন পার হলে ১ পয়েন্ট পাবে, একটি দলে সব খেলোয়াড় আউট হলে বিপক্ষ দল আলাদা লোনা হিসাবে ২ পয়েন্ট পাবে এবং ১০ সেকেন্ডের মধ্যে আবার মাঠে নামতে হবে। না নামলে এক পয়েন্ট পাবে বিপক্ষ দল এবং তার পরও না নামলে প্রতি ৫ সেকেন্ডে বিপক্ষ দল ১টি করে পয়েন্ট পাবে। নির্ধারিত সময়ের পর যে দল বেশি পয়েন্ট পাবে তারাই বিজয়ী ঘোষণা হবে। যেভাবে খেলোয়াড় আউট হয়েছিল সেই অনুসারেই তারা আবার মাঠে উঠবে।

- **খো খো :**

খেলার মাঠ পূর্ব-পশ্চিম হবে। ভূমি সমতল ঘাস বা মাটি দ্বারা তৈরি, সাব্ জুনিয়র ছাড়া সকলের জন্য একই মাপ, পরিমাপ নিম্নরূপ—

পার্শ্বরেখা— ২৯ মিঃ, প্রান্তরেখা - ১৬ মিঃ।

কেন্দ্রীয় পথ— ৩০ সেমি, একটি খুঁটি থেকে অপর খুঁটি পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্য ২৩.৫০ মিঃ।

বর্গক্ষেত্র— ৩০ সেমি × ৩০ সেমি — যেখানে অনুধাবক বসবে।

ক্রসপথ — ৩০ সেমি চওড়া এবং পার্শ্বরেখা থেকে বিপরীত পার্শ্বরেখা পর্যন্ত। দুইটি ক্রসপথের মধ্যের দূরত্ব ২৩০ সেমি এবং খুঁটি থেকে প্রথম ক্রসপথের দূরত্ব ২৫০ সেমি।

মুক্ত অঞ্চল— ১৬ মিঃ × ২.৭৫ মিঃ আয়তাকার অঞ্চল।

রেখার চওড়া— কমপক্ষে ৩ সেমি এবং এটা মাঠের অংশ।

খুঁটি— কাঠের তৈরি এবং গোলাকার মসৃণ - উচ্চতা ১২০ সেমি থেকে ১২৫ সেমি, পরিধি ৯ সেমি থেকে ১০ সেমি।

সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলি

একটি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকবে এবং ৯ জন খেলোয়াড় মাঠে খেলবে। দুইটি অর্ধে খেলা হবে যাকে বলা হয় ইনিংস। প্রথম অর্ধে দুইটি এবং ২য় অর্ধে আরও দুইটি ইনিংস খেলা হবে।

সময়— প্রতি ইনিংস ৯ মিনিট করে, দুইটি ইনিংসের মধ্যে ৫ মিনিট বিরতি এবং দুইটি অর্ধের মধ্যে ৯ মিনিট বিরতি। যেমন— ৯ + ৫ + ৯ + ৯ + ৯ + ৫ + ৯ = ৫৫ মিনিট।

জয় পরাজয় নির্ধারণ : নির্ধারিত সময়ে যে দল বেশি খেলোয়াড় আউট করবে তারা জয়ী হবে। পয়েন্ট সংখ্যা সমান হলে আবার একটি অর্ধ খেলা হবে (৯ + ৫ + ৯)। এক্ষেত্রেও যদি নির্ধারণ না হয় তবে খেলা শুরু হবে এবং প্রথম আউট হলে খেলা বন্ধ এবং সময় নোট করা হবে। ২য় দল যদি ওই সময়ের আগে একটি আউট করতে পারে তবে ২য় দল জয়ী, না হলে প্রথম দল জয়ী। এইভাবে খেলা চলবে যতক্ষণ নিষ্পত্তি না হবে।

শিশুদের আপোষ পদ্ধতি এবং বিরোধ মীমাংসার ধরনের শিখন :

শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য এবং পারস্পরিক মতবিরোধ অত্যন্ত প্রকট। নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দেশিত কার্যাবলির মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দিতে হবে কীভাবে এগুলোর সমাধান সম্ভব।

সমস্যা সমাধানের পর্যায় : নিম্নলিখিত কতকগুলো নির্দেশিত পথে শিশুর বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষণ দিতে হবে। যথা—

১। **কথা বলার জন্য নিরিবিলি স্থান নির্বাচন :** কোনো স্থানে যদি পারস্পরিক বিরোধ দেখা দেয়, সর্বপ্রথম যেটি করতে হবে শিশুদের ওই জায়গা থেকে আলাদা একটি স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে হবে। এইসময় কেউ কাউকে বাধা দেবে না। সকলের কথা শুনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হবে।

২। **কিছু ভিত্তি নিয়মাবলি তৈরি করা :** সাধারণত প্রক্ষোভের কারণেই শিশুদের মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়। কিছু ভিত্তি নিয়মাবলির মাধ্যমে শিশুরা যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারে এবং একটি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। সাধারণভাবে, সমস্যা সমাধানের নিয়মাবলি হল—

- প্রত্যেককে বলতে দিতে হবে।
- কারও বক্তব্যকে বাধা না দিয়ে মন দিয়ে শুনতে হবে।
- প্রত্যেককেই একটি সমাধানের পথ বলতে হবে।
- সকলের দেওয়া সমাধান পথ নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- দলগতভাবে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমাধানসূত্র গ্রহণ করতে হবে।

প্রত্যেক শিশুকে সমস্যাটি নিজের মতো করে বলতে দিতে হবে। সকলে তখন তার কথা শুনবে। এই সময় অন্য কেউ বক্তাকে বাধা দেবে না। কারও কিছু বলার থাকলে পরবর্তী সময়ে তার বলার সময় আসলে তখন বলবে।

প্রত্যেকের বলা শেষ হয়ে গেলে সমস্যাটি মূলত কি তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। প্রয়োজনে সমস্যাটি সংক্ষিপ্ত আকারে সকলের সামনে বলতে হবে। এরপর যদি কিছু সংযোজনী বা সংশোধনী দরকার হয়, তা করবে হবে।

এরপর প্রতিটি শিশুই সমস্যাটি সমাধানের জন্য নিজস্ব একটি করে উপায় বলবে। এখানেও কোনো বক্তব্য পেশের সময় কেউ কোনো বাধা দিতে পারবে না।

সকলের বলা শেষ হলে দলগতভাবে প্রতিটি মতামত আলোচনা করতে হবে এবং একটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

সাধারণভাবে সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসার জন্য পুরো দলকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে সকলকে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে।

এরপর খেয়াল রাখতে হবে সকল শিশুরা সেটি মেনে চলছে কিনা। এরপরেও যদি সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে আবার সকলকে একসাথে ডাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সমাধানের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

এইভাবে ব্যক্তি পার্থক্য এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে হবে।

৮.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

খেলা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। খেলার মধ্য দিয়ে মানসিক শক্তির প্রবাহ হয়। খেলার মাধ্যমে প্রাচীন অভিজ্ঞতার অনুশীলন হয়। খেলা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। খেলার কাজ ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন। শিশুরা খেলে কেন? এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে যেগুলোকে খেলার তত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। খেলার মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতির পার্থক্যের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। খেলার মধ্য দিয়ে দলগত সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন খেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিয়মাবলি বর্তমান। খেলার মাধ্যমে শিশুরা আপোষ করে এবং বিরোধের মীমাংসা করে।

৮.৮ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনধর্মী প্রশ্ন :

১. খেলার সরঞ্জাম তখনই সঠিক হবে, যখন এতে শিশুর ________________ চাহিদা পূরণ হবে।

(ক) শারীরিক (খ) মানসিক

(গ) সামাজিক (ঘ) উপরের সবকয়টি

২. নির্মাণমূলক খেলার একটি উদাহরণ হল—

(ক) চিত্র অঙ্কন (খ) পুতুল খেলা

(গ) মাটির ব্লক নির্মাণ (ঘ) লুকোচুরি খেলা

৩. কোনটি খেলার বৈশিষ্ট্য নয়?

(ক) সৃজনশীলতার প্রকাশ (খ) স্বাধীনতা

(গ) অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায় (ঘ) বাধ্য হয়ে কাজ করা

৪. Dramatising সাধারণত এক ধরনের—

(ক) সক্রিয় খেলা (খ) নিষ্ক্রিয় খেলা

(গ) সাময়িক খেলা (ঘ) আমোদপ্রমোদ

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. খেলার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

২. সহযোগী খেলা বলতে কী বোঝ? দুটি উদাহরণ দাও।

৩. ব্যক্তিগত ও দলগত খেলার দুটি পার্থক্য লেখো।

C. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. খেলা কয়প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপে খেলার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

D. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. প্রাথমিক স্তরে দৈহিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে খেলার ভূমিকা আলোচনা করো।

২. খেলা কাকে বলে? খেলার প্রকারভেদগুলির উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৯

ভাষা
(Language)

৯.১ সূচনা (Introduction)

৯.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৯.৩ ভাষা বিকাশের প্রেক্ষিতসমূহ (Perspective in Language Development)

৯.৪ ভাষার ব্যবহার : টার্নটেকিং, মিথস্ক্রিয়া, কথোপকথন এবং শ্রবণ (The Use of Language : Turntaking, Interaction, Conversation and Listening)

৯.৫ দ্বিভাষী বা বহুভাষী শিশু (Bilingual or Multilingual Children)

৯.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

৯.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

৯.১ সূচনা (Introduction)

শিশু জন্ম মুহূর্তে থেকে তার কিছু বাহ্যিক আচরণ প্রকাশ করে। হাত ও পা ছোঁড়ে, হাসে, কাঁদে, মুখের ভাবের পরিবর্তন করে, সে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে পরিবারের সদস্যদের। যখন বড় হয় তার মনের ভাব শব্দের আকারে প্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে আরও আচরণের উন্নতি ঘটে। এই বাহ্যিক আচরণকে ভাষা বলা হয়ে থাকে যার দ্বারা শিশু নিজের চাহিদা পরিবেশের অন্য সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করে। শিশুর অভিযোজন ক্ষমতা বা পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে ভাষার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করা যায়। ভাষার সাহায্যে আমরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, মূর্ত-বিমূর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে পারি। ভাষা হচ্ছে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম।

৯.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। ভাষার বিকাশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

২। ভাষার বিকাশ সম্পর্কে স্কিনারের তত্ত্বের অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

৩। বান্দুরা ও ওয়ালটারের সামাজিক শিখনের তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে।

৪। ভাষার বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

৫। দ্বিভাষী ও বহুভাষী শিক্ষার্থী সমন্বিত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৯.৩ ভাষা বিকাশের প্রেক্ষিতসমূহ (Perspective in Language Development)

প্রতিটি প্রাণী যোগাযোগের জন্য ভাষা ব্যবহার করে। প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষের ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা এবং উৎকর্ষতা উন্নতমানের। মানুষ সমষ্টিবদ্ধভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় বসবাস করে তাই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। J.W. Santook তাঁর বই 'Educational Psychology'-তে ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, 'ভাষা হল যোগাযোগের প্রক্রিয়া যা নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রতীকের সমষ্টি এবং যা বাচনিক, লিখিত বা অবাচনিক হতে পারে।'

ভাষা শুধুমাত্র ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয় ভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির বাহক স্বরূপ। দেশকাল, সমাজ, গোষ্ঠী, অঞ্চল ভেদে ভাষার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শিশু জন্ম থেকেই ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী হয় না, বরং ধারাবাহিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবার, পরিবেশ এবং সমাজ থেকে ভাষার ব্যবহার থেকে ধারাবাহিক ভাষার বিকাশ চলতে থাকে।

৯.৩.১ ভাষার উপাদান (Components of Language)

শিশুর ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে, ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে ভাষা চারটি উপাদানের ভূমিকা থাকে। যে-কোনো ভাষার এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল — (ক) ধ্বনি (Phonology), (খ) শব্দার্থ (Semantics), (গ) বাক্যগঠন বা বাক্য বিন্যাস (Syntax), (ঘ) প্রায়োগিক দিক (Pragmatics)।

ক. **ধ্বনি (Phonology) :** ভাষার অন্যতম মৌলিক এবং স্বতন্ত্র একক হল ধ্বনি। যে সমস্ত প্রতীক বা চিহ্ন নিয়ে ভাষা তৈরি হয় তাই হল ধ্বনি। এটি ভাষার প্রাথমিক উপাদান, অর্থসহ ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে 'Morpheme' বলে।

খ. **শব্দার্থ (Semantics) :** শব্দ এবং বাক্যের অর্থ উপলব্ধি অর্থাৎ কথোপকথনের জন্য শব্দের সংযুক্তির নিয়মগুলি আয়ত্ত করার ফলে শিশু বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন বাড়ি এবং বিদ্যালয় শব্দ দুটির ভিন্ন অর্থ।

গ. **বাক্যগঠন বা বাক্য বিন্যাস (Syntax) :** শব্দকে নির্দিষ্ট নিয়মে বাক্য তৈরি করার কৌশলকে বলা হয় বাক্যগঠন বা বাক্য বিন্যাস। নির্দিষ্ট নিয়ম অর্থাৎ ব্যাকরণ মেনে বাক্যের অর্থবহ বিন্যাসকরণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন হয়। যেমন— 'আমি ভাত খাবো' অর্থপূর্ণ বাক্য কিন্তু 'খাবো আমি ভাত' বাক্যটি অর্থবহভাবে বিন্যস্ত নয়।

ঘ. **প্রায়োগিক দিক (Pragmatics) :** পরিস্থিতি, পরিবেশ অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দচয়ন এবং স্বরক্ষেপণের মাধ্যমে বাক্যের ব্যবহারের উপলব্ধিকে ভাষার প্রায়োগিক দিক বলে। সাধারণ শিক্ষার্থী বন্ধু এবং পিতা-মাতার সাথে কথা বলার জন্য বাক্যে একই প্রয়োগিক দিক ব্যবহার করে না।

৯.৩.২ পর্যায়ক্রমে (বয়স অনুযায়ী) শিশুর ভাষা বিকাশ [Stage of (Age wise) Language Development of Child]

সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে শিশুর ভাষামূলক বিকাশ হয়ে থাকে। বিকাশের স্তর বা বয়স অনুযায়ী শিশু ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করে। জন্মের সময় শিশু-ক্রন্দন ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারে না কিন্তু জন্ম থেকে বারো মাস পর্যন্ত বয়সও ভাষা বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। যাই হোক শিশুর জীবন বিকাশের ধারায় কীভাবে ভাষার বিকাশ সংঘটিত হয় তা নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে বর্ণিত করা হল —

টেবিল ১ : পর্যায়ক্রমে (বয়স অনুযায়ী) ভাষার বিকাশ

বয়স ও বিকাশ	বিবরণ	উদাহরণসমূহ
পর্যায় প্রথম বছর ব্যাবলিং (Babbling)	প্রথম বছরের শেষের দিকে অস্পষ্ট ধ্বনির পুনরাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে হঠাৎ কমতে শুরু করে। প্রথম বছর পূর্ণ হলে কচি শিশু অনেক ভাষার ধ্বনি (Sound) উচ্চারণ করে, মাতৃভাষার (Bubbling) ধ্বনি আয়ত্ত করে এবং সচরাচর প্রথম শব্দ (Word) বলতে শেখে।	''বাবা'' ''মা'' ''দিদি'' ''নানা'' ''মামা''
দ্বিতীয় বছর হলোফ্রেজেজ (Holophrases)	আঠারো মাস বয়সে একটি একটি করে বারোটি (১ ডজন) শব্দ বলে	

যুগ্ম শব্দ ব্যবহার (Duo)	দ্বিতীয় বছরের শেষাংশে শিশুর যুগ্ম বা জোড়া শব্দ উচ্চারণের সম্ভাবনা বেশি (Duo)। এর মাধ্যমে সংবেদী পেশি সঞ্চালন পর্যায়ে (sensory motor level) অর্জিত জ্ঞান প্রতিফলিত হয়। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সময় শিশু উচ্চ স্বরে সরল ঘোষণা জানায়; বড়দের মতো প্রশ্নবোধক শব্দ সম্পূর্ণভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। সংক্ষেপে বলে। বিশেষ্য (Nouns) অথবা নেতিবাচক অর্থ নির্দেশক অন্যান্য শব্দাংশ ব্যবহার করে না বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।	"বল নাই" "আমার বল" "বাবা যাব" "মামা যাব" "যাব না" "দুধ না" "ভাত না"
তৃতীয় বছর অর্থের নিয়মানুগ পরিবর্তন (Modulation Meaning)	শিশু ব্যাকরণ অনুযায়ী অনেক শব্দের ব্যবহার (Grammatical Morphemes) আয়ত্ত করে। আড়াই বছর বয়সে বিশ্বাসযোগ্য এবং যথাযথ বাক্য বলার সম্ভাবনা বেশি। সে সরল বিবরণ দিতে পারে; তবে কখনো ব্যাকরণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও সঠিক ভাষা ব্যবহারেব অভাব হতে পারে। বয়স তিন বছরের কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত শিশু ব্যাকরণ অনুযায়ী না — বোধক শব্দ সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সাহায্যকারী শব্দাবলি ব্যবহার ও শব্দের বিন্যাস পরিবর্তন করতে পারে না। আড়াই বছর বয়সে শিশুর উচ্চারিত শব্দের গড় মান ৪০০; এর পর দ্রুত বৃদ্ধি পায়।	"বেবি হাঁটে" "বেবি পুতুল" "রনি যায়" "রানি গাড়ি" "এটা ভেঙ্গেছে" "মামা গাড়ি যাব" "আমি ভাত না খাব" "আমি বাড়ি না যাব" "আমি টাকা না চাই"
চতুর্থ বছর	এ বয়সে ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দের ব্যবহার জানা থাকলেও অধিকাংশ শিশুই একটি বাক্য গঠনে যেমন সেসব অনুসরণ করে না ঠিক সেভাবেই কর্মবাচক (Passive) বাক্যাদি, শর্ত অথবা "আছে" ক্রিয়াবাচক বাক্যাংশগুলো (Conditionals or verb phrases) ব্যবহার করার পক্ষপাতী নয়। এ পর্যায়ে শিশুরা ভবিষ্যৎকাল (Future tense) ব্যবহার করতে শুরু করে। তিন বছর বা কাছাকাছি সময় সাহায্যকারী ক্রিয়াপদের সাহায্যে নেতিবাচক বাক্য বলে। চার বছর পূর্ণ হলে বড়দের মতো প্রশ্ন করতে পারে। সাড়ে তিন বছর বয়সে শিশুদের ব্যবহৃত শব্দকোষের গড় মান ১০০০ এরও বেশি হয়।	" মা যাবে কি?" "রনি কি যাবে?" "বাবা যাবে না?" "রনি কাঁদে কেন?"
পঞ্চম বছর শিশুর ভাষা ক্রমশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভাষার অনুরূপ হয়ে ওঠে (Language increasingly resembles adult models)	শিশুর ভাষায় অধিকতর জটিল সম্বন্ধসূচক বাক্য খণ্ডাংশ (Clasur) লক্ষিত হয় এবং একটি বাক্যে নিয়মিতভাবে দুই বা ততোধিক ধারণা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ সময় শিশুসুলভ ভাষার কিছুটা ব্যতিক্রম ধরা পড়ে।	" আমি দেখেছি তুমি কি দিয়েছ" "তুমি জান আমি পারি" "তুমি কেন চলে যাও"

সূত্র : জামান, বানু, মানব বিকাশে মনোবিজ্ঞান (পৃঃ ১৬১,১৬২)

৯.৩.৩ ভাষা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Language Development)

শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিকাশ যেমন — দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশের মতো ভাষার বিকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার যথাযথ বিকাশ শিশুর অন্যান্য বিকাশগত দিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, শিশুর যথাযথ প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং যথার্থ ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ভাষা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির জন্য ভাষার কার্যাবলির অবতারণা করা প্রয়োজন। ভাষার কার্যকারিতা সম্পর্কে Michael Halliday কতগুলি কার্যাবলির উল্লেখ করেছেন—

- **যান্ত্রিক (Instrumental) :** ব্যক্তি ভাষার সাহায্যে জিজ্ঞাসা করে, (যেমন — আমি কি খেলা করতে পারি?)। তাকেই ভাষার যান্ত্রিক কাজ বলে।
- **নিয়ন্ত্রক (Regulatory) :** অন্যের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভাষা ব্যবহার করা হয় (যেমন — শিক্ষক ছাত্রকে বলেন 'শান্ত হয়ে বসো') তাকেই বলে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভাষার কাজ।
- **পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (Intractional) :** পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ভাষা ব্যবহৃত হয় (যেমন — বন্ধুকে তার জন্মদিনে শুভেচ্ছা দেওয়া)।
- **ব্যক্তিগত (Personal) :** ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করতে ভাষার ব্যবহার করে (যেমন — আমি এই মুহূর্তে খুব খুশি)।
- **আবিষ্কার (Heuristic) :** ভাষা অনেক সময় জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আবিষ্কারমূলক কাজ করে। (যেমন — এইডস্ নিরাময়ের কি কোনো ওষুধ আছে?)।
- **কাল্পনিক (Imagination) :** ব্যক্তি যখন কিছু কল্পনা করে তখন ভাষার কাল্পনিক কাজ দেখা যায় (যেমন — মেঘের আকাশে তুমি বিচরণ করছ এর উপর একটি নিবন্ধ রচনা করো)।
- **তথ্যগত (Informational) :** তথ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে ভাষার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় (যেমন — বর্তমানে আমাদের দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কী?)।

৯.৩.৪ ভাষার বিকাশে স্কিনারের তত্ত্বের অবদান (Contribution of Skinner's Theory in Language Development)

B.F. Skinner হলেন একজন আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী। তিনি তাঁর অপারেন্ট কন্ডিশনিং (Operant Conditioning) তত্ত্বে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষ ভাষা অর্জন করে সক্রিয় অনুবর্তনের (Operant Conditioning)-এর মাধ্যম। তাঁর মতে শিশুরা পরিবেশ থেকে এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার ফল থেকে ভাষা শেখে।

স্কিনারের মতে শিশুর ভাষা শেখার পশ্চাতে ধনাত্মক শক্তিদায়ক উদ্দীপক (Positive Reinforce) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর শব্দ উচ্চারণকে পিতা-মাতারা পুরস্কারের মাধ্যমে উদ্দীপিত করে। শিশুর উচ্চারণের প্রচেষ্টার সময় পিতা-মাতার হাসি, আদর, প্রশংসা শিশুকে ভাষা শেখা এবং ভাষাগত বিকাশে উদ্দীপ্ত করে। শিশুর ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে স্কিনারের তত্ত্বের কয়েকটি অবদান নিম্নরূপ :

ভাষার বিকাশ ও স্কিনার :

১. **প্রথমত,** শিশু যখন শব্দ, অক্ষর বা বাক্য শিখবে তখন তার সামনে শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন প্রয়োজন। বিশেষ করে ধনাত্মক উদ্দীপক, যার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ শব্দ, অক্ষর, বাক্য স্থায়ী হবে।

২. **দ্বিতীয়ত,** স্কিনার তার তত্ত্বে দেখিয়েছেন পুরস্কারের ব্যবহার। শিশুরা শিখতে আগ্রহী হবে যখন সে কোনো পুরস্কার লাভ করবে। যেমন শিশু ছড়া বলার পরে, কেউ হাততালি বা স্বাভাবিক আদর করে উৎসাহিত করলে ছড়া বলার উচ্চারণ করার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে।

৩. **তৃতীয়ত,** শিশুর শিখনের স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে। তাই সে জিজ্ঞাসা করে বা অনেক প্রশ্ন করে সেই অবস্থায় তার উত্তর দিয়ে ভাষার বিকাশ ঘটাতে হবে। শক্তিদায়ী উদ্দীপক এবং শেপিং-এর নীতি নিয়ন্ত্রণ করে শিশুর ভাষা স্থায়ী করতে হবে।

৪. **চতুর্থত,** শিশুকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। শিশুর সক্রিয়তা ছাড়া ভাষা শেখা অসম্ভব। সক্রিয়তা তৈরির জন্য তার প্রশ্নে বা উত্তরের পরে ফিডব্যাক দিতে হবে। শিক্ষককে অবশ্যই শক্তিদায়ী উদ্দীপকের শিখন দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

৯.৩.৫ বান্দুরা এবং ওয়ালটার্সের সামাজিক শিখন তত্ত্ব (Social Learning Theory of Bandura and Walteres)

বান্দুরা এবং **ওয়ালটার্স** (1963) বলেন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে 'মডেল' আচরণ করতে পারে। তারা ব্যক্তির শিখনের জন্য সক্রিয় পরিবর্তনের ব্যাখ্যা সমর্থন করেননি। পরে বান্দুরা এবং ওয়ালটার্স তাদের খুবই জনপ্রিয় 'মডেলিং'-এর তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। তিনি একে সামাজিক শিখন তত্ত্ব (Social Learning Theory) বলে নামকরণ করেন। বান্দুরা মনে করেন শিশুরা তাদের জনপ্রিয়, যেমন — পিতা-মাতা, ভাই-বোন, শিক্ষক, সহপাঠী এবং টিভির হিরো ইত্যাদিদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সামাজিক আচরণ করে।

মডেলিং-এর শ্রেণিভাগ (Types of Modelling)

বান্দুরার (1969) মতে 'মডেলিং আচরণকে' তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন —

(ক) নিবৃত্তিকারী — নিবৃত্তিকারী নয় এমন প্রভাব (Inhibitory Disinhibitory Effect), (খ) আচরণ সৃষ্টিকারী প্রভাব (Eliciting Effect) এবং (গ) মডেলিং প্রভাব (Modelling Effect)।

(ক) নিবৃত্তিকারী (Inhibitory Disinhibitory Effect) :

সাধারণত যখন সমাজের প্রতি আমাদের আচরণের প্রভাব সুখকর হয় না তখন আমরা সেই আচরণ থেকে নিবৃত্ত হই। এইভাবে কোন্ আচরণ আমরা করব বা করব না তা নির্ভর করে অন্যদের আচরণের উপর যা আমরা সচরাচর দেখে থাকি। বান্দুরা দেখিয়েছেন (1967) কীভাবে শিশুরা কুকুর দেখে ভয় পায় না। তিনি কতকগুলি শিশুকে ফিল্ম্ দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে শিশুরা কুকুর দেখে ভয় না পেয়ে তাদের সঙ্গে (কুকুরের সঙ্গে) খেলা করেছিল। তিনি পরে দেখেছিলেন যে শিশুরা পূর্বে কুকুরকে দেখে ভয় পেয়েছিল, তারা আর ওই ফিল্ম্টি দেখার পর কুকুরকে ভয় পেত না।

(খ) আচরণ দৃষ্টিকারী (Eliciting Effect)

আচরণ সৃষ্টিকারী মডেল হল, যে মডেল ব্যক্তির মধ্যে নতুন আচরণের জন্ম দেয়, যেমন — যখন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী ক্যানসার আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে সময় ব্যয় করে তা দেখে তাদের বন্ধু বা সহপাঠীও স্বেচ্ছায় জনগণের জন্য কিছু করার উৎসাহবোধ করে।

(গ) মডেলিং-এর প্রভাব (Modelling Effect)

সবশেষে 'মডেলিং-এর ফল' বলতে বোঝায় মডেল পর্যবেক্ষণ করে শিশুর মধ্যে নতুন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা। এই শ্রেণিটির গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত তাৎপর্য দেখা যায়। যেমন — শিশুরা তাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সহপাঠীদের লক্ষ করে নতুন আচরণ শেখে। আবার যখন কোনো শিশু দেখে তার দাদা আলমারি থেকে বই সংগ্রহ করার জন্য ঘরের একটি চেয়ার আলমারির নিকট নিয়ে যায়, তখন ওই শিশু উচ্চস্থানে অবস্থিত প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু সংগ্রহার্থে চেয়ার বা ওই জাতীয় কিছু সেই স্থানে নিয়ে যায়।

বান্দুরা (Bandura) তাঁর সামাজিক শিখন তত্ত্বে আরও বলেছেন, মানব শিশু কতকগুলো ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তবে জন্ম মুহূর্তে সে ক্ষমতাগুলো যে সক্রিয় থাকবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি এরকম পাঁচটি বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছেন —

ক. মানব শিশুর মধ্যে জন্মগতভাবে বিন্যস্ত প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া থাকে।

খ. মানব শিশুর মধ্যে সাংকেতিকরণের ক্ষমতা বর্তমান থাকে। এই ক্ষমতার দ্বারা শিশু তার যে-কোনো বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতাকে মানসিক কল্পে রূপান্তর করে। এবং এর প্রভাবে শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে যে সংকেতগুলো দেওয়া হয়েছে তা হলো জ্ঞানমূলক অবস্থা।

গ. শিশুদের পূর্বানুমানের ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতা শিশুর আচরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

ঘ. শিশুদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ বা অনুকরণের মাধ্যমে শিখনের ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতাকে বান্দুরা ভিকেরিয়াস লার্নিং (Vicarious Learning) বলেছেন। এই ক্ষমতার মাধ্যমে শিশু ভাষা অনেক আচরণ অনুকরণের মাধ্যমে আয়ত্ত করে।

ঙ. শিশুদের আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে। যার দ্বারা শিশুরা নিজের কোনো অভিজ্ঞতাকে বিচার বিবেচনা করতে পারে এবং তার উন্নতি ও পরিবর্তনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

বান্দুরা এবং ওয়ালটার্সের সামাজিক শিখন তত্ত্ব এবং ভাষার বিকাশ (Social Learning Theory of Bandura and Walters)

বান্দুরার এবং ওয়ালটার্সের সামাজিক শিখন তত্ত্ব মূলত অনুকরণ এবং ভাষার বিকাশের শিখন তত্ত্ব। শিশু তার পিতা-মাতা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যও তার চারপাশের পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দভাণ্ডারের বৃদ্ধি এবং বাক্যবিন্যাসের দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ভাষার বিকাশ ঘটায়। বান্দুরার সামাজিক শিখন তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিশু যেহেতু অনুকরণ এবং চারপাশের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষার ব্যবহারিক ক্ষমতা রপ্ত করে তাই শিশুর ভাষার বিকাশ অনেকটা তার পরিবেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপর নির্ভর করে।

৯.৪ ভাষার ব্যবহার : টার্নটেকিং, মিথস্ক্রিয়া, কথোপকথন এবং শ্রবণ (The Use of Language : Turntaking, Interaction, Conversation and Listening)

৯.৪.১ টার্ন টেকিং (Turn Taking)

কোনো আলোচনা বা কথপোকথন তখনই সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় যখন অংশগ্রহণকারীরা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে একে অপরকে সুযোগ দিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। এই কথপোকথন বা আলোচনার একটি সংঘটিত দক্ষতা বা গঠন হল টার্ন টেকিং (Turn Taking) যেখানে অংশগ্রহণকারী বক্তারা একে একে নির্দিষ্ট সময় মেনে নিজের বক্তব্য বলবেন ও অন্যকে বলার সুযোগ করে দেবেন। কথপোপথনকে দীর্ঘায়িত করা, সংযোজন করা, পূর্বে উল্লিখিত কোনো বিষয়ের উত্তরদান, অন্য বক্তার বলার সুযোগ তৈরি করা এবং বিভিন্ন ভাষাগত (Linguistic) ও অ-ভাষাগত (Non-linguistic) সূত্র ব্যবহার — এইসব নিয়েই সংগঠিত কথপোকথনের রূপ হল টার্ন টেকিং বা পালা বদল।

টার্ন টেকিং কৌশল (Turn taking Strategies)

কথপোকথনে পালাবদল বা টার্ন টেকিংকে সফল ও নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার জন্য কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সফল বা ফলপ্রসু পালাবদলের জন্য Bygate (1987) পাঁচটি সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন : "First, it involves knowing how to signal that one wants to speak. ... Second, it means recognizing the right moment to get a turn. ... Thirdly, it is important

to know how to use appropriate turn structure in order to use one's turn properly and not lose it before finishing what one has to say. ... Fourthly, one has to be able to recognize other people's signal of their desire to speak. ... And fifthly, one needs to know how to let someone else have a turn. (*Speaking*; Oxford, OUP).

উত্তম টার্ন টেকিং-এ সাধারণত ৩টি (তিনটি) ধাপ পরিলক্ষিত হয় :

১) পালা নিয়ন্ত্রণ (Taking Control of Turn) : বক্তা কথপোকথনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

২) পালা ধারণ (Holding a Turn) : বক্তার বক্তব্য যে শেষ হয়নি, তিনি আরো সময় চান, তার বার্তা দেওয়া।

৩) পালা বর্জন (Relinguishing a Turn) : বক্তা তার নিজের মতামত সম্পন্ন করার পর অন্যকে বলার সুযোগ করে দেন।

অধিক্রমণ (Overlapping)

কথপোকথনে অধিক্রমণ বা overlapping কথপোকথন তথা পালা বদলের ধারাকে প্রভাবিত করে। একজন বক্তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই অন্য বক্তা যদি তার বক্তব্য পেশ করেন তাহলে তা overlap হয়ে যায়। ফলে কথপোকথন বাধাপ্রাপ্ত হয় ও ভাব ক্ষুণ্ণ হয়। উত্তম কথপোকথন বা পালা বদলে overlapping বর্জনীয়। একসাথে অনেক বক্তা বক্তব্য রাখলে শ্রোতাদের কাছেও তা বিরক্তিকর ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

লিঙ্গ এবং টার্নটেকিং (Gender and Turntaking)

কথপোকথনে অংশগ্রহণকারী বক্তাদের পালাবদল পদ্ধতিকে যে সব উপাদান বা বিষয় প্রভাবিত করে তার মধ্যে লিঙ্গ অন্যতম। পুরুষ ও মহিলা যখন একত্রে পালাবদলে অংশগ্রহণ করে তখন তাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই রকম পালাবদলে পুরুষেরা অনেক সময় মহিলাদের বক্তব্যের সময় বাধার সৃষ্টি করে, overlapping-এর পরিমাণ অনেক বেশি হয় এবং সুষ্ঠু পালাবদল সম্ভব হয় না। সমীক্ষাতে এও দেখা গেছে যে অনেক সময় কোনো একজন মুখ্য অংশগ্রহণকারী লিঙ্গ নির্বিশেষে অন্যদের পালার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেন এবং পুরো বিষয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ করেন। সামাজিক মিথস্ক্রিয়াতে ভাষা এবং কথপোকথন প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে ও সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে। তাই এই ধরনের অসাম্য আলাপচারীতা বৃহৎ লিঙ্গগত বিভেদ তথা তারতম্যকে নির্দেশ করে, যা সর্বদা বর্জনীয়।

৯.৪.২ মিথস্ক্রিয়া (Interaction)

মিথস্ক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যেখানে একজন অংশগ্রহণকারীর কাজ অন্য অংশগ্রহণকারীর কাজকে প্রভাবিত করে। মিথস্ক্রিয়াতে অংশগ্রহণকারীরা যে সর্বদা মানুষ বা সজীব কোনো কিছু হতে হবে এমন না। মানুষ ও মেশিনের (যেমন computer ইত্যাদি) মধ্যেও মিথস্ক্রিয়া হতে পারে, মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়াতে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মতামত, প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ইত্যাদি বিনিময় করেন এবং নিজেকে নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন।

৯.৪.৩ কথোপকথন (Conversation)

যোগাযোগ প্রক্রিয়াতে কথপোকথন হল একটি নির্দিষ্ট ধরনের মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি যেখানে সাধারণত তথ্যের আদানপ্রদান করা হয় এবং ভাষার প্রত্যক্ষ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত মনুষ্য প্রজাতিই কথপোকথনে অংশগ্রহণ করে। তথ্য ভাষার মাধ্যমে আদানপ্রদান হয়। কথপোকথনে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম নীতির অনুসরণ করা হয়। কথপোকথন আন্তরব্যক্তি বা অন্তঃব্যক্তি দুই-ই হতে পারে। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন ঘটে, তখন পালাবদল বা Turn taking অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯.৪.৪ শ্রবণ (Listening)

ভাষার শিখন ও বিকাশের জন্য যে চারটি প্রধান দক্ষতার প্রয়োজন হয়, শ্রবণ দক্ষতা তার মধ্যে অন্যতম। শ্রবণ একটি গ্রহণধর্মী (Receptive) দক্ষতা। শ্রবণ দক্ষতার বিকাশ ব্যতিরেকে ভাষার বিকাশ অসম্পূর্ণ। ভাষার অন্য তিনটি দক্ষতা যথা— কথন (speaking), পঠন (reading) ও লিখন (writing)-এর সাথে শ্রবণ দক্ষতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রবণ দক্ষতা বলতে

কথিত ভাষাকে শোনা ও তা বুঝতে পারা (listening and understanding the meaning) বোঝায়। সমগ্র শ্রবণ পদ্ধতিটি তিনটি স্তরে সম্পন্ন হয়। যথা —

১. শ্রবণ পূর্ববর্তী স্তর (Pre-listening Stage) : এখানে শ্রোতা বক্তার কথা সক্রিয়ভাবে শোনে।

২. শ্রবণ মধ্যবর্তী স্তর (While-listening Stage) : শ্রোতা বক্তার কথার অর্থ বুঝতে সচেষ্ট হয়।

৩. শ্রবণ পরবর্তী স্তর (Post-listening Stage) : শ্রোতা কথিত শব্দের অর্থ অনুধাবন করে উত্তর দেয়।

আমরা সাধারণত দুইরকমের শ্রবণ পদ্ধতি দেখি। যথা— ব্যাপক বা বিস্তৃত শ্রবণ (Extensive listening) এবং নিবিড় শ্রবণ (Intensive listening)। আনন্দ বর্ধনের জন্য যে শ্রবণ তা হল ব্যাপক শ্রবণ। এই ধরনের শ্রবণ বার্তা বড়ো হয় এবং শ্রোতাকে এ বার্তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে রাখতে হয় না। নিবিড় শ্রবণের বার্তা ছোটো (short) হয় কিন্তু শ্রোতাকে তা বিশদভাবে শুনতে হয় ও মনে রাখতে হয় কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য।

শ্রবণদক্ষতা বিকাশের কৌশলগুলির মধ্যে দুটি পদ্ধতি খুবই উল্লেখযোগ্য। একটি হলো উচ্চ-নিম্ন কৌশল (Top-Down Strategies), অন্যটি হল নিম্ন-উচ্চ কৌশল (Botton-up Strategies)। Top-Down কৌশলটি শ্রোতাকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে কোনো বার্তা পাবার পর তার অর্থ অনুধাবনের জন্য শ্রোতা ওই বিষয় সম্পর্কিত তার পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং বিষয়টির অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। Botton-up কৌশলটি আবার বার্তানির্ভর। এক্ষেত্রে কোনো বার্তার অর্থ বোঝার জন্য শ্রোতাকে ওই বার্তার ভাষা বা শব্দের উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও শ্রোতার শ্রবণ-দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নির্দেশ (Dictation), সরব কথপোকথনে (Aloud speaking) অংশগ্রহণ, রেকর্ডিং শ্রবণ (Recording), বাচনিক নির্দেশনামা (Verbal instruction) পালন ইত্যাদি কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়।

৯.৫ দ্বিভাষী বা বহুভাষী শিশু (Bilingual or Multilingual Children)

শিক্ষকের ভূমিকা, বহুভাষী শিক্ষার্থী সমন্বিত শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষানীতির উপকরণ হিসাবে গল্প বলা। (Bilingual or Multilingual Children : Implications for teachers, multilingual class-rooms, story telling as a pedagogic tool).

দ্বিভাষী বা বহুভাষী শিশু (Bilingual or Multilingual Children) : এক মন থেকে অন্য মনে অনুভূতি, ধারণা, আদেশ, বক্তব্য বা জ্ঞান-সঞ্চালনের প্রক্রিয়াকেই আমরা যোগাযোগ স্থাপন বলে থাকি। ভাষার মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপনের এই জটিল প্রক্রিয়াকে মানুষ বাস্তবায়িত করতে পারে। মানুষের ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। ভাষার দ্বারাই আমরা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের ঘটনার পৃথক বিবৃতি দিতে পারি। ভাষা প্রকৃতপক্ষে প্রতীক (Symbol) রূপে ব্যবহৃত হয় যোগাযোগের মাধ্যমে। প্রত্যেক শিশু পরিবারের সদস্যগণের সাথে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মাতৃ ভাষায় কথা বলতে শেখে।

যে সমস্ত শিশু দুটি ভাষায় কথা বলার দক্ষতা অর্জন করে তাদের দ্বিভাষী শিশু বলা হয় (Bilingual Children)। অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া যে সমস্ত শিশু আরও একটি ভাষায় কথা বলতে, লিখতে, বুঝতে এবং প্রতিক্রিয়া করতে পারে তাদেরকেই দ্বিভাষী শিশু বলে। এই অন্য একটি ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় ভাষা বা শিশুর পরিবার ভিন্ন রাজ্যে বসবাসের কারণে সেই রাজ্যের ভাষা হয়। একটি উত্তরপ্রদেশের পরিবার দীর্ঘদিন কলকাতায় বসবাস করার কারণে, ওই পরিবারের শিশু মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলা

ভাষা খুব সহজেই বিদ্যালয়ে, খেলারমাঠে, দোকানে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথোপকথোনের মাধ্যমে শিখবে। খেলার মাঠে দলগত খেলায় শিশুরা কথা-বার্তা আদানপ্রদানের মাধ্যমে খুব সহজেই দ্বিতীয় ভাষা শিখতে পারে। গানের সুর প্রত্যেক শিশুর মনে দোলা জাগায়। অন্য ভাষার গানের মধ্য দিয়েও শিশুরা মাতৃভাষা ব্যতীত আরেকটি ভাষা শিখতে পারে। রেডিও টিভি ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রোগ্রাম শোনার মধ্য দিয়েও দুটি ভাষা আয়ত্ত করা যায়। এছাড়া আজকের প্রযুক্তির বিস্ফোরণের যুগে CD, DVD ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য আরেকটি ভাষা শেখা অনেক সহজ হয়েছে।

সাধারণত দুটি ধাপে দুটি ভাষা শেখা যায় :

(ক) এক ব্যক্তি এক ভাষা মডেল (The one person one language model) : যদি দুজন বন্ধুর মাতৃভাষা আলাদা হয়, তাহলে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুজনেই দুটি ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। যে শিশুটির মাতৃ ভাষা বাংলা, সে বন্ধুত্বের আদানপ্রদানের মাধ্যমে হিন্দীভাষী বন্ধুটির মাতৃভাষা হিন্দীতে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

(খ) সংখ্যালঘু ভাষা মডেল (The minority language model) : কোনো পরিবার যখন নিজের প্রদেশ ছেড়ে অন্য প্রদেশে বসবাস শুরু করে তখন শিশুরা ভিন্ন প্রদেশের ভাষা সহজে রপ্ত করে। ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়সমূহতে বিভিন্ন মাতৃভাষার শিশুরা সম্মিলিত হয়ে পারস্পরিক মেলামেশার ফলে আরেকটি ভাষা আয়ত্ত করে। সংখ্যালঘু ভাষা বলতে এখানে শিশুর মাতৃভাষা ব্যতীত ভাষাটিকে বোঝানো হচ্ছে।

যখন শিশুর মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে দুটি ভাষা ব্যবহার করার দক্ষতা জন্মায় তখন তাকে দোভাষী শিশু বলা যায়। বেশিরভাগ শিশুর মধ্যেই একই সঙ্গে দুটি ভাষা শেখার ক্ষমতা থাকে। আজকের বিশ্বে বেশিরভাগ শিশু-ই দুটি বা তার অধিক ভাষা স্বচ্ছন্দে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। যে সমস্ত শিশু দুই বা তার অধিক ভাষা স্বচ্ছন্দে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে তাদের বহুভাষী শিশু (multilingual children) বলা হয়। আজকের বিশ্বে শুধুমাত্র মাতৃভাষায় কথা বলতে পারা শিশুর তুলনায় দ্বিভাষী বা বহুভাষী শিশুর সংখ্যা বহুগুণ বেশি। আজকের শিশু একটি ভাষাতে আবদ্ধ নেই। বিশ্বায়ন এবং আধুনিক সংস্কৃতির জোয়ারে আজকের শিশু বিভিন্ন ভাষার স্বচ্ছন্দ ও সঠিক ব্যবহারের সাবলীলতা অর্জন করেছে।

৯.৫.১ বহুভাষী শিশু সমন্বিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in Multilingual Class-rooms)

বহুভাষী শিশু সমন্বিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কীভাবে নিজ ভূমিকা পালন করবেন, সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় এসেছে। তবে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করলে শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণি-পরিচালনা অনেক সহজ হবে।

১. **রঙিন ছবি সম্বলিত বই-এর ব্যবহার :** শিশুর প্রতিদিনের দিনযাপনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জিনিসপত্র, খেলনা, পরিবেশের জীবজন্তু, মায়ের রান্নাঘরের নানান উপাদান, খাবার ইত্যাদি শিশুর পরিচিত উপকরণের আকর্ষণীয় রঙিন ছবির বই ব্যবহার এক্ষেত্রে সুফল দান করবে। শিশুর চেনা জিনিসপত্রের ছবি, শিশুকে আকৃষ্ট করবে। মাতৃভাষায় শেখা শব্দসমূহর বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষায় প্রতিশব্দ সহজে শিখবে। সেগুলি উচ্চারণের মাধ্যমে এবং লিখিত রূপ অনুযায়ী শিশু আরেকটি ভাষা আয়ত্ত করবে। গণনা শেখানোর সময়ও একই সঙ্গে দুটি বা তিনটি ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. **বাস্তব বা প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহার :** বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, বোর্ড, ঘণ্টা এমনকি দেয়ালের ঘড়ি পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। প্রত্যেকটি বস্তুর বিভিন্ন ভাষার প্রতিশব্দ একই সঙ্গে উচ্চারণের মাধ্যমে বহুভাষী শিশুদের শ্রেণিকক্ষে আকৃষ্ট করা যাবে। বিভিন্ন বস্তুর গঠন, আকৃতি শিশুদের গাণিতিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

৩. **দলবদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ :** অতীতে একটি শ্রেণিকে একটি দল মনে করা হতো, কিন্তু এখন একই শ্রেণিতে কয়েকটি দল গঠন করে পাঠ-পরিচালনার ব্যবস্থা হয়েছে। যদি মাতৃভাষা অনুযায়ী দল গঠন সম্ভব হয়, তাহলে পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পূর্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে, শিশুরা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান গঠন করবে। ছোটো ছোটো দলে নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ থাকলে শিশুদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা আসবে।

৪. **খেলা :** খেলা ও শিক্ষা পরস্পর বিরোধী নয়। খেলা শিশুকে আনন্দ, মুক্তি ও সন্তোষ দান করে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যাবলি যথা জ্ঞান আহরণ, চিন্তাশক্তির উন্নতি, বুদ্ধির উন্নতিসাধন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার তীক্ষ্ণতার উন্নয়ন খেলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঘটে। বহুভাষী শিক্ষার্থীরা একত্রে খেলার সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরেকটি ভাষা শিখতে পারে। শিক্ষক যতটা সম্ভব বিভিন্ন ভাষাকেই যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করবেন এবং শিক্ষার্থীদের অন্যান্য ভাষা ব্যবহারে উৎসাহ দেবেন। শিক্ষার্থীদের উচ্চারণের ত্রুটি বা শব্দ প্রয়োগে ত্রুটি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দেবেন।

৫. **সাংস্কৃতিক কার্যাবলির আয়োজন :** বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত গুণাবলির প্রকাশ ও বিকাশের সুযোগ ঘটে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দিবস পালন বিশেষত স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্ম দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়-ঐক্য, জাতীয়-সংহতি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবহৃত ভাষা বিভিন্ন হলেও আমরা প্রত্যেকে এই মহান দেশ ভারতবর্ষের নাগরিক এই জাতীয় চেতনা বিদ্যালয় জীবন থেকে প্রত্যেক শিশু-শিক্ষার্থীর অন্তরে প্রোথিত করবেন শিক্ষক। বিভিন্ন ভাষার দেশাত্মবোধক গান শিশুদের শেখানো যেতে পারে। মহাপুরুষদের জন্ম দিবস পালন উৎসবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন তিনি কোন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, তার ভাষা কী ছিল এবং তিনি কীভাবে দেশের জন্য আত্মনিবেদন করেছেন।

৯.৫.২ বহুভাষী শিক্ষার্থী সমন্বিত শ্রেণিকক্ষ (Multilingual Children in Class-rooms)

সুবিশাল দেশ ভারতবর্ষে নানা ভাষার মানুষ বসবাস করেন। ভিন্ন ভিন্ন তাদের ধর্ম এবং বৈচিত্র্য ভরা তাদের সংস্কৃতি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এই দেশের অধিবাসী। এই বিভিন্ন ভাষা, জাতি, সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই ভারতের ঐতিহ্য। ভাষার এই বিভিন্নতাকে গুরুত্ব না দিয়ে, কোনো একটি ভাষাকে প্রধান ভাষার মর্যাদা দিয়ে আইন, প্রশাসন এবং জনগণের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় আদর্শ নয়। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের এই বহুভাষী বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। মুম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নয়টি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। কর্ণাটকে আটটি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে চোদ্দটি ভাষার মধ্য থেকে বাছাই করার সুযোগ আছে। কোঠারি কমিশনের (1964-66) ত্রিভাষা সূত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাকে (Multilingualism) পরিপুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই সুপারিশ করা হয়েছিল। এই ত্রিভাষা সূত্র বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যদিও কিছু সমস্যা আছে।

ভারতবর্ষের পাঁচশত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বহুভাষী শিক্ষার্থী সমন্বিত শ্রেণিকক্ষে হিন্দি এবং ইংরাজি এই দুটি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন ভাষা হিসাবে সংস্কৃতও বাধ্যতামূলক। পাঁচশত নবোদয় বিদ্যালয়েও হিন্দি এবং ইংরাজি দুটি ভাষাই শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে প্রচলিত।

আজকের দিনে জীবনযাত্রার ধরনের পরিবর্তন-এর ফলে মানুষ শুধুমাত্র নিজের প্রদেশে আবদ্ধ নেই। যে-কোনো বড়ো শহরে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের মহাসম্মেলন ঘটেছে। যার ঢেউ আছড়ে পড়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙিনাতে। এই বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা, উর্দু, সাঁওতালি, অলচিকি, হিন্দি, তেলেগু, বিহারি, মারাঠি ইত্যাদি বিভিন্ন মাতৃভাষার শিশু মিলিত হয়েছে। এই বিভিন্ন মাতৃভাষার শিশু-শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ মাতৃভাষার সঙ্গে যে প্রদেশে বাস করছে সেই প্রদেশের ভাষা এবং একই সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষা (2nd Language) হিসাবে ইংরাজি শিখবে। শিক্ষক সহজ, সরল, সর্বজনগ্রাহ্য ভাষাতে নির্দেশনা দেবেন। অধিক পরিমাণে ছবি, শিখন-শিক্ষণ উপকরণ (LTM), গান, গল্পের আয়োজন করবেন। সম্ভব হলে অন্যান্য ভাষা শুদ্ধ উচ্চারণে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। শিশু-শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ এবং শব্দ-প্রয়োগের যথার্থতার উপর নজর রাখবেন।

৯.৫.৩ শিক্ষানীতির উপকরণ হিসাবে গল্প বলা (Story telling as a pedagogic tool)

নানান দেশে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে গল্প বলা ও গল্প শোনার মধ্য দিয়ে আনন্দ ঘন মুহূর্ত, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, সংরক্ষণ করা এবং সঞ্চালন করার প্রচলন চলে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। গল্প শোনার মধ্য দিয়ে শৈশব থেকে জীবন সম্বন্ধে ধারণা গড়ে ওঠে যদিও বাস্তব জগৎ এবং কাল্পনিক জগতের পার্থক্য অতি শৈশবে করা যায় না। তথাপি গল্প শোনার

মধ্য দিয়েই শিশুদের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়ে ওঠে। গল্প বলার মাধুর্যে যে আবেগ ও অনুভূতিপূর্ণ পরিবেশ রচিত হয়, তা ঘটনা এবং তথ্যকে গল্পে বেশি শিশু মনোগ্রাহী, প্রাণবন্ত, প্রাসঙ্গিক ও স্মৃতি সহায়ক করে তোলে। গল্পের জাদু শিশু থেকে বয়স্ক সকলকেই সমানভাবে আকৃষ্ট করে।

গল্প বলা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ কার্যকরী কৌশল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে গল্প বলার কার্যকারিতার ওপর গবেষণা করে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষে গল্প বলাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য, তারা হলেন —

১. আমিন হক

২. অপর্ণা আদ্রিজা

৩. গীতা রামানুজম

৪. সারিগা মেনন

৫. শ্রেয়া বিশ্বাস

৬. সৌম্য শ্রীনিবাসন

৭. স্বাতী কাকোর্কর

আমিন হক : বাঙ্গালোর স্টোরিটেলিং সোসাইটির মেম্বার। গল্প বলার ক্ষেত্রে নাটকীয়তাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি নানা ধরনের সুর, মুখোশ, ছবির কার্ড, গান ইত্যাদি ব্যবহার করে গল্পের চরিত্রগুলিকে আরও প্রাণবন্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। শিক্ষার বিষয়বস্তুকে এইভাবে গল্পের মাধ্যমে শিশুর কাছে পৌঁছে দিলে শিখন দ্রুত এবং স্থায়ী হবে।

অপর্ণা আদ্রিজা : Kid and Parent Foundation স্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন স্কুল এবং NGO-তে গল্পবলার মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। গল্প শোনা শিশুর বাচনিক বিকাশ, নৈতিক বিকাশ, স্মৃতি শক্তির, যুক্তি-বোধ ও বিচার শক্তির এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়।

গীতা রামানুজন : কথালয় এবং অ্যাকাডেমি অফ স্টোরিটেলিং (Kathalaya and Academy of Story telling)-এর director, গল্প-বলাকে শিক্ষা গ্রহণ ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের কৌশল হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করেছেন। গীতা রামানুজন গল্প বলাকে শিখনের কৌশল হিসাবে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেছেন।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ : শিখনের এই কার্যকরী কৌশলটিকে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে শেখার কঠিন বিষয়বস্তুকে সরল করে শিক্ষার্থীর নিকট সহজ গ্রহণযোগ্য করে পৌঁছে দিতে পারেন। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের মূলভাব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে, বিষয়ে মনোযোগী হবে এবং বিষয়টি স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে। গল্প বলার মধ্য দিয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি করে, শিশু-শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারবেন। গল্পের মাধ্যমে বিষয়কে সংগঠিত করে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত করতে পারলে শ্রেণিকক্ষে যে পরিবেশ তৈরি হয়, তাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভীতির সম্পর্ক দূরীভূত হয়ে, মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শিখনের কৌশল রূপে গল্প বলাকে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে।

১. নতুন ধারণা ও চিন্তার সূচনাকালে উপযুক্ত গল্প পরিবেশন করা।

২. গল্পের মাধ্যমে কোনো বিষয় বা রূপক বর্ণনা করা।

৩. ঐতিহাসিক ঘটনা গল্পের মাধ্যমে বলার সময় যথাযথ সময়কাল এবং খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করে বলতে হবে।

৪. শিখনের বিষয়বস্তু গল্পের রূপে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত করা।

৫. প্রচলিত গল্পের বিভিন্ন দিক, নৈতিক মূল্যবোধ বা চরিত্রগুলিকে পাঠ্যক্রমিক বিষয়সমূহের সঙ্গে সমন্বিত করা।

শিক্ষাগত উদ্দেশ্যাবলি (Educational Objectives)

গল্প শোনার মাধ্যমে শিশুর

১. বাচনিক দক্ষতার উন্নতি ঘটে। শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। শব্দ, বাক্য ভাষার প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২. দুঃসাহসিক গল্পের নায়কের বৈশিষ্ট্য নিজের ওপর আরোপ করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

৩. ঘটনার অর্থ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিচার-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৪. কল্পনা-শক্তির বিকাশ ঘটে।

৫. তথ্য ও বক্তব্যের গভীরতা অনুধাবনের ক্ষমতা জন্মায়।

৬. উচ্চস্তরের জ্ঞানমূলক চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে।

৭. শিখন দক্ষতার উন্নতি ঘটে।

৯.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

- ভাষা বাচনিক, লিখিত এবং শারীরিক (অ-বাচনিক) হয়।
- ভাষার গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপাদান হল ধ্বনি (Phonology), শব্দার্থ (Semantics), বাক্যগঠন বা বাক্যবিন্যাস (Syntax) এবং প্রায়োগিক দিক (Pragmatics)।
- শিশুর ভাষা বিকাশে প্রথম বছর বাবলিং, দ্বিতীয় বছর হল হলোফ্রেজেজ-যুগ্ম শব্দ ব্যবহার, তৃতীয় বছর অর্থের নিয়মানুগ পরিবর্তন ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।
- ভাষা বিকাশে Operant conditioning অর্থাৎ ধনাত্মক শক্তিদায়ক সত্তার ভূমিকা বর্তমান।
- ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে টার্নটেকিং, মিথস্ক্রিয়া, কথোপকথন এবং শ্রবণ করার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- টার্নটেকিং-এর দুটি প্রধান বিষয় হল ফ্রিকোয়েন্সির মাত্রা ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা।
- উত্তম টার্নটেকিং-এর কৌশলগুলি হল স্ব-নির্বাচন, টার্নটেকিং-এর সংকেত এবং টার্নটেকিং ও লিঙ্গ।
- কথোপকথনের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগগুলি হল— (১) অন্যান্যদের সম্পর্কে কথোপকথন, (২) কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কথোপকথন, (৩) ব্যক্তিগত ভাবনা সম্পর্কে কথোপকথন, (৪) নৈর্ব্যক্তিক তথ্য সম্পর্কে কথোপকথন।
- শ্রবণবোধের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি হল উচ্চ-নীচ, নিম্ন-উচ্চ এবং পারস্পরিক প্রক্রিয়া।
- শিশুরা দুটি ধাপে দুটি ভাষা শেখে। (ক) এক ব্যক্তি এক ভাষা মডেল, (খ) সংখ্যালঘু ভাষা মডেল।

৯.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. ______________ বিকাশ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ঘটে—

(ক) দৈহিক বিকাশ (খ) ভাষার বিকাশ

(গ) সামাজিক বিকাশ (ঘ) নৈতিক বিকাশ

২. শিশু দ্রুত অর্জন করে—

(ক) সমস্ত ভাষা (খ) বিদেশী ভাষা

(গ) আঞ্চলিক ভাষা (ঘ) জাতীয় ভাষা

৩. কোনটি ভাষার উপাদান নয়?

(ক) শব্দার্থ (খ) ধ্বনি

(গ) বাক্যবিন্যাস (ঘ) শব্দভাণ্ডার

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বহুভাষী শ্রেণীকক্ষ কাকে বলে?

২. ভাষার উপাদানগুলি কী কী?

৩. ভাষা ও বাচনের পার্থক্য লেখ।

C. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. বহু ভাষাভাষী শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণপদ্ধতি হিসাবে গল্পবলাকে আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন?

২. টার্নটেকিং-এর বিভিন্ন কৌশলগুলি বর্ণনা করো।

৩. কথোপকথনের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করো।

৪. বহুভাষী শিশু সমন্বিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করো।

৫. ভাষা বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি বর্ণনা করো।

D. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ভাষার উপাদানগুলি কী কী? ভাষা বিকাশের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা দাও।

অধ্যায় ১০

যোগাযোগ
(Communication)

১০.১ সূচনা (Introduction)
১০.২ উদ্দেশ্য (Objectives)
১০.৩ যোগাযোগ (Communication)
১০.৪ শিশুরা কীভাবে যোগাযোগ করে? (How do children Communicate?)
১০.৫ ভাষার ক্ষেত্রে সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (Socio-cultural variations in Language)
১০.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)
১০.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

১০.১ ভূমিকা (Introduction)

যোগাযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য, সংবাদ, আদেশ, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে সঞ্চালিত হয়। সাধারণত ভাষার মাধ্যেমেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কথাবার্তাই আমাদের অপরের সঙ্গে মনের ভাবের আদানপ্রদানের প্রধান মাধ্যম। ছোট্ট শিশু কান্নার মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। সমাজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নানাভাবে ভাষাকে প্রভাবিত করে। অঞ্চলভেদে একই ভাষার উচ্চারণে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

১০.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১। যোগাযোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ।
২। যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।
৩। শিশুরা কীভাবে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে তা জানা।
৪। সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য কীভাবে ভাষাকে প্রভাবিত করে, সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।
৫। অঞ্চল ভেদে, সাংস্কৃতিক পার্থক্যে কীভাবে একই ভাষার উচ্চারণে (Accent) পার্থক্য সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।
৬। একই শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।

১০.৩ যোগাযোগ (Communication)

Communication শব্দটির উৎপত্তি মূল ল্যাটিন শব্দ Communis— যার অর্থ 'to make common' অর্থাৎ অপর ব্যক্তির সঙ্গে মনের ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে সাধারণীকরণ বা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। নানাভাবে আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করতে পারি। সাধারণভাবে ভাষার মাধ্যমেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কথার্বাতা আমাদের মনের ভাবের আদানপ্রদানের প্রধান মাধ্যম।

অধ্যাপক লুইস অ্যালেন (Lous Allen)-এর মতে, "অন্য ব্যক্তির মনের মধ্যে উপলব্ধি জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে একজন ব্যক্তি যা কিছু করেন তাই হল যোগাযোগ। যোগাযোগ অভিপ্রায় প্রকাশের সেতু। সু-ব্যবস্থিত ও ধারাবাহিক বর্ণন, শ্রবণ এবং উপলব্ধি করানো এর অন্তর্গত"। "Communication is the sum total of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding."

যোগাযোগের সংজ্ঞা : যোগাযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য, সংবাদ, আদেশ, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে সঞ্চালিত করা হয়। যোগাযোগের উদ্দেশ্য হল জ্ঞাপন করা, উপলব্ধি জাগানো এবং প্রভাব বিস্তার করা।

যোগাযোগের উদ্দেশ্যসমূহ :

প্রত্যেক ধরনের যোগাযোগের পিছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

যোগাযোগের উদ্দেশ্যাবলি হল :

(ক) বার্তা প্রদান, গ্রহণ বা বিনিময় করা

(খ) কোনো বিশেষ ফর্মে বা সম্পর্কসমূহ বজায় রাখার জন্য যোগাযোগের ব্যবহার

(গ) একজন যেভাবে চিন্তা করে বা কাজ করে সেই অনুযায়ী অপরকে চিন্তা করানো

(ঘ) আমরা যা চিন্তা করি ও কাজ করি সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

(ঙ) আমাদের কল্পনাকে প্রকাশ করা আমাদের কাছে ও অপরের কাছে

(চ) কোনো কথার অর্থ অনুধাবন করা এবং এই সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার অর্থ উপলব্ধি করা

শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত চক্রের আকারের পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

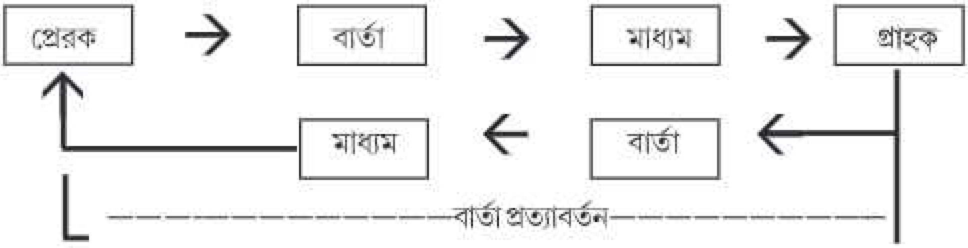

প্রেরক বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজস্ব ভাবনা বা তথ্যকে গ্রহণযোগ্য বার্তায় পরিণত করে। এই বার্তাকে উপযুক্ত মাধ্যমের মধ্য দিয়ে গ্রাহকের কাছে পাঠায়। গ্রাহক সেই বার্তা নিজের মতো করে গ্রহণ করে এবং কখনও প্রেরকের কাছে প্রত্যাবর্তন করে।

১০.৪ শিশুরা কীভাবে যোগাযোগ করে? (How do children Communicate?)

শিশুর কান্নাই হল প্রথম যোগাযোগের মাধ্যম যাকে কুইং বলা হয়। এটিই শিশুর প্রথম শব্দ ও ভাষা। কিন্তু এই কান্না ধীরে ধীরে একটি ভাবপ্রকাশের রূপ নেয়। ছমাস (৬ মাস) বয়সে এই পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সে এই বয়স থেকে শুধু শুধু কাঁদে না। কোনো বিশেষ, অসুবিধা বোঝানোর জন্য সে কাঁদে। খিদে পাওয়ার জন্য, ভিজে যাওয়ার জন্য, যন্ত্রণার জন্য, একা থাকার জন্য এবং সংযোগ স্থাপনের জন্য সে কাঁদে। কোনো নতুন লোক দেখলে কাঁদে, নতুন পরিবেশে কাঁদে। এইভাবে কান্না তার মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়। কয়েক মাস পরে মুখে অদ্ভুত শব্দ করে। অর্থহীন শব্দ হলেও তা যেন শিশুর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা। আনন্দে গড় গড় শব্দ করে। তিন-চার মাস বয়স থেকেই শিশু অনুভব করে যে সে কাঁদলেই পরিবারের লোকজন প্রতিক্রিয়া করছে। শিশুর কান্নার পরিপ্রেক্ষিতে যখন পরিবারের সদস্যগণ প্রতিক্রিয়া করে, তখন থেকেই শিশুর যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়। ঘুম ভেঙে গেলেই শিশু কাঁদতে আরম্ভ করে কারণ সে একা থাকতে চায় না এবং সবসময়ই অন্যান্যদের মনোযোগ প্রত্যাশা করে। জন্মের পর প্রথম বছর ভাষার বিকাশ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ছ-মাসের (৬ মাস) পর আধো আধো শব্দ করে যাকে ব্যাবলিং (Babbling)

বলে। তবে নয় দশ মাস বয়স থেকে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য সে কিছু ভাষা ব্যবহার করে। এক বছর বয়সে সে বাবা-মা ইত্যাদি চার পাঁচটি শব্দ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এর পরেই প্রায় দেড় বছর বয়স থেকে তার ভাষার বিকাশ দ্রুততর হয় এবং দু বছরে সে অনেক শব্দ আয়ত্ত করে।

প্রারম্ভিক শৈশবে শিশু শব্দের অর্থ বুঝতে পারে না কিন্তু সকলের এদিক ওদিক চলাফেরা বা গলার স্বর বা অন্যান্য হাবভাব এর পরিবর্তন শিশুর যোগাযোগ স্থাপনের সূত্রপাত করে ।

১৮ থেকে ২৪ মাস বয়সে শিশু সবে মাত্র টলতে টলতে হাঁটা শুরু করে আর সেই সময় থেকেই শব্দের ক্রিয়া শুরু করে। এই সময় শব্দের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিশু ব্যাকরণগত শব্দ উচ্চারণ করে। শিশুর মধ্যে শব্দ সংযুক্তিকরণ ঘটে। 'মা যাব' অথবা 'জুতো পরব' ইত্যাদিতে এবার শিশু শব্দের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি করে। জোরে অথবা বিকৃত স্বরে শব্দ উচ্চারণ করে। শারীরিক বা দৈহিক নড়াচড়া বা পরিবর্তন বা সঞ্চালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু যখন হাঁটা শুরু করে তখন তার মুখের ভাষাতে ব্যাকরণ যুক্ত হয়ে যায় এবং সুন্দরভাবে যোগোযোগ স্থাপন করে। শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে পারে। Gillian Mc. Namec-এর মতে "Babies and toddlers might use the same word to indicate wanting different things such as food, comfort and play. They might also use this word with different intentions to express upset as well as excitement."

শিশুরা যত বড় হতে থাকে, শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরে বাক্য দিয়ে, গান, গল্প ইত্যাদির দ্বারা অপরের সঙ্গে সংযোগ সাধান করে। বড়োদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ তথা বৃহত্তর যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

যোগাযোগের অর্থ হল চিন্তা বা অনুভূতির বিনিময়। এই বিনিময়ের কয়েকটি মাধ্যম হল—

- অঙ্গভঙ্গি (Gesture)
- আবেগের প্রকাশ (Emotional Expression)
- বলার ও লেখার মাধ্যম (Speech and Writing)

তবে সার্থক যোগাযোগের জন্য কয়েকটি জিনিসে দক্ষতার প্রয়োজন হবে, যেমন—

- অন্যদের শোনা, পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের বক্তব্য বুঝতে পারা
- নিজের বক্তব্যের এবং অনুভূতির প্রকাশ এমনভাবে করতে হবে যাতে অপরজন খুব সহজেই যেন বুঝতে পারে।

নিম্নলিখিত কিছু বিষয়ের উপর আমরা বড়োরা জোর দিলে শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে। যেমন—

(১) শিশুদের সঙ্গে কথা বলার আগে তাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করা খুব দরকার। তার কারণ তারা একটি সময়ে মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। অর্থাৎ শিশুদের সঙ্গে আগে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে তবেই তাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করা যাবে।

(২) শিশুর স্তরে সে গিয়ে শিশুর সমকক্ষ যদি নিজেকে করা যায় তাহলে খুব সহজেই কিন্তু যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। অর্থাৎ যে কথা বলছে এবং যে শুনছে তারা যদি সমান স্তরের হয় তখন যোগাযোগ কিন্তু কার্যকরী হয়ে ওঠে।

(৩) শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় মনে যা আসবে তাই বলতে হবে। শিশুকে যা করতে বলা হবে তা তাকে স্পষ্টভাবে বলা ও কেন করতে হবে তাও বোঝাতে হবে। তাহলে কিন্তু কোনো নির্দেশ দিলে তা স্পষ্ট ও স্থায়ী হবে। শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের ভাষা এবং অভিব্যক্তি ইতিবাচক যেন হয়, তাতে শিশুর কাছে যা প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা পূর্ণ হবে।

(৪) শিশুকে দেওয়া অনুরোধ ও নির্দেশ অবশ্যই যেন সহজ হয়, তা না হলে একাধিক নির্দেশ ও অনুরোধ তাদের বিভ্রান্ত হবে। তাই তা স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই।

(৫) শিশুর কাছে সবসময়ই ইতিবাচক যোগাযোগ অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে কী করবে তার উপর যেন বেশি জোর দেওয়া হয়।

(৬) আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের শিশুর সঙ্গে কথা বলতে হবে, শিশুর প্রতি নয়। তার মানে শিশুকে বোঝাতে হবে যে যোগাযোগ এটা শুধু একতরফা বলা নয়, শোনাটাও প্রয়োজন। আমরাও যেন শিশুর কথা শুনতে চাই তা যেন শিশু বোঝে।

(৭) শিশুকে কথা বলতে উৎসাহিত করতে হবে। শিশু যখন কিছু বলতে চাইছে তখন আমাদের কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং সব সময় সে আবহাওয়া তৈরি করার জন্য যোগাযোগ চালিয়ে যেতে হবে।

১০.৫ ভাষার ক্ষেত্রে সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (Socio-cultural variations in Language)

সমাজের তৈরি সমস্ত আচার-আচরণ দক্ষতা, ও জ্ঞানের ভাণ্ডারকে একসঙ্গে বলা হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হল মানুষ ও প্রকৃতির মিলিত রূপ। প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যেসব উপকরণ সৃষ্টি করে তাদের সমষ্টিগত রূপই সংস্কৃতি বলে পরিচিত। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ই. বি. টাইলর সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল, সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ যে সামগ্রিক জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নিয়ম, রীতিনীতি এবং অন্যান্য সক্ষমতা ও অভ্যাস অর্জন করে, তাই হল সংস্কৃতি।

যেহেতু বিভিন্ন জাতির মধ্যে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক পশ্চাৎপট এবং ভৌগোলিক পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, সেই কারণেই বিভিন্ন জাতি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে সংস্কৃতির সাদৃশ্যের থেকে অনেক বেশি পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য ভাষা এবং ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যের মধ্যে শব্দের উচ্চারণ বা Accent অন্যতম।

ভাষা হল সামাজিক জীবনের যোগাযোগের মাধ্যম। সমাজবদ্ধ জীব ভাষার মাধ্যমেই পরস্পরের মনোভাবের আদানপ্রদান করে। সমাজ-সংস্কৃতির ধরণ ও সঞ্চালন ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়। একটি সমাজের ভাষা, সেই সমাজের সংস্কৃতি বহন করে চলে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত। যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা ভাষা তথাপি আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির বিভিন্নতার ফলে বাংলা ভাষার শব্দের উচ্চারণ, বাক্যের সুর, টান বিভিন্ন ধরনের। কলকাতা শহরের প্রচলিত বাংলার সঙ্গে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার কথ্য বাংলায় যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে তা সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতির বিভিন্নতার জন্যই একেকটি জেলায় ভাবপ্রকাশের প্রকৃতি বিভিন্ন এবং ভাষাতেও তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষত শিল্পনগরীসমূহ বিভিন্ন প্রদেশের বহুভাষার মানুষ, পেশাগত কারণে সম্মিলিত হয়ে, এক ধরনের সমাজ গড়ে তোলেন এবং মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভাষার মানুষের শব্দ-উচ্চারণ, কথা বলার ভঙ্গি, আদব-কায়দা, আদানপ্রদানের মাধ্যমে মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হয় এবং তা ভাষাকেও প্রভাবিত করে।

- **উচ্চারণ (Accent)**

উচ্চারণ বা Accent হল ভাষা ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে আমরা লক্ষ করি যে, একই শব্দ অঞ্চলভেদে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ উচ্চারিত শব্দে 'শ'-এর উচ্চারণ অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন হয়। আবার অভিজাত অঞ্চলে

বসবাসকারী ব্যক্তিগণ যেভাবে উচ্চারণ করেন, একই শব্দ বস্তি অঞ্চলে আলাদাভাবে উচ্চারিত হয়। সমাজ-ভাষাতত্ত্ব বিশারদ্গণ (Socio Linguistic) একেই ভাষার ব্যবহারে উচ্চারণ বা Accent বলে উল্লেখ করেছেন। ইংরাজি অভিধানে একটি শব্দ কীভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত তা 'Consonant' বা 'Vowel'-এর উপর নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। এক কথায় বলা যায়, উচ্চারণ বা Accent হল pronunciation-এর পার্থক্য (Difference in pronunciation)। অনেকে Accent এবং Dialect-কে একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। Accent বা উচ্চারণ হল pronunciation-এ পার্থক্য, অন্যদিকে Dialect আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বের ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে কমিউনিটি গড়ে উঠেছে এবং এখনও গড়ে উঠছে। প্রতিটি কমিউনিটি ভিন্ন ভিন্নভাবে ভাষা উচ্চারণ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে যে উচ্চারণে পার্থক্য দেখা যায় তা কমিউনিটিভিত্তিক শব্দের উচ্চারণ বা Accent স্থায়ী নাও হতে পারে। যেমন ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মতে স্বাধীনতা অর্জনের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসে। প্রথমদিকে তাঁরা শব্দের উচ্চারণ পূর্ববঙ্গের মতনই করত। সময়ের সঙ্গে তাঁদের শব্দ উচ্চারণ স্থানীয় উচ্চারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক নতুন উচ্চারণের রূপ পায়। বর্তমানে সেই নতুন উচ্চারণ প্রায় সবক্ষেত্রে স্থায়ী হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও আমরা একই জিনিস দেখতে পাই। ইংরাজি ভাষা ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সব দেশেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ নিয়ে। ইংরাজির সঙ্গে স্থানীয় ভাষা যুক্ত হয়ে প্রতিটি শব্দের নতুন উচ্চারণ বা Accent রূপ দ্রুত রপ্ত হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সব পরিবার অন্যস্থান থেকে এসেছে (Migrated family) তাদের শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে স্থানীয় উচ্চারণ আয়ত্ত করতে পেরেছে। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে সব শিশুরাই নতুন ধরনের উচ্চারণ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে কিন্তু বয়স্করা কখনও পুরোপুরি নতুন উচ্চারণ আয়ত্ত করতে পারে না। সমীক্ষার মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে আরও জানা যায় যে কোনো দল (group) যদি কোনো শব্দের উচ্চারণ নির্দিষ্ট করে নেয় (standard pronunciation) তখন সেই দলের সমস্ত সদস্য সেই উচ্চারণ অনুসরণ করে। একেই উচ্চারণে সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব বলা যায়।

- **বহুভাষী শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ রক্ষায় পার্থক্য (Difference in communication in Multilingual class-room)**

বহুভাষী (Multilingual) শ্রেণিকক্ষ বলতে বোঝায় যে শ্রেণিকক্ষে বহু ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা পঠনপাঠন করে। সাধারণত বড় শহর বা শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়সমূহতে বা ইংরাজী-মাধ্যম বিদ্যালয়সমূহতে (CBSE/ICSE Board) শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থীদের একই শ্রেণিকক্ষে দেখা যায়। বড় শহর বা শিল্পাঞ্চলের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়সমূহতেও বর্তমানে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থীদের একই শ্রেণিকক্ষে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বড় শহর কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল প্রভৃতি জায়গার বিদ্যালয়গুলি এখন নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের শিশুদের মিলন ক্ষেত্র। এই বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা, উর্দু, সাঁওতালি, অলচিকি, হিন্দি, তেলুগু, মারাঠি ইত্যাদি ভাষাতে শিশুরা কথা বলে। জাতীয় সংহতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক ভাষা শিক্ষার কথা বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন সুপারিশ করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)। এই কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি ভাষা শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে— মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা (হিন্দি) এবং ইংরাজি। আবার যাদের মাতৃভাষা হিন্দি তাদের জন্য অপর যে-কোনো একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোঠারি কমিশনের সুপারিশকে সমর্থন করেছে।

বর্তমানে অনেক পরিবারের শিশুরা একই সঙ্গে চারটি ভাষায় যোগাযোগ করতে পারে। মাতৃভাষা– যে রাজ্যে বাস করছে সেই রাজ্যের ভাষা এবং হিন্দি ও ইংরাজি।

উপরিউক্ত কারণে বহুভাষা ব্যবহৃত হয় এমন শ্রেণিকক্ষ ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষাভাষী দেশে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। এইসব শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষায় পার্থক্য দেখা যায়। শ্রেণিকক্ষে সাধারণত দু'ধরনের যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। প্রথমত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী যোগাযোগ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সেই ভাষাই ব্যবহার করবেন। বাস্তব জীবনের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহকে LTM হিসাবে ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষের শিখন ও বাস্তবজীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন। গৃহে ব্যবহৃত ভাষা এবং বিদ্যালয়ের ভাষার পার্থক্য শিশুদের মধ্যে কিছুটা উৎকণ্ঠা, হীনমন্যতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি করতে পারে। আশা করা যায়, শিক্ষক-শিক্ষিকার স্নেহপূর্ণ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মনে নিরাপত্তাবোধের জাগরণ ঘটিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

১০.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

যোগাযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য, সংবাদ, আদেশ, নির্দেশ, সিম্পান্ত প্রভৃতি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে সঞ্চালিত হয়। সাধারণভাবে ভাষার মাধ্যমেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। শ্রেণি পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক ভাষার ব্যতিরেকেও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। শিক্ষকের হাঁটাচলা, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, মুখের ভঙ্গিমা, চোখের দৃষ্টি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যম। ছোট্ট শিশু কান্নার মাধ্যমেই যোগাযোগের চেষ্টা করে। ভাষা হল সামাজিক জীবনের যোগাযোগের মাধ্যম। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবে অঞ্চলভেদে একই ভাষার শব্দ উচ্চারণে পার্থক্য দেখা যায়। একই শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থীদের যোগাযোগে কিন্তু সমস্যা দেখা যায়।

১০.৭ অনুশীলনী (Unit End Exercise)

A. নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. যোগাযোগ শব্দটির অর্থ হল

(ক) শোনা (খ) বলা (গ) যোগবিয়োগ (ঘ) ভাব-বিনিময়

২. যোগাযোগ শব্দটির উৎপত্তি মূল ল্যাটিন শব্দ

(ক) communis (খ) communist (গ) common (ঘ) complex

৩. শিশুর প্রথম যোগাযোগের ভাষা হল

(ক) হাসি (খ) তাকানো (গ) কান্না (ঘ) ঘুম

৪. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল

(ক) ব্যাখ্যা করা (খ) বর্ণনা করা (গ) মত বিনিময় (ঘ) পাঠদান

৫. 'Communication' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, ______________ থেকে

(ক) Communicate (খ) Commune (গ) Communicare (ঘ) Community

৬. যোগাযোগের উপাদানগুলি হল —

(ক) প্রেরক (খ) গ্রাহক (গ) বার্তা (ঘ) কোনোটিই নয়

B. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. যোগাযোগ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করুন।

২. শ্রেণিকক্ষে কীভাবে যোগাযোগ ঘটে?

৩. শিশু কীভাবে যোগাযোগ করে?

৪. যোগাযোগের উপাদানগুলি কী কী?

৫. বহুভাষাভাষী শ্রেণিকক্ষ বলতে কী বোঝ?

C. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. শিশু কীভাবে যোগাযোগ শুরু করে ব্যাখ্যা করুন।

২. ভাষার ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব কীরূপ?

৩. বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থীদের একই শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা কীরূপ?

D. রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. জন্ম মুহূর্ত থেকে শিশুর যোগাযোগের মাধ্যম কী? শিশু-প্রতিপালন ও শিশুর যথাযথ বিকাশে যোগাযোগ প্রক্রিয়া কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, বিশ্লেষণ করুন।

২. সমাজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে ভাষা, উচ্চারণ কীভাবে পরিবর্তিত হয়? বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থীদের একই শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি পরিচালনার কৌশল বর্ণনা করুন।

Model Question Paper

Time : 3 Hrs **Full Marks - 70**

A. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন এবং উত্তরপত্রে লিখুন : **1 × 20 = 20**

I. ভাইগটস্কি হলেন __________ নির্মিতিবাদ-এর সমর্থক।

(a) জ্ঞানমূলক (b) সামাজিক

(c) ক্রিয়ামূলক (d) কোনোটিই নয়

II. মনোযোগের সঞ্চালনের উপর পরীক্ষা করার যন্ত্রটি হল —

(a) ট্যাচিস্টোস্কোপ (b) মাসন ডিস্ক

(c) রিপোর্ট কার্ড (d) মনোযোগ যন্ত্র

III. সূক্ষ্ম পেশির সঞ্চালন প্রয়োজন হয় না —

(a) লিখতে (b) চলতে

(c) অঙ্কন করতে (d) ছুঁচে সুতো পরাতে

IV. নীচের কোনটি খেলার বৈশিষ্ট্য নয়?

(a) সৃজন ধর্মীতার প্রকাশ (b) খেলা করতে বাধ্য করা

(c) স্বাধীনভাবে কাজ করা (d) অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায়

V. প্রাচীন অনুবর্তন শিখন কৌশলটি হল —

(a) সক্রিয় অভ্যাস নির্ভর (b) যান্ত্রিক অভ্যাস নির্ভর

(c) জটিল অভ্যাস নির্ভর (d) ইতিবাচক অভ্যাস নির্ভর

VI. নির্মাণমূলক খেলার একটি উদাহরণ হল —

(a) চিত্র অঙ্কন (b) পুতুল খেলা

(c) মাটির জিনিস তৈরি (d) লুকোচুরি খেলা

VII. ব্যক্তির মনোসামাজিক বিকাশের ধারাকে এরিকসন কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন —

(a) সাতটি (b) আটটি

(c) নয়টি (d) দশটি

VIII. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন-এর কথা বলেন —

(a) প্যাভলভ (b) স্কিনার

(c) থর্নডাইক (d) কোহলার

IX. কোহলার হলেন —

(a) আচরণবাদী (b) সমগ্রতাবাদী

(c) মনঃসমীক্ষণবাদী (d) মানবতাবাদী

X. অহম্ পরিচালিত হয় —

(a) সুখভোগের নীতির দ্বারা (b) কামনা-বাসনার দ্বারা

(c) বিবেক দ্বারা (d) বাস্তবতার নীতি দ্বারা

XI. শিশুর প্রথম সামাজিক প্রক্রিয়া শুরু হয় —

(a) বিদ্যালয় থেকে (b) খেলার মাঠ থেকে

(c) ক্রেইমা থেকে (d) পরিবার থেকে

XII. আমরা প্রত্যেকে যখন আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা এবং আচরণের উপর মূল্য আরোপ করি, তাকে বলা হয় —

(a) Self concept (b) Self esteem

(c) Self description (d) Self control

XIII. ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়া শর্তাধীন প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় —

(a) Stimulus Discrimination (b) Extinction

(c) Stimulus generalisation (d) Disappearence

XIV. শিশু দ্রুত অর্জন করে __________ ভাষা।

(a) সমস্ত ভাষা (b) বিদেশী ভাষা

(c) আঞ্চলিক ভাষা (Native language) (d) জাতীয় ভাষা

XV. শিশু দ্রুত চলন দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজন হয় —

(a) হাতেনাতে শেখা (b) ধরতে শেখা

(c) ছুঁড়তে শেখা (d) এদের সবগুলি

XVI. কার্যকরী স্মৃতিকে আমরা বলি —

(a) তাৎক্ষণিক স্মৃতি (b) সংবেদনগত স্মৃতি

(c) স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি (d) অর্জিত স্মৃতি

XVII. শিশুর ভাষা বিকাশের স্তরে cooing কোন বয়সে দেখা যায়?

(a) 6 - 8 সপ্তাহ (b) জন্মের পর

(c) 2 বছরের মধ্যে (d) 3 বছরের মধ্যে

XVIII. সাধারণত কোন বয়স পর্যন্ত শিশু আত্মকেন্দ্রিক থাকে?

(a) প্রায় 3 বছর বয়স পর্যন্ত (b) প্রায় 4 বছর বয়স পর্যন্ত

(c) প্রায় 5 বছর বয়স পর্যন্ত (d) বয়সের কোনো সীমা নেই

XIX. 'অন্তর্ভুক্তিকরণ' হল —

(a) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (b) সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়া

(c) স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (d) সাম্যবাদী প্রক্রিয়া

XX. নীচের কোনটি খেলার বৈশিষ্ট্য নয়?

(a) সৃজনশীলতার প্রকাশ (b) স্বাধীনভাবে কাজ করা

(c) অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায় (d) বাধ্য হয়ে কাজ করা

B. যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও : (25 টি শব্দের মধ্যে) **2 × 10 = 20**

I. Cephalocaudal নিয়ম বলতে কী বোঝো?

II. অপানুবর্তন বলতে কী বোঝায়?

III. ZPD কী?

IV. থর্নডাইক প্রবর্তিত শিখনের মূল নীতিগুলি কী কী?

V. মনোযোগের দুটি বস্তুগত শর্তের উদাহরণ দাও।

VI. ভাষার উপাদানগুলি কী কী?

VII. স্কিমা কী?

VIII. শিখনে 'প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তির' তত্ত্বটি কী?

IX. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা কী?

X. নির্মিতিবাদ কী?

XI. ইগো বা অহম্-এর দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

XII. সমান্তরাল বা সদৃশ খেলার দুটি উপযোগিতা লিখুন।

C. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : (250 টি শব্দের মধ্যে) **7 × 2 = 14**

I. খেলা কী? বিভিন্ন ধরনের খেলার উদাহরণ দাও।

II. শিখনে স্কিনারের তত্ত্বটি বর্ণনা করো।

III. কোহলবার্গের প্রস্তাবিত নৈতিক বিকাশের স্তরগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

D. নিম্নলিখিত যে-কোনো একটি (১) প্রশ্নের উত্তর দিন : (500 টি শব্দের মধ্যে) **16 × 1 = 16**

I. স্থূল থেকে সূক্ষ্ম বিকাশের স্তরগুলি ক্রমপর্যায়ে বর্ণনা করো।

II. পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের স্তরগুলি বর্ণনা করো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ